যখন বৃষ্টি নামল

গ্রাম-কেন্দ্রিক প্রেমের উপন্যাস

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

অধুনা প্রকাশনী
৪৯ মিলন পার্ক
গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪

উৎসর্গ পত্র

সাহিত্যের আচার্য্য
শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

............লেখকের কথা

'যখন বৃষ্টি নামল' উপন্যাসটি বহুদিন আগে, অধুনালুপ্ত হিমাদ্রি পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

উপন্যাসটির কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথম কথা, এর পটভূমি এবং বিষয়, গ্রাম এবং চাষাবাদ। বৃষ্টিহীন দগ্ধ প্রান্তর থেকে এর যাত্রা শুরু। যন্ত্রণার শেষ হ'ল বৃষ্টি নামায়। যদিও প্রেমের উপন্যাস, তবু গ্রামের মানুষ, ক্ষেত খামার, গাছপালা, নদী, শ্রেণী চেতনা, বর্তমান রাজনীতি এর মধ্যে ভিড় করে এসেছে। যে নির্বাক ও পীড়িত মেয়েটিকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস আবর্তিত হচ্ছে, সে যেন বৈশাখের তৃণহীন প্রান্তর। বৃষ্টি নামার মধ্যে তার আরোগ্যের উপাদান।

আমি উদ্যোগহীন লেখক, অন্ততঃ বই প্রকাশের ক্ষেত্রে। প্রকাশক সমাজের কাছে ধর্ণা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই এতোদিন পত্রিকায় প্রকাশিত আরো অনেক উপন্যাসের মতো এটিও পড়েছিল। আমার বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধু অমলেন্দু দত্তগুপ্ত এক সময় এই ধরনের কয়েকটি লেখা পড়তে নিয়ে যান। "যখন বৃষ্টি নামল" তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে। তিনি নিজে একটি প্রকাশনা আরম্ভ করছেন। সেই প্রকাশনার প্রথম উপন্যাস হিসেবে এইটি ছাপতে চান। 'যখন বৃষ্টি

নামল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার এই হ'ল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাংলা সাহিত্যে কৃষক জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস বোধহয় খুব বেশি নেই অথবা নেই বললেও হয়। অথচ জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশি ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাঁদের উপেক্ষিত জীবন সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে নেই, যা থাকা উচিত। আমাদের বর্তমান বাংলা কথা সাহিত্য মূলতঃ নগর কেন্দ্রিক এবং তার বিষয় অতিশয় জোলো প্রেম। গ্রামীণ জীবন এবং বৃহৎ জীবন তার মধ্যে স্থান পায় না। সাহিত্য যতোই বাস্তবতা ভিত্তিক হ'ক, তার দৃষ্টি দূরের দিকে প্রসারিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এই উপন্যাসটির মধ্যে তার প্রতিধ্বনি আছে।

এই উপন্যাসের উপাদান নিয়ে আকাশ বাণী কলকাতা থেকে আমার একটি নাটক প্রচারিত হয়েছিল। তার নাম ছিল 'বৃষ্টি'। প্রযোজনা করে-ছিলেন শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

পাঠক-পাঠিকাদের বইট ভাল লাগলে বাধিত হবো।

কোনার্ক
১০ লেক ওয়েস্ট রোড
কলকাতা-৭৫

বিনীত
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান বাংলা উপন্যাস-জগৎ প্রধানতঃ শহর-কেন্দ্রিক। এই শহর জীবনের অশান্ত এবং কৃত্রিম যাত্রা, উদ্দাম আনন্দ-স্রোত, কৃত্রিম ভালবাসার রেখা-চিত্র নগ্ন যৌন প্রবৃত্তি কেন্দ্রিক কাহিনী—এই উপাদানগুলি এখন বর্তমান বাংলা উপন্যাসের বহুব্যবহৃত এবং অগভীর উপাদান। কিন্তু এই শহর জীবনের পরিধির বাইরে যে বিপুল প্রসারিত গ্রাম জীবন, যে গ্রাম-জীবনের কেন্দ্রবিন্দু কৃষি, সেই উপাদানকে নিয়ে সার্থক এবং যথার্থ সাহিতমূল্য সমৃদ্ধ আধুনিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

"যখন বৃষ্টি নামল"—এই প্রতীকী উপন্যাসটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। লেখক মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জগতে একটি নতুন এবং উজ্জ্বল দিকের উদ্বোধন করলেন।

শ্রীমাইতি নিজেই গ্রামের মানুষ এবং একজন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক। গ্রাম-জীবনের মৃত্তিকা ও মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। আধুনিক সাহিত্যের রীতি ও আঙ্গিকে লেখা এই 'যখন বৃষ্টি নামল' উপন্যাসটি তাই শুধু গ্রামকেন্দ্রিকতার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নয়—আধুনিক সাহিত্যের বৃহৎ নাট্যভূমিকায়ও বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। গ্রামের মাটি, রৌদ্রদগ্ধ ক্ষেত, বিশীর্ণ নদী, শিক্ষার আলোহীন মানুষের মিছিল এবং এরই মধ্যে গভীর ভালোবাসার কাহিনী, সর্বশেষে বৃহৎ অধ্যাত্ম জীবনের দিকে নির্জন সংকেত, উপন্যাসটিতে কিছুটা অন্তত বৃহতের স্পর্শ এনেছে। বিষয় বস্তুতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টির ঐশ্বর্যে এবং প্লট নির্মাণের কুশলতায়, এই উপন্যাস বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি শ্রদ্ধাবনত ব্যতিক্রম।

সুহাস দত্তগুপ্ত

গ্রন্থকারের প্রকাশিত অন্যান্য বই

উপন্যাস

নতুন জনপদ

নিঃসঙ্গ নায়ক

নদী মাটি-মানুষ

শেষ প্রহরের ঘণ্টা

কিশোরদের জন্য

গান্ধীজীর গল্প

মাটির রং লাল (কিশোর উপন্যাস)

কাব্য গ্রন্থ কয়েকটি কোন সময় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি এখন অস্তিত্বহীন।

॥ ১ ॥

সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত উদ্ভিদ ও বৃক্ষজগৎ তখন বৃষ্টির জন্য নিঃশব্দে প্রার্থনা করছে। গ্রামের ধার থেকে শুরু করে হলদিয়ার সমুদ্রতীর পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ অতৃণ মাঠ মুমূর্ষু রোগীর মতো ধুঁকছে, তখন সে মাঠের বুকেও কী প্রবল পিপাসা। বৃষ্টি! বৃষ্টিই তখন জীবন। বৃষ্টিই তখন পৃথিবীর প্রাণ!

একটা গ্রামের পাশে এসে যাত্রী বোঝাই বাসটা কয়েকবার শব্দ করে থেমে যেতে যাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠল। চারিদিকে নানা প্রশ্ন—কি হ'ল সর্দারজী?

—আউর নেহি জায়েগা?

—ইঞ্জিন বিগড় গিয়া?

—ক্যা? টায়ার পানচার?

ঝান্নু বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ড্রাইভার। ডায়মণ্ডহারবার থেকে মুরপুর পর্যন্ত বাস চালায়। যাত্রীদের হৈচৈ, মন্তব্য, প্রশ্ন—কানে তুলল না সে। ঝটাস্ করে ডান দিকের দরজাটা খুলে নেমে গিয়ে একটানে ইঞ্জিনের বনেটটা তুলে ফেলল। রেডিয়েটার দিয়ে খুব ধোঁয়া বেরুচ্ছে তখন।

তার গম্ভীর হাবভাব দেখে মনে হ'ল, পাকা এক ঘণ্টা নট্ নড়ন চড়ন।

ওধার থেকে একজন অসহিষ্ণু যাত্রী রেগে কণ্ডাক্টরকে বলল—পয়সা ফেরত দাও। পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টর বলল—থোড়া ঠার যানা, বাবু।

—আর ঠার গিয়ে ফায়দা নেই বাবা। বাস নেহি যায়েগা।

এক প্রবীণ যাত্রী মন্তব্য করলেন—যেমন হয়েছে সরকার তেমন হয়েছে বাস-এর মালিক। সব মারার ধান্ধায়। কোন্ আদ্দিকালের ঝরঝরে বাস। এখনও চালাচ্ছে আর পয়সা লুটছে।

মুক্তি এই বাসেই ডায়মণ্ডহারবার হয়ে বাড়ি ফিরছিল। বাস থেমে যাওয়া, যাত্রীদের হৈচৈ, এসব সত্ত্বেও লেডিজ সীটের একধারে চুপ করে বসেছিল সে। বাস থেমে যেতে অবশ্য খুব গরম লাগছে। ঘাম হচ্ছে খুব। তবু উদ্বিগ্ন হয়ে কি লাভ!

রাস্তার ওধারেই একটা ছোট খড়ের একচালা ঘর। তবে এই দুপুরে লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সব কেমন ঝিমিয়ে আছে। সামনের একটু উঠোনে কয়েকটা শীর্ণ লঙ্কা আর বেগুনের চারা। ভাঙ্গা বেড়ার ধারে ধারে কি সব আগাছা জন্মেছে। পুবদিকে একটা ছোট্ট ডোবা। এই প্রখর গ্রীষ্মে তার জল শুকিয়ে একেবারে তলায় ঠেকেছে। বাবলা গাছের তলায় একটা গাই বাঁধা আছে।

ভারতবর্ষের দরিদ্র গ্রামের চিরকেলে ছবি।

একটু হাওয়ার জন্যে মুক্তি বাঁ দিকে ঘুরে বসল। রাস্তার ওধারে নয়ানজুলি। তাতে জল নেই এখন। তার পরেই মাঠ শুরু হয়েছে—মধ্যাহ্নের ধূ ধূ করা মাঠ। মাঠের ওপারে ও-ই দূরে গ্রামের কাছে মরীচিকার তরঙ্গ।

হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক হাওয়া ভেসে এল, হাওয়াটা ঠিক ঠাণ্ডা নয়, কিন্তু স্নিগ্ধ। মুক্তির সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। আরে, সে এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি, বাসটা একটা প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সর্দারজীর মাথায় তাহলে বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। আশ্চর্য গাছটা! এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও জীবনের প্রাচুর্যে ভরপুর। বিশাল বাহুর মতো দীর্ঘ শাখা-প্রশাখায় ঘন সবুজ পাতার অরণ্য। চারদিকে ঝুরি নেমেছে কোন তপঃসিদ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসীর দীর্ঘ জটার মতো।

মুক্তির অবাক লাগল। এই বৈশাখেও বৃদ্ধ বনস্পতি মাটির কোনো গভীরতম স্তর থেকে তার আত্মার পিপাসার পানীয় সংগ্রহ করছে।

মুক্তি প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রী। এটা সিক্সথ ইয়ার। তার কেন যেন মনে হ'ল, সে এই মুহূর্তে প্রকৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বিস্তৃত কালের হিরন্ময় স্তব্ধতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। বাইরে তার দারিদ্র্য, তার [illegible] একচালা কুটীর জীর্ণ, তার শস্যের ভাণ্ডার খালি, তার জীবনে পৃথিবীর

আধুনিক কালের কোনো উজ্জ্বল রং নেই। এক কথায় সে ব্যর্থ, সে ব্যাক-ডেটেড্। মুক্তির মনে হয়, তবু তার কোথায় একটা বড় শক্ত, বড় কঠিন, বড় স্থির ভিত্তিভূমি আছে। সে পালাবদলের ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে না, প্রবল রাজনৈতিক ভূমিকম্পেও সে অটল থাকে।

ইতিমধ্যে যাত্রীদের কোলাহল হৈ চৈ ক্রমশ থেমে আসছিল। মুক্তি কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা থেকে বইগুলো সরিয়ে ছোট্ট রুমালটা বের করল। অন্য সময় ডায়মণ্ডহারবার-নুরপুর বাস-এ অনেক বেশি ভিড় থাকে। নদীর ওধারে গেঁওখালি। এধারে চব্বিশপরগণা, ওধারে মেদিনীপুর। সুন্দরবন থেকে, ঐ অঞ্চলের ভাষায় লাট অঞ্চল থেকে, যারা চাষবাস করে মেদিনীপুরের মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, ভগবানপুর খেজুরী ফেরে তারা বেশিরভাগ এই পথেই যায়। নুরপুরে যেখানে গঙ্গা আর রূপনারায়ণ একসঙ্গে মিশে তারপর কলকাতা আর কোলাঘাটের দিকে চলে গেছে, সেখানটায় নদীর চেহারা বড় ভয়ঙ্কর। এবং ভয়ঙ্কর বলেই সুন্দর। যাত্রীরা লঞ্চে পেরিয়ে গেঁওখালি বাজারের ভিতর দিয়ে, কখনও বা বাজারটা বাঁ দিকে রেখে ক্যানেল পাড়ের দিকে চলে যায়। নদীর কণ্ঠস্বর, নদীর দৃশ্য তখন পেছনে পড়ে থাকে। ওধারেই ইটামগরার স্লুইস গেট, সুতাহাটা, মহিষাদল, নরঘাট যাওয়ার বাস। ড্রাইভার হর্ণ বাজিয়ে বাজিয়ে যাত্রীদের প্রাণপণে দৌড়ে আসার জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যেন বাস এক্ষুনি ছেড়ে দিল বলে! তারপরেও আধঘণ্টা ধরে, বাস-এর ভেতর ও ছাদ যাত্রীতে যাত্রীতে পিঁপড়ের মতো ভর্তি হয়ে গেলেও, বাস ছাড়ার নামটি পর্যন্ত শোনা যায় না। তখনও কণ্ডাক্টর পরের লঞ্চের যাত্রীদের জন্য হর্ণ বাজিয়ে যায়। কণ্ডাক্টর বাস-এর পেছনে শব্দ করতে করতে চিৎকার করে—উঠুন, উঠুন বাস ছেড়ে দিল—মহিষাদল, হলদিয়া, নন্দকুমার, নরঘাট!

এ অঞ্চলে এটাই নিয়ম!

মুক্তি মনে মনে এইসব দৃশ্যের কথা ভাবছিল। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে এসে, এ পথে বেশ কয়েকবার সে যাতায়াত করেছে। কিন্তু এখনও প্রতিবারই তার নতুন লাগে। ডায়মণ্ডহারবার থেকে সরষের আশ্রম, আর সেই মোড়ের

কাছে বিরাট নিম গাছটা, অথবা ইটামগরার স্লুইস গেট, ক্যানেল, সবই যেন সে প্রথম দেখছে !

কি জানি কেন, প্রতি পথ, প্রতি নদী, প্রতি বৃক্ষ, মুক্তির কাছে প্রতি-বারই নতুন বলে মনে হয়।

মুক্তি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, মুখ মুছল। পাশের স্ত্রীলোকটি তার ছেলের পা-টা সরিয়ে নিয়ে ধমক দিয়ে বলল—এই, গায়ে পা লাগবে না ?

বোধহয় ছেলেটির পা মুক্তির গায়ে লেগে থাকবে। মুক্তি হেসে বলল—লাগুক।

—না ভাই, তোমার অমন সুন্দর খদ্দরের শাড়ীটা নোংরা হয়ে যাবে !

মুক্তি ছেলেটিকে একটু আদর করে বলল—কি নাম তোমার !

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলে—বাবলু।

—বাবলু ? বাঃ বেশ নাম তো !

—কোথায় যাচ্ছ ?

—কেন ? বাবার কাছে যাব !

মেয়েটি হাসল।

মুক্তি বুঝতে পারল, বাবলুর মার পতিগৃহে যাত্রা !

ওধার থেকে একজন লোক বলে উঠল—মুক্তিদি ছুটি পড়ে গেল ?

মুক্তি লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ।

বলল বটে, কিন্তু আসলে তাকে চিনতে পারলো না। মুক্তিকে মাঝে মাঝে এমনি অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়। তাকে অনেকেই চেনে, সে অনেককেই চেনে না। তাকে চেনার কারণ তার বাবা রাজনীতি করেন। এ সব বাস-এ ওপারের যারা যাওয়া আসা করে তারা সাধারণত মহিষাদল, নরঘাট, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের লোক। তারা বিজয়বাবুকে চেনে। তাঁর ছোট মেয়ে মুক্তির পরিচিতি কিছু বিস্তৃত। অন্তত তার দিদি সীতার চেয়ে। কারণ সে ওখানকার কলেজের নামকরা ছাত্রী ছিল। শুধু পড়াশুনোয় নয়, স্পোর্টস-এ, ডিবেট-এ, গানে। এর সঙ্গে এসে মিশেছিল তার প্রখর রূপের খ্যাতি। কলেজের ছেলেরা আড়ালে বলত—আগুন। আর যারা একটু শান্ত

প্রকৃতির, তারা বলত—অগ্নিশিখা। এই রূপের সঙ্গে এসে মিশেছিল কিছু নিন্দাও। অসংকোচে ছেলেদের সঙ্গে মেশার দুর্নামও ছিল মুক্তির। কোন কোন সৌন্দর্য, নিন্দার আলোছায়ায় বোধহয় ভাল করে খোলে। আসলে মুক্তি দিদির চেয়ে বেশী সুন্দর নয়। সীতা, মুক্তির চেয়ে অনেক, অনেক বেশি সুন্দর। তা ছাড়া সে শান্ত, নম্র। তার সৌন্দর্যে যেন একটা ধূসর পবিত্রতা। সে এতো নিঃশব্দ যে, তার বাস্তব অস্তিত্বটা সবাই, বিশেষ করে ছাত্রমহল, ভুলে যেত।

সীতা যেন সত্যই পরিশুদ্ধ মৃত্তিকা! আমাদের জীবনের সব কিছু খাদ্য শস্য পুষ্প পানীয় মৃত্তিকারই তো দান। এমন কি, মৃত্যুর শেষ বিশ্রামটুকুও এই মৃত্তিকারই কোলে—। অথচ সেই মৃত্তিকার কথা কে মনে রাখে!

তাই সীতার শান্ত সৌন্দর্যটা, মুক্তির ভালো-মন্দ মেশা জীবনের উজ্জ্বল কোলাহলের কাছে কিছু নিষ্প্রভ!

অচেনা লোকটির মুখে মুক্তির ইউনিভার্সিটি বন্ধ হওয়ার কথা শুনে বাস-এর অনেকে তার দিকে ভাল করে তাকাল। বিশেষ করে, সরষের যে একদল কলকাতার ছেলে উঠেছিল তারাই। ওরা দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে বোধহয়। আজকালকার ইয়ংম্যান। লম্বা চুল, লম্বা জুলফি, ঢলঢলে ট্রাউজার, চোখে বেয়াড়া ঢাউস চশমা।

ওদের কাছ থেকে কয়েকটা অনুচ্চ মন্তব্যও মুক্তির কাছে ভেসে আসছিল।

একজন বলল—আঃ, কী একসেলেণ্ট দেখতে রে!

—ফিগার খানা দেখেছিস? লম্বা, ফর্সা, শ্লিম। এ্যাই, বিকাশ আলাপ করবি! রাস্তাটা তা হলে মন্দ কাটে না মাইরি।

অরবিন্দ বোধহয় লীডার।

বিকাশ বলল—দূর! বড় গম্ভীর গম্ভীর লাগছে রে!

মুক্তি চোখ থেকে গগ্‌লসটা খুলল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ফিস ফিস করে একটা মন্তব্য ভেসে এলো—আঃ, মাইরি চোখ দুটো দেখেছিস? পোয়েট্রি, পোয়েট্রি।

মুক্তি গম্ভীর গলায় বলল—কোথায় যাবে তোমরা? আপনি-টাপনি নয়

একেবারে তুমি। যেন চ্যালেঞ্জ।

মুক্তি চিরকালই ডেয়ারিং!

একজন বলল—হলদিয়া।

—কি পড় তোমরা?

—কলেজে পড়ি!

মুক্তি ওদের দলের একজনকে বলল—ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়াতে অসুবিধা হচ্ছে বোধহয়। দাও, আমার কাছে দাও।

ওরা সবাই চুপ।

ছেলেটির ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়াতে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। ব্যাগটা মুক্তির হাতে দিয়ে বলল—ধন্যবাদ।

মুক্তি ব্যাগটা একহাতে তুলে রেখে বলল— এটার ভারেই নুয়ে পড়েছিলে?

দলের লীডার বলল—তাই নাকি? কতো ওয়েট হবে, বলুনতো?

—কত আর, ছ' সাত কিলো।

বাস-এর সবাই একটু অবাক হ'ল।

মুক্তি হাসতে হাসতে বলল—শরীর হবে ইস্পাতের মতো শক্ত।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান যাত্রী ওধারে বসেছিল। সাদা দাড়ি। মুক্তির কথা শুনে বলল—কাকে এসব বলছ, মা! পোশাক! শুধ্ পোশাকেই সব চলে যায়! এই আমার ছেলেটা—কলেজে পড়ে—

একজন ছোকরা বলল—ঠিক বলেছেন দাদু।

ড্রাইভার এখনো কি সব খুটখাট করছিল।

বাবলু কাঁদতে কাঁদতে বলল—জল খাব, মা!

সেই স্ত্রীলোকটি ধমক দিয়ে বলল—জল? জল কোথায় পাব এখানে? একটু পরে নেমে যাব। তখন—

বাবলু একটু সময় চুপ করে থাকল।

কণ্ডাক্টর ড্রাইভারের সঙ্গে আস্তে আস্তে কি সব বলছিল। বোধ হয়, বাস সারানো হয়ে আসছে।

বাবলু আবার কাঁদল—মা, একটু জল খাব।

স্ত্রীলোকটি রেগে বলল—চুপ!

ধমকে বা পিপাসায় কে জানে, বাবলু এবার গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

মুক্তি ব্যাগটা সীটে রেখে বলল—দাঁড়ান, দেখছি।

—তুমি আবার কষ্ট করবে?

মুক্তি বলল—কষ্টের আর কি আছে!

তারপর মাটির রাস্তাটা দিয়ে সেই ছোট্ট ঘরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরে একটা কাঁসার গ্লাসে করে জল নিয়ে যখন মুক্তি ফিরছিল, তখন বাসটা স্টার্ট নিয়েছে। অনেকে খেয়াল করেনি। সবাই অস্থির। —কি হল সর্দারজী? চলিয়ে।

বাবলুর মা বলল—না, না, একটু দাঁড়ান। কিন্তু কারুর যেন আর তর সইছে না। মুক্তি আসছিল। আসতেই কণ্ডাক্টর কড়া গলায় বলল—জলদি কিজিয়ে না।

ইয়া লম্বা পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টরের চোখে চোখ রেখে মুক্তি স্থির গলায় বলল—এর চেয়ে জলদি করতে পারবো না। গ্লাসটা ঐ বাড়িতে দিয়ে আসছি। না আসা পর্যন্ত দাঁড়াবে। আশ্চর্য!

আশ্চর্য! কথা নয়। যেন হুকুম।

বাবলুর জল খাওয়া হতে মুক্তি ধীরে ধীরে গ্লাসটা হাতে নিয়ে নেমে গেল। কণ্ডাক্টর একদম চুপ। হাঁ করে শুধু দেখতে লাগল!

ড্রাইভারও স্টার্ট বন্ধ করে দিল। গ্লাসটা মুক্তি ফিরিয়ে দিয়ে এসে নিজের আসনে বসল। যেন এতক্ষণ কোথাও কিছুই হয়নি!

নুবপুর বেশিদূর ছিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নদীর ধারে এসে বাসটা দাঁড়াল। দাঁড়াতে সেই ছেলেগুলি হৈ হৈ করতে করতে আগে নামল।

বাবলুর মা বলল—ধন্যি তোমার সাহস, ভাই।

মুক্তি কিছু বলল না। শুধু হাসল একটু।

বাবলু তার মা-র সঙ্গে নদীর ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

মুক্তি লঞ্চ ঘাটের দিকে এগোচ্ছিল। সামনে বিশাল নদী। সে নদীতে

এখন জোয়ার। মুক্তি পদ্মা কখনো দেখেনি। শুনেছে, বর্ষায় পদ্মা সমুদ্রের মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু গঙ্গা আর রূপনারায়ণের সঙ্গম স্থল এই নুরপুরে নদী সব সময়ই বিরাট। ওপারে গেঁওখালি বাজারের ঘরগুলিকে কেমন ছোট ছোট মনে হয়। যতবার নুরপুর থেকে গেঁওখালি দিয়ে সে বাড়ি ফিরেছে, ততবারই এই সিমেন্ট বাঁধানো বটগাছের তলায় অনেকক্ষণ সে কাটিয়েছে। প্রথমবারতো শুধু এই নদী দেখার লোভেই সে লঞ্চটা পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ প্রায় এক ঘণ্টা এই নির্জন, এই শূন্য, অথচ এই পরিপূর্ণ নদীতীরে সে নিজের সঙ্গে কাটাতে পারবে। দেখবে, দূরে কোলাঘাটের দিকে রূপনারায়ণ কেমন গর্বিত শরীর নিয়ে চলে গেছে। আশ্চর্য! এই যাওয়া যেন কোন অজানা দিগন্তের দিকে যাওয়া! আর উত্তরে গেছে গঙ্গা। এখানে বলে হুগলী। কিন্তু মুক্তির কাছে সবই এক। ইতিহাসের সেই কোন আদিকালে ভগীরথ নাকি এই গঙ্গার স্রোতধারাকে পর্বতের নির্জনতম উচ্চ শীর্ষভূমি থেকে ভারতবর্ষের সমতল মৃত্তিকার দেশে এনেছিলেন। কেন তাঁর এই মহান ব্রত? শুধু স্বগোত্রদের উদ্ধারের জন্যে? এতো গল্প! এতো 'মিথ'! আসল কারণ মানুষের কল্যাণ!

মুক্তির বড় বিস্ময় লাগে। আচ্ছা, গ্রীক দেবতা প্রমিথিউস মানুষকে ভালবাসতেন বলে তার জন্য আগুন চুরি করেছিলেন। তাই ক্রুদ্ধ দেবতা জিউসের আদেশে বিশ্বকর্মা তার দুটো হাত শেকলে বেঁধে, সমুদ্রের ধারে ককেশাসের এক সুউচ্চ নিষ্ঠুর রুক্ষ পর্বতশীর্ষে সূর্যের দিকে মুখ করে, তাঁকে বেঁধে রেখেছিল—যেখানে "নাইদার হিউমেন ভয়েস, নর হিউমেন গ্ল্যান্সেস" —এই ভয়ঙ্কর শাস্তি তাঁকে পেতে হয়েছিল, কারণ শুধু তিনি মানুষকে ভালবেসেছিছেন, যে মানুষ বড় দুঃখী, বড় অসহায় ও নিঃসঙ্গ—"ম্যান এলোন, পুওর সাফারিং ম্যান—"

কিন্তু ভগীরথকে নিয়ে, গ্রীক কবি এস্কাইলাসের মতো আজো কেউ মহৎ ট্রাজেডি রচনা করেনি! কেন? এস্কাইলাসের মতো কোন মহৎ কবি কি এদেশে জন্মাননি!

লঞ্চটা গেঁওখালি বাজারের দিক থেকেই আসছিল। এখন মাঝ নদীতে।

দূরে একটা জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। তার দক্ষিণে দূরে কুঁকড়াহাটি। তার পাশ দিয়ে নদীটা হলদিয়ার দিকে চলে গেছে। এই সব মিলে, দ্বিপ্রহরটা কেমন যেন বিরাট উদার এক নিসর্গ ছবির মতো সুন্দর বিস্ময়!

যাত্রীরা আগেই জেটির কাছে ভিড় করেছিল। মুক্তি গিয়ে দাঁড়াল। সেই ছেলের দলটি আগে। সবাই জোরে জোরে কথা বলছিল। মুক্তি যে ব্যাগটা নিয়েছিল, সেটা এখন লীডার অরবিন্দের কাঁধে। বিকাশ বলল—আপনিও নদী পেরিয়ে যাবেন?

মুক্তি একটু হেসে বলল—তোমাদের সঙ্গেই যাব।

—হলদিয়া? আপনার বাড়ি ঐদিকে নাকি?

—না।

বিকাশ বলল—অরবিন্দ, ছ্যাখ মাইরি! নদীটা কি ভীষণ এখন।

অরবিন্দ বলল—জোয়ার। বিকাশরে, তুই ব্যাটা কিচ্ছু দেখিসনি।

বিকাশ বলল—তাই তো এলাম গুরু। বাবা কি আসতে দেয়! শালা কত কায়দা করে, ভুজুং ভাজুং দিয়ে।

—বেশ করেছিস্। তা মালকড়ি কত বাগিয়েছিস্?

—বেশি না গুরু। মাত্র পঞ্চাশ টাকা।

—ব্যাস্ ব্যাস্ ওতেই হবে।

বিকাশ বলল—আমি সাঁতার জানি না। যদি পড়ে যাই, কি হবে?

অরবিন্দ বলল—কিচ্ছু হবে না। শুধু মরে যাবি। আর কি?

লঞ্চটা এসে জেটিতে লাগল। মাঝি একটা তক্তা ফেলে দিল যাওয়া আসার জন্য। যাত্রীরা নেমে যাচ্ছিল একে একে। ছেলেদের আর তর সইছিল না। মাঝি বলল—দাঁড়ান বাবু। লোক নামুক আগে।

তক্তাটা দুলছিল। লঞ্চ থেকে নামাটা সোজা, ওঠা কঠিন। পা স্লিপ করলেই, নদীতে পড়ে একেবারে শেষ।

দলটিকে নিয়ে লীডার অরবিন্দ আগে উঠল। পরে বিকাশ অনেক ভয়ে ভয়ে। তারপর আর সকলে।

মুক্তিও উঠল। সারেঙ একটু হাসল মুক্তিকে দেখে। যেতে আসতে মুখ

চেনা হয়ে গেছে।

এখন প্রচণ্ড রোদ। মুক্তি তবু ছাদেই বসল। ছাদে বসলে নদীর পুরো দৃশ্যটা চোখে পড়ে। হ্যাঁ, সত্যি কেন যেন দুপুর রৌদ্রে নদীর ছবিটাকে কেমন এক মহৎ ট্রাজেডির মতো মনে হয় মুক্তির। তেমনি বিশাল, তেমনি উদার, তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি বিষাদ ঘন!

সারেঙ্গ সবাইকে নীচে যেতে বলছিল। তবে মুক্তিকে নয়, মুক্তি চারপাশে ছড়ান গামছা, কাটা কাপড়ের পুটলি, সুটকেশ প্রভৃতির মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে ভাল করে বসল। ওপারে যেতে অন্তত পৌনে একঘণ্টা। অতএব এ সময়টা সে নদীর সঙ্গে একান্তে মনে মনে কথা বলতে পারবে!

সবাই উঠে গেছে বোধহয়। সারেঙ্গ দুটো ঘন্টি দিল। স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। এমন সময় কে যেন দূর থেকে ডাক দিল—একটু দাঁড়য়ে!

মুক্তির চোখ তখন দূরে কোলাঘাটের দিকে, যেখানে আকাশের গায়ে রেলব্রীজের ক্ষীণ রেখা চোখে পড়ে।

লঞ্চ স্টার্ট নিয়েছে।

অরবিন্দ বলল—এ্যাই রোক্‌কে, রোক্‌কে। এক বুড়ো দৌড়ে আসছে।

বিকাশ বলল—স্বামীজী টামিজী নাকিরে বাবা। সেই রকম জামা কাপড়। মাথায় চুল, দাড়ি।

মুক্তির কানে আবছাভাবে কথাগুলো আসছিলো। লঞ্চের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে। আঃ কী সুন্দর ওই পাখিটা! সারা শরীর সাদা, শুধু মুখের কাছটা কালো। কি নাম? সমুদ্র সারস? একবার জলের কাছে নেমে যাচ্ছে আর একবার উড়ে যাচ্ছে আকাশে, যেখানে দুপুরের রোদ ভরে আছে। আচ্ছা, লঞ্চে এসে বসে না একবার? সেই কবিতাটা—এনসেন্ট মেরিনার!

হঠাৎ একটা চিৎকার—পড়ে গেল! জলে পড়ে গেল!

মুক্তি চমকে তাকিয়ে দেখল—সেই বৃদ্ধ জলে পড়ে গেছে। হাতের লাঠিটা ভেসে যাচ্ছে এক দিকে!

ডুবে যাবে! ডুবে যাবে!

যাবে তো বুঝলাম, কিন্তু এখন এই জোয়ারে নদীতে সাঁতার কেটে তাকে

বাঁচাবে কে ? যে যাবে, সেও তো মরবে !

মুক্তির মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে গেল। সামনে রাখা একটা গামছার বাণ্ডিল ঝট্ করে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল বৃদ্ধের দিকে। ওটা ধরে যদি ভেসে থাকতে পারে।

বৃদ্ধ তখন দুটো হাত দিয়ে কোনোক্রমে স্রোতের সঙ্গে যুঝে চলেছে। কিন্তু ভাসমান বাণ্ডিলটা অন্যদিকে চলে গেল। এখনও কেউ নামলো না। আশ্চর্য! এতো লোকের চোখের সামনে লোকটা ডুবে মরে যাবে! এটা মাঝ নদীও নয়! শুধু সবাই-সবাইকে উপদেশ দিচ্ছে। না, কেউ নামল না। শুধু চিৎকার করে কি হবে !

মুক্তি আর ভাবতে পারছে না। আর দু'চার মিনিটের মধ্যে লোকটি জলের নিচে তলিয়ে যাবে। না, আর একটু সময় দিলে সব শেষ হয়ে যাবে— মুক্তি তাড়াতাড়ি আঁচলটা কোমরে কোনভাবে জড়িয়ে, পাকা সাঁতারুর মতো এক লাফ দিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল !

এখন যত দ্রুত পারে সাঁতার কাটছিল মুক্তি। মুখে লোনা জল লাগছে। পায়ের দিকে শাড়িটা একটু তুলে নিল সে। কিন্তু বৃদ্ধ ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।একটু এগিয়ে আসতেই মুক্তি বুঝতে পারল সামনে প্রচণ্ড ঘূর্ণি জল। নাঃ আর বোধহয় মুক্তি পারল না। বৃদ্ধ চিরকালের মতো নদীর নিচে তলিয়ে যাবে। কথাটা মনে আসতেই মুক্তি শেষবারের মতো একবার চেষ্টা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। কে যেন তার গায়ে এখন অসীম শক্তি দিয়েছে। সে এখন গোটা নদীটাই সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারে।

মুক্তি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। লঞ্চটা এখন কোথায় সে জানে না। শুধু একটা আবছা কোলাহল দূর থেকে কানে আসছে। ঐ! ঐ দেখা যাচ্ছে বৃদ্ধকে ! আর কয়েক হাত মাত্র ব্যবধান। আর কয়েক হাত মাত্র গেলেই সে ডুবন্ত মানুষটাকে ধরে ফেলতে পারবে ! আর সামান্য কয়েক হাত মাত্র— !

কিন্তু নদীর স্রোত এখানে প্রচণ্ড। ঘূর্ণি জলটা একটা অন্ধকার গভীর কালো মৃত্যুর মতো, কোথায় কোন্ পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ঙ্কর নদীটাও এখন বিশাল কবরভূমির মতোই ভীষণ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর !

॥ ২ ॥

মুক্তি ভিজে শাড়িতেই নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসেছিল। রোদে এখন সব শুকিয়ে আসছে। তাকে দেখার জন্যে যারা ভিড় করে এসেছিল, তারাও অনেকে চলে গেছে। মুক্তি একবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। না, শরীর এখনও এমন অবশ হয়ে আছে যে, তার উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যোগাযোগ। মুক্তি আশ্চর্য হয়ে এই যোগাযোগের কথাটাই ভাবছিল। সে যখন নদীতে ডুবন্ত বৃদ্ধকে বাঁচাতে গিয়ে তার ঘাড়ের কাছটায় আলতোভাবে ধরে জল থেকে মাথাটা তুলে ধরেছিল, তখন সে চমকে উঠেছিল। আরেঃ, স্বামীজী! মৃন্ময়দার বাবা! সে ভুল দেখছে না তো! না, এতো ভুল কি করে হবে।

সাঁতার শেখার সময় মুক্তি জেনেছিল, ডুবন্ত মানুষের সামনে না গিয়ে পেছন থেকে তাকে ধরতে হয়। ডুবন্ত মানুষেরই মরণ আলিঙ্গনে উদ্ধারকারীকেও জলের তলায় তলিয়ে যেতে হতে পারে। মুক্তি তবু একটু এগিয়ে গিয়ে সামনে থেকেই দেখল ভাল করে। আস্তে আস্তে ডাকল, 'স্বামীজী!'

স্বামীজী হাঁপাতে হাঁপাতে দুটো ঘোলাটে চোখ মেলে তাকালেন শুধু।

মুক্তি আবার ডাকল—স্বামীজী, আমি—।

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে বোধহয় স্বামীজীর চোখদুটো মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু চিনতে পারলেন না।

মুক্তি বলল—আর ভয় নাই। লঞ্চটা এসে গেছে।

সেই হলদিয়া যাবার ছেলের দলটি দুজনকেই টেনে তুলল। মাঝি, যাত্রীরা সবাই তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

একজন যাত্রী বলল—যাক্ বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছে বুড়ো।

ওধার থেকে একজন বলে উঠল—সত্যি, মেয়েছেলে বটে! এতগুলো

জোয়ান ছেলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আর—

—সাঁতার কাটাটা দেখেছেন মশায়? পাকা সাঁতারু!

—সত্যি। লাখে এমন মেয়েছেলে দেখা যায় না।

—লাখে কেন, কোটিতে বলুন।

এপারে আসতেই মুক্তি খুব অনুনয় করে বলল—অরবিন্দ, ভাই, ইনি আমার খুব চেনা, আত্মীয়ের মতো। যেমন করে পার তোমরা এঁকে বাঁচাও। বাজারে নিশ্চয়ই কোন ডাক্তার আছে। তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও।

অরবিন্দ বলল ভয় পাচ্ছেন কেন, মুক্তিদি, উনি ভাল আছেন।

দর্শকদের মধ্যে একজন বলল—তা হোক। সামনেই ডাক্তারখানা।

মুক্তি বলল—কোথায় কদ্দূর?

—বাজারটার পূব দিকে। চলুন আমি নিয়ে যাব।

ওরা চলে যেতে মুক্তির মনে সেই মুহূর্তে আর একজনের মুখ ভেসে উঠেছিল। সে মুখ চিরদিন এই নদীর মতই উদাসীন। স্বামীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনলে সে মুখ হয়ত শুধু এমনি নির্বাক হয়ে রইবে। আর কিছু নয়। অথচ সেই নির্বাক মুখের ছবির মধ্যে কি গভীর নিঃশব্দ কান্না আছে, সে শুধু একজনই বোঝে, বুঝতে পারে, সে মুক্তি নিজে।

এখন মনে পড়ছে। অরবিন্দ, বিকাশ তাড়াতাড়ি কোত্থেকে একটা তক্তা জোগাড় করে তার উপর শুইয়ে স্বামীজীকে তক্ষুনি ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছে। আশ্চর্য এই ছেলেগুলি! মুক্তি যেতে পারেনি। বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য সে কিছুটা সংজ্ঞা হারাতেও পারে। এখন সব ঠিক মনে পড়ছে না।

মুক্তি আর একবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। না, এখনও পা টলছে। তবে আর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করলে অন্তত বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যেতে পারবে। তখনও যারা দু'একজন কাছে পিঠে ছিল মুক্তি তাদের বলল—আমি ভাল আছি। আপনারা যান।

একজন বৃদ্ধ লাঠি ঠুকে ঠুকে এসেছিল। সে বলল—তোমাকে দর্শন করে গেলাম মা। এ দর্শন কি সকলের ভাগ্যে হয়। বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো।

মুক্তি লজ্জা পেল।

একে একে সবাই চলে যেতে মুক্তি ভিজে চুলগুলো মেলে দিল পিঠে। কোমর পর্যন্ত চুলগুলো বিছিয়ে পড়লো। ভেজা চুল থেকে লোনা জলের গন্ধ আসছে। আরে? ব্যাগটা? ব্যাগটা কোথায়? হারিয়ে গেল নাকি? মরুক গে। কয়েকটা বই ছিল। তবে ঐ নিৎসের বইটা; হারালে মুশকিল। তারপর কি ভেবে মুক্তি মনে মনে হাসল। এতক্ষণে সেওতো কোথায় হারিয়ে যেতে পারত! আশ্চর্য! মৃত্যুকে মুক্তি এতো কাছ থেকে আর কখনো দেখেনি। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সময় এসব চিন্তা মনেই আসেনি তার। অথচ কেউ না এগোলে স্বামীজী তলিয়ে যেতেন। একি তবে প্রতিদান? স্বামীজী কি তাকে কখনও বাঁচিয়েছিলেন? দেহের মৃত্যু থেকে নয়? দেহের মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু নয়। হ্যাঁ স্বামীজী তাকে একটা বড় রকমের মৃত্যু থেকে একবার বাঁচিয়েছিলেন।

আচ্ছা স্বামীজী যে তাকে চিনতে পারেননি এটা কিন্তু ভালই হয়েছে। চোখে চশমাও ছিল না তখন। মুক্তি শুনেছিল স্বামীজীর কোন গুরু-ভাইয়ের একটি আশ্রম আছে, নুরপুরে, সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকেন। আজ বোধহয় সেখান থেকেই ফিরছিলেন। মুক্তির হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল —স্বামীজী তাকে একদিন—বলেছিলেন—তুমি মা, পরিশুদ্ধ আত্মা। তুমি সেই শক্তির অংশ, তুমি নিজেকে চেন, জানো—

কথাগুলো এখন এই নদীতীরে বসে ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগছে মুক্তির। স্বামীজী তাকেও অত্যন্ত স্নেহ করেন। তবে সে স্নেহের প্রকাশ অবশ্য বাইরে তেমন নয়।

স্বামীজী, অর্থাৎ জ্ঞানানন্দ অধিকারী, হরিচরণপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। গম্ভীর, ভীষণ রাশভারী মানুষ। সেই মানুষ মৃন্ময়দার মায়ের মৃত্যুর পরে দেখতে দেখতে সংসার সম্পর্কে কেমন নিস্পৃহ হয়ে গেলেন। মুক্তি এসব বাবার কাছ থেকে শুনেছে। চাকরি ছেড়েও দিলেন হঠাৎ। সব কিছু থেকে দূরে সরে এলেন।

মুক্তি বাবার কাছে একবার শুনেছিল, স্বামীজীকে নাকি আচার্য শংকর

স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিলেন। মুক্তি কথাটাকে বানানো গল্প বলেই মনে করেছিল। সে তখন ফার্স্ট ইয়ারের সময়কার ঘটনা। কিন্তু আজ তার মনে হয়, আমাদের এই জানার জগতের বাইরেও এমন অন্য জগৎ আছে, বিজ্ঞান তার ঠিকানা আজো জানে না। কিছুটা প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রী বলে, কিছুটা দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করার জন্যও বটে, আবার কিছুটা স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের জন্যও বটে—মুক্তি আজ এই উপলব্ধির পর্যায়ে এসেছে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে একটা "মিস্টিক" ধারা দীর্ঘকাল থেকে অদৃশ্য স্রোতের মতো প্রবাহিত। সেই বেদান্তের কাল থেকে আজো তা চলেছে। মুক্তির আজো মনে পড়ে, স্বামীজী এক সময় বছর চারেক উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। মৃন্ময়দা সেবার এম. এস-সি. দেবে। বাবার জন্য ছেলের ভীষণ মন খারাপ যাচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা মৃন্ময়দা এলে মুক্তি বলল—একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে ছ্যাখো না কাগজে।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল—বাবা কি বেঁচে আছেন? আমার তো মনে হয় না।

মুক্তি বলল—থাকতেও তো পারেন। লোকে বলে উনি হিমালয়ে গেছেন।

মৃন্ময় বলল—সেখানে খবর কাগজ যায় না।

—মনে কর উনি হিমালয়ে নেই। অন্য কোন আশ্রমে আছেন। তখন?

মৃন্ময় বলল—বেশ।

একটা খাতা টেনে এনে মুক্তি বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া করে ফেলল—"বাবা আমি এম. এস-সি দিচ্ছি। যেখানে থাকো, আশীর্বাদ কর।"

মুক্তি বুদ্ধিমতী। স্বামীজীকে কোথাও ফিরে আসতে বলা হয়নি। কোনে কান্নাকাটিও নয়। শুধু আশীর্বাদ প্রার্থনা।

না, তারও কোন সাড়া ছিল না। মৃন্ময়ের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। বাড়ি এল। সে ধরে নিয়েছিল, বাবা বেঁচে নেই। ভীষণ মন খারাপ করে একা একা গ্রামের রাস্তায়, নদীর ধারে ঘুরে বেড়াত। প্রায়ই আশ্রমে গিয়ে বসত। তখন অবশ্য আশ্রমটা একটা পোড়ো বাড়ি। শ্রাদ্ধ করবে কিনা এমন কথাও বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল মৃন্ময়দা। বাবা বলেছিলেন—এতোদিন

দেখেছ, আর কিছু ছাখো!

কিন্তু একদিন খুব সকালে মৃন্ময়দা দেখে, স্বামীজী উঠানের তুলসীতলায় চুপ করে বসে আছেন। মৃন্ময়দা চিৎকার করে পিসিকে ডেকে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল। আসলে প্রথমে সে ভেবেছিল, এটা মনের ভ্রম।

স্বামীজী শান্ত গলায় বললেন—তমলুক থেকে হেঁটে এলাম। তুমি ঘুমুচ্ছিলে, তাই ডাকিনি।

মৃন্ময় চুপ।

—ঘর-বাড়ির এমন অবস্থা কেন? ঐ কোণে যে শিউলি গাছটা ছিল, মরে গেল কি করে?

গাছটা এক সময় স্বামীজী নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন।

স্বামীজীর জন্যে মৃন্ময়দা দুধ আনতে এসে মুক্তিকে কথাটা বলে গেল। দিদি তখন মামাবাড়িতে। মুক্তি সেদিনই সন্ধ্যেবেলা আশ্রমে গেছল। লোকের ভিড় কিছুক্ষণ আগেও ছিল। তারপর ফাঁকা হয়ে গেছে। স্বামীজী ক্লান্ত বলে সকলকে চলে যেতে বলা হয়।

যারা ফিরে যাচ্ছিল তাদের কাছ থেকে কথাটা শুনে মুক্তি আশ্রমে ঢুকবে কিনা ইতস্তত করছিল। বাঁশের গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। এমন সময় স্বামীজী ঘর থেকে তাকে নিজেই ডাকলেন—মুক্তি, এস মা।

যেন স্বামীজী জানতেন, মুক্তি ভেতরে আসবে কিনা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবছে। একটু অবাক হয়েছিল সে। কিন্তু বরাবরই সে জেদী। সে ঝগড়া করতেই এসেছে, কেন স্বামীজী মৃন্ময়দাকে ফেলে চলে যান। একমাত্র ছেলে, তবু এমন উদাসীন কেন। মৃন্ময়দা একে দরিদ্র, আবার তাতে সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ত। অর্থাৎ স্বামীজীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ সবের জন্য পড়াশোনারও ক্ষতি হয়েছে। অথচ ছাত্র হিসেবে মৃন্ময়দা খুব ভাল। এ অঞ্চলের সেরা ছেলে। টাকা পয়সারও টানাটানি যায়। একদিন তো বলেই ফেলল—এ্যাই, কিছু টাকা দাও তো!

মুক্তি অবাক! মৃন্ময়দা যে কখনো তার কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইবে, তা সে ভাবেনি। মুক্তির ভীষণ ভাল লেগেছিল সেদিন। বলল—বাঃ, বোসো।

মৃন্ময় বসল।

মুক্তি বলল—কতো টাকা ?

—শ' খানেক দাও।

মুক্তি ভেবেছিল, মৃন্ময়দা কতো আর চাইবে। বড় জোর পাঁচ দশ টাকা। কিন্তু একশ' টাকা শুনে ঘাবড়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। মৃন্ময়দার দরকারের দিনে সে সাহায্য করতে পারল না।

বলল—এতো টাকা কোথায় পাব, মৃন্ময়দা ?

—তা জানি না।

—খুব দরকার ?

—ভীষণ। নইলে চাইব কেন ?

মুক্তির একজনকে মনে পড়ে গেল। বলল—বেশ, সন্ধ্যেবেলায় এসো।

মৃন্ময়দা সন্ধ্যেবেলায় আসতে, মুক্তি একশ টাকার একটা নোট তাকে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, দিয়ে সে ধন্য হয়েছিল।

মৃন্ময় বলল—আমি জানতাম, তুমি পারবে।

মুক্তি খুশি হয়ে বলল—কি করে পারলাম, সে তো তুমি জানোনা।

—কি করে ?

—সমরদাকে বলতেই, তক্ষুনি সাইকেল করে ম্যানেজারের কাছ থেকে এনে দিল।

মৃন্ময় শুধু বলল—ও।

মুক্তি কেমন যেন একটু মিইয়ে গেল। বলল—বারে, একটু খুশি হবে তো!

মৃন্ময় হেসে বলল—হয়েছি। বুঝতে পারছ না ?

মুক্তি ঘাবড়ে গেল। মৃন্ময়দা গম্ভীর প্রকৃতির। ওর ঐ এক কথা, মানুষের বাইরের দিকে নয়, অন্তরের দিকে তাকাতে হয়। অন্তরই সব।

মুক্তি বলল—হঠাৎ একশ টাকার দরকার পড়ল যে ?

মৃন্ময় বলল—আমার এক বন্ধুর টি বি হয়েছে। তুমি চিনবে না তাকে। হসপিট্যালে একটা সীট পেয়েছি অনেক কষ্টে। প্রথমের দিকে বেশ কিছু টাকা লাগবে। আমার হাতে কিচ্ছু নেই। মাসখানেক পরে দিয়ে দেব।

স্কলারশিপের টাকাটা পেয়ে যাব তদ্দিনে।

মুক্তি থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টাকাটা তাহলে মৃন্ময়দা নিজের জন্য চায়নি। চেয়েছে বন্ধুর চিকিৎসার জন্য। আশ্চর্য!

হ্যাঁ, মুক্তি সেদিন স্বামীজীর সঙ্গে ঝগড়া করতেই এসেছিল। আশ্রমটা তখন অন্ধকারে থমথম করছে। বাইরে আলো নেই। ঘরের ভেতর শুধু একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। উঠোনে বাগানের অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। খড়ের চালাটা মৃন্ময়দার জন্য টিকে ছিল। খড়টড় পাল্টে চলনসই করেছিল।

সেইদিনই ঘরের কাজ শেষ করে ওদের বাড়ি চা-খেতে এসেছিল মৃন্ময়দা। মুক্তি জিজ্ঞেস করতে হাসতে হাসতে বলেছিল—ওখানে রিসার্চ করব! মুক্তি অবাক হয়ে বলল—রিসার্চ? কি রিসার্চ?

—সয়েল রিসার্চ! মানে মাটি পরীক্ষা। বুঝলে? মুক্তির বিশ্বাস হচ্ছিল না। হওয়া উচিতও নয়। বলল—এখানে? মৃন্ময় বলল—এখানেই শুরু। দাও, চা দাও, মাথা ধরে গেছে। মুক্তি চা দেবার কোন আগ্রহ দেখাল না। বলল—এই পোড়ো আশ্রমে! তুমি পাগল নাকি মৃন্ময়দা?

—একটু পাগলামি থাকা ভাল।

মুক্তির ইচ্ছে করছিল, বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। বলল—এই সব পাগলামি করে করে তো ক্যারিয়ারটা ঝর ঝরে করে ফেললে। রেজাল্ট কি হবে কে জানে! খাওয়া দাওয়া কোন কিচ্ছুর ঠিক নেই। বুড়ো পিসি চোখে দেখে না। সে দেখে সংসার। আর তুমি ছাখো আশ্রম। জীবনটা মাটি করে দিলে। অথচ সেই সমরদা কেমন সবদিক মানিয়ে চলে। কতো 'ব্রাইট'—।

মৃন্ময় রাগ করল না। হেসে বলল—জীবনটা মাটি করে দিয়ে সেই মাটির কাছে ফিরে যাচ্ছি।

মুক্তি তখনও শান্ত হয়নি। মৃন্ময়দাকে আঘাত করতে আজকাল তার কেন যেন ভাল লাগে। ও যেন একটি শিশু, তেমনি সরল, তেমনি উদাসীন, সুন্দর। বলল—'এ্যাটলিস্ট' নিজের ভবিষ্যৎটা মাটি করছ সে বিষয়ে আমি ডেফিনিট। সত্যি, তুমি দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছ মৃন্ময়দা। এতো ভাল ছাত্র ছিলে। শেষকালে গ্রামে এসে পাগলামি শুরু করবে!

মৃন্ময় হাসল। বলল—আশ্রমকে ল্যাবর‍্যাটরিতে কনভার্ট করে একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইছি। আশ্রমও থাকল, ল্যাবর‍্যাটরিও থাকল। কেন? খুব রিভোলিউসনারী আইডিয়া বলে মনে হচ্ছে না?

মুক্তি রাগ করে চলে আসছিল। মৃন্ময়দা ডাকল—শোন, কাকিমাকে বল না, এক কাপ চা দিতে। মাথাটা ভীষণ ধরেছে।

মুক্তি বলল—বয়ে গেছে আমার!

বোধহয়, এইসব পাগলামির ফলে আর কিছু না হোক, আশ্রমটা বর্ষার হাত থেকে বেঁচে গেছে। পোড়ো ভিটের ধ্বংসাবশেষ হয়ে ওঠেনি।

মুক্তি আশ্রমের উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো ভাবছিল। স্বামীজী অন্ধকার বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। একটা চাটাই দেখিয়ে বললেন—বোসো মা। আমি জানতাম তুমি আসবে।

মুক্তি ভাবল, স্বামীজীকে সকলেই দেখতে আসছে। কাজেই সে আসবে, এটা ভাবতে হলে ধ্যানে বসার দরকার হয় না। বিশেষ করে স্বামীজী জানেন, মুক্তি মৃন্ময়দার অনেকটা গার্জেনের মতো।

মুক্তি বসল। স্বামীজী একটু দূরে হেলান দিয়ে তাঁর আসনে বসেছিলেন। আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধ দেখাচ্ছে ওঁকে। মাথার দীর্ঘ চুল, দাড়ি সব সাদা হয়ে আসছে।

মুক্তি বলল—কোথায় ছিলেন এদ্দিন?

স্বামীজী মৃদু হাসলেন মাত্র।

—হিমালয়ে গেছিলেন?

স্বামীজী তেমনি হাসতে হাসতে বললেন—কেন? আমি কি সন্ন্যাসী? কৈ? গেরুয়া পরিনি তো?

—পরেননি। দুদিন পরে পরবেন।

—তোমার কথা সত্যি হোক্, মা!

মুক্তি বলল—মিথ্যে হলে খুশি হব। তা কোথায় ছিলেন? কাশীতে?

স্বামীজী বললেন—ঠিক বলেছ।

—বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন?

—দেখেছিলাম, অনেক পরে।

—আবার কবে উধাও হবেন?

স্বামীজী রাগ করলেন না। হেসে বললেন—দেরি আছে!

—ও, যাবেন তাহলে? মৃন্ময়দা ভেবে ভেবে সারা। পরীক্ষা টরীক্ষা শিকেয় উঠল। আশ্চর্য! বাবা হয়ে আপনি এতো পারেন!

স্বামীজী বললেন—ডাক এলেই চলে যাবো, মা।

—কে ডাক দেবে?

—যিনি ডাক দেন।

মুক্তি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল—ওসব হেঁয়ালি রাখুন। আমি আপনার শিষ্যা নই, যা বলবেন, তাই গুরুবাক্য বলে বিশ্বাস করে নেব।

স্বামীজী সুন্দর হেসে বললেন—কেউ বিশ্বাস না করলেই আমার ভালো লাগে। দাঁড়াও, আমি আসছি।

স্বামীজী ঘরের ভেতরে উঠে গেলেন। তারপর কি যেন খুঁজতে লাগলেন। বেরিয়ে এলে মুক্তি দেখল, স্বামীজীর হাতে মাটির একটা গ্লাস। একটা খুরিতে দুটো কলা, দুটো সন্দেশ।

স্বামীজী বললেন—তোমার খিদে পেয়েছে, খেয়ে নাও মা।

মুক্তি বলল—না, খাব না। তাছাড়া আপনি জানলেন কি করে আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

স্বামীজী শুধু নিঃশব্দে হাসলেন। বললেন—খাও মা ছেলের কথা রাখতে হয়। না, না, প্রসাদ নয়, তোমার ভয় নেই। লোকে দেখা করতে এসে দিয়ে গেছিল।

মাটির গ্লাসে এই প্রথম খাচ্ছিল মুক্তি। দুধ নয়, যেন ক্ষীর। এমন তার স্বাদ। কলা, সন্দেশ। সুন্দর একটা টিফিন—এই ক্ষুধার সময় অমৃত লাগছে। শুধু যদি এক কাপ চা হত।

স্বামীজী বললেন—চা তো এখন পাওয়া যাবে না, মা। পেলে আমিও খেতাম।

মুক্তি তাকাল স্বামীজীর দিকে। শুভ্র দাড়িতে, মাথার দীর্ঘ চুলে, এক

আশ্চর্য দীপ্তি। অন্ধকারে যেন জ্যোতি ছড়াচ্ছে। মুক্তি সচেতন হ'ল। সে স্থির করে নিল, এই সব পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সে কিছুতেই মুগ্ধ হবে না, বিস্মিত হবে না। সোজা প্রশ্ন করল স্বামীজীকে—আপনার ঈশ্বরকে দেখাতে পারেন ?

স্বামীজী চুপ করে রইলেন।

মুক্তি বলল—আমার প্রশ্নের জবাব চাই। নইলে বুঝবো, ঐসব মনের কথা বলা সব আপনার বুজরুকি। বলুন ? ঈশ্বরকে দেখাতে পারেন ? স্বামীজী শান্তভাবে বললেন—ঈশ্বর যে তোমার নিজের মধ্যেই আছেন, মা। "ম্যান ইজ ডিভাইন" উপনিষদ পড়েছ ?

মুক্তি তর্ক করতে পারে, কোন উপনিষদে মানুষকে এই ঈশ্বরত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। শ্লোকটা কি ! কিন্তু তাতে এই মুহূর্তে সে তার বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যাবে। বলল—ঈশ্বর আমার মধ্যেই, কি বলছেন ?

স্বামীজী বললেন—নতুন কিছু বলছিনে, মা।

মুক্তি একটু রুক্ষভাবে বলল—আসলে আপনার নতুন পুরনো কিছু বলার নেই ! এইতো আমার শরীর, রক্ত, মাংস, শিরা, উপশিরা, অস্থি, মজ্জা—এর মধ্যে ঈশ্বর এসে ঢুকলেন কোত্থেকে !

স্বামীজী ধীর গলায় বললেন—ঈশ্বর যে মা অনুভব সাপেক্ষ।

মুক্তি বলল—তবে ?

সকল ইন্দ্রিয়কে বাইরে থেকে গুটিয়ে নিয়ে শান্ত চিত্তে নিজের অন্তরের দিকে তাকাও, মনকে কনসেনট্রেট কর। একদিন ঈশ্বরের স্পর্শ পাবে।

মুক্তি তর্কে হারতে রাজি নয়। বলল—পেলে হাতি-ঘোড়া কিছু মিলবে?

স্বামীজী বললেন—পেলে যা মিলবে সাম্রাজ্য তার কাছে তুচ্ছ।

—কি সেটা !

স্বামীজী একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন—আনন্দ।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। আশ্রমের চারদিকে তখন অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠেছে। জায়গাটা যেন এই পরিচিত পৃথিবীর ভৌগোলিক অস্তিত্বের বাইরের অন্য কোনো জগতের মতো, এতো স্তব্ধ, এতো শান্ত।

মুক্তি বলল—স্বামীজী সত্যি করে বলুন তো, ঈশ্বর কি আছেন ?

স্বামীজী বললেন—আছেন।

—কোথায় আছেন ? কি তার রূপ ?

—তার রূপ, মানুষ আর এই প্রকৃতি, এই দুটোতে মেশালে যা হয়।

মুক্তি এটাই নতুন কথা শুনছে। বলল—বুঝতে পারলাম না।

সময় এলেই বুঝবে, মা!

মুক্তি হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল। সে জানে ভারতবর্ষের ধর্মজগতের নানান অধ্যায়। নানান ঈশ্বরের সমাবেশ সেখানে। কেউ বৈষ্ণব, কেউ শৈব, কেউ শাক্ত। মুক্তি জানতে চায়, স্বামীজীর ধারাটা কি ? তিনি কোন্ ধারার। তাই বলল—আচ্ছা স্বামীজী, আপনি কার উপাসক ?

স্বামীজী বললেন—ছেলে আর কাকে ডাকে, মাকেই তো ? মায়ের উপাসক।

—মানে আপনি শাক্ত ?

—আচার্য শংকর শাক্ত ছিলেন মা!

মুক্তি বলল—এই শক্তি জিনিসটা কি ?

স্বামীজী বলল—এনার্জি। পৃথিবীর সমস্ত এনার্জির মূলীভূত কেন্দ্র।

—কি এনার্জি ?

—মানসিক, আধ্যাত্মিক, প্রাকৃতিক—'ফিজিক্যাল এ্যাণ্ড নন-ফিজিক্যাল', ফলিত পদার্থবিদ্যা আজও যা দেয়নি, প্রকৃতির সেই অন্তহীন সৃজনী শক্তি—যে বিশ্বজননী!

স্বামীজী কথাটি শেষ করে কিছু সময় চুপ করে রইলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—যদি বলি, তুমিই সেই শক্তির অংশ, যদি বলি একদিন তোমার গর্ভ থেকে এমন নবজাতক আসবে যে সারা ভারতে, সারা বিশ্বে বিপ্লব আনবে! নিজেকে জানো, নিজেকে চেনো। আর কতোদিন অন্ধকারে থাকবে। কতোদিন নিজেকে শুধু কথায় কথায় ক্ষয় করবে। জীবন চলে যায়, চলে যাচ্ছে!

স্বামীজীর সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর তখনও অন্ধকারে কাঁপছিল। মুক্তির সব

দ্ধত্য তখন ম্লান, সব চ্যালেঞ্জ তখন নীরব।

ঘরের ভেতর প্রদীপটা বোধহয় নিভে গেছে। আশ্রমের চারিদিকে এখন থম থমে অন্ধকার। দূরে হলদী নদীর চরে, নরঘাট থেকে একটু পশ্চিমে, কারা শবদাহ করছে, তারি কোলাহল ভেসে আসছে মাঝে মাঝে!

কিন্তু স্বামীজী! স্বামীজী এইতো এখানে বসে কথা বলছিলেন। কোথায় গেলেন এর মধ্যে! তবে কি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল? অসম্ভব!

মুক্তির সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল!

একটু পরে হঠাৎ স্বামীজী নদীতীর থেকে হাঁটতে হাঁটতে সেই আগাছায় ঢাকা বাগান পেরিয়ে আশ্রমের দাওয়ায় উঠে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন—ভয় পাচ্ছ কেন মা?

মুক্তির গলার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল। বলল—আপনি কখন উঠে গেলেন?

—একটু আগে।

—কোথায় গেছিলেন?

স্বামীজী সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন—বাড়ি যাও মা, বিজয় অসুস্থ।

মুক্তির মনের মধ্যে এখন ভয়, বিস্ময়, বলল—বাবা অসুস্থ! সে কি! কি হয়েছে!

—পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। যাও, বাড়ি যাও।

মুক্তি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। মাইল দেড়েক পথ, তবে খুব চেনা। যেতে বড় জোর আধঘণ্টা।

মুক্তি প্রণাম করল স্বামীজীকে!

স্বামীজী বললেন—বাড়ি গিয়ে কাঁচা হলুদের রসের সঙ্গে পানের রস মিশিয়ে মধু দিয়ে বিজয়কে খেতে দিও। আর শোন—

মুক্তি ফিরে দাঁড়াল।

—শোনো মা, তুমি মুখে আমার সঙ্গে যে সব তর্ক করেছ, সে সব তোমার মনের কথা নয়!

মুক্তি স্তম্ভিত! সত্যি সে শুধু এতক্ষণে তর্কের জন্যই তর্ক করছিল। কান্না

কান্না গলায় সে বলল—আমি যে নিষ্পাপ নই, স্বামীজী। স্বামীজীর গলায় স্নেহ ঝরে পড়ল—তুমি শুদ্ধ আত্মা। কিছু ভুলচুক জীবনে হয়। ওতে ভয় পেতে নেই। মৃন্ময়কে নিয়ে দুজনে এসো একদিন।

মুক্তি দ্রুত হাঁটছিল এখন। দূর থেকে একটা টর্চের আলো। সমরদা বিরক্ত গলায় বলে উঠল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মুক্তি বলল—কেন? বাবার অসুখ?

সমর বলল—কি করে জানলে?

মুক্তি সামলে নিল নিজেকে। বলল—না, মনে হল যেমন তাড়াতাড়ি আসছ।

সমর বলল—চল, চল, জলদি চল। ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছেন। বোধহয় গল ব্লাডারে স্টোন। রাজনীতি করতে গিয়ে এই হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার ঠিক থাকে না। হ্যাঁ এক্ষুনি তমলুক হসপিট্যালে রিমুভ করতে হবে।

মুক্তি শুধু বলল—আচ্ছা।

সমর অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। বলল—কি হয়েছে তোমার বলতো?

—কেন?

—কথা কানে যাচ্ছে না। হাঁটছ, যেন পায়ে জোর নেই। টলে পড়ে যাবে।

মুক্তি হঠাৎ বলল—তুমি ঈশ্বর মানো, সমরদা?

সমর বলল—এই সেঞ্চুরীতে ঈশ্বর মশায় মিউজিয়মের ধুলোবালির মধ্যে পড়ে আছে। আর কোথাও নেই। ঐ স্বামীজী বোধহয় এতক্ষণ তোমার মাথার মধ্যে এসব গাঁজা ঢুকিয়ে দিলেন। জলদি চল—হাত ধর আমার, বারবার হোঁচট খাচ্ছ।

নদীধারে রাস্তাটায় এখন ওরা এসে পড়েছে।

মুক্তি বলল—না, প্লীজ। আমি একাই যেতে পারব। হাত ধরতে হবে না।

সমর হাঁ করে চেয়ে রইল!

ক্রমশ ওরা বাড়ির কাছাকাছি হচ্ছিল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল বারান্দায় আলো জ্বলছে, লোকজনের কোলাহল। মৃন্ময়দাও এসেছে। সে-ই

শুধু একাধারে শান্তভাবে বসেছিল। কল্যাণী কেবল ঘর বার করছে, গরম জল করে দিচ্ছে, তেল-সাবান জল দিয়ে পেটে ঘষছে।

মুক্তি এসেই বলল—মা, পান আছে?

কল্যাণী বললেন—আছে।

—কাঁচা হলুদ আছে?

—আছে। কেন রে?

—তবে দুটোর রস মিশিয়ে মধু দিয়ে বাবাকে খেতে দাওতো।

সমর বিরক্ত হল। বলল—তোমার টোটকা চিকিৎসা রাখ দিকিন। কাকিমা, আপনিও নৌকোয় চলুন।

কৈ মাঝি কোথায় গেল। কি ভাঁটা না জোয়ার?

মাঝি বলল—বাবু এখন জোয়ার।

সমর বলল—তবে তো খুব মুশকিল হবে! ভাঁটা পড়বে কখন?

মাঝি বলল—আর এক ঘড়ি পরে।

—এক ঘড়ি কি রে?

মৃন্ময় বলল—এই ঘণ্টাখানেক পরে।

মুক্তি বলল—হাতে যখন কিছু সময় আছে, মা তুমি ঐ রসটা করে বাবাকে খাইয়ে দাও।

বিজয়বাবু কাতরাতে কাতরাতে বললেন—তাই দাও। মুক্তি যখন বলছে।

মুক্তির আজো স্বপ্ন বলে মনে হয়। রসটা খাওয়ানোর পনের কুড়ি মিনিট পরে, বিজয়বাবুর ব্যথা কমে যায়। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। সে পেট-ব্যথা বাবার আর কখনো হয় নি। মুক্তি সে রাত্রে ঘুমোয় নি। সারারাত শুধু ভেবেছে, বাবার অসুখ, সে অসুখের কথা, তার ওষুধ স্বামীজী কি করে জেনেছিলেন। বাবাকে অবশ্য স্বামীজী খুব ভালবাসেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি? এও কি 'মিস্টিসিজম'। যোগের একটা স্তর? কিন্তু এ কথাটা সে কাউকে বলে নি! শুধু সেদিন থেকে তার জীবনে নতুন একটা চিন্তার জন্ম হয়েছিল। শুধু সেদিন থেকেই স্বামীজীর সঙ্গে তার আত্মার যোগসূত্র স্থাপিত হল।

সে নাকি পরিশুদ্ধ আত্মা ? সে নাকি শক্তির অংশ, সে নাকি জননীর অংশ, এ কথা কেউ তো বলে না। আশ্চর্য ! যার শারীরিক পবিত্রতায় সন্দেহের অবকাশ আছে—সে নাকি পরিশুদ্ধ আত্মা ! স্বামীজী—কি করে বললেন এ কথা।

মুক্তির জীবনের রূপান্তর সেই শুরু। পরবর্তী জীবনে সে এই আলোকেই চলতে চেয়েছে। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

দূর থেকে কে যেন ডাকল—মুক্তিদি।

ছেলে দুটি ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। মুক্তি চিনতে পারল, সেই বাস-এ দেখা হওয়া ছেলের দলের পাণ্ডা অরবিন্দ। সঙ্গে বিকাশ।

মুক্তি ভয় পেল একটু। স্বামীজীর কিছু হল না তো ? সে কথাটাই কি ওরা তাকে জানাতে এসেছে ? তা হলে !

মুক্তির দুচোখ ছল ছল করে উঠল। মনে মনে সে বলল—না, মৃন্ময়দা, শেষ রক্ষা করতে আমি পারলাম না। এতো বড় রিস্ক নিলাম, তবু— !

ওরা ক্রমশ কাছে এসে পড়েছে। মুক্তি মৃত্যু সংবাদটা শোনার জন্যে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

॥ ৩

মুক্তি উঠে দাঁড়ালো অনেক কষ্টে। পা টলছে, জোর নেই আদৌ।

সেই হলদিয়া পার্টি কখন চলে গেছে। সামনে দিয়ে একটা রিকশা ডাক্তারখানার দিকেই যাচ্ছিল। মুক্তি তাতে উঠে বসল।

একটু যেতেই রিকশাওয়ালা বলল—ডাক্তারবাবু তো নাই দিদি। মুক্তি বলল—নেই ? তুমি জান ?

—আমি পৌঁছি দিয়া আইলি। আগের বাস-এ রোগী দেখতে যাইছে।

—দাঁড়াও, ও, তুমি পৌঁছে দিয়ে এলে। আচ্ছা, একজন লোক, খুব

বুড়ো জলে পড়ে গেছিল।

—স্বামীজী ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বামীজী, তিনি—

—স্বামীজী চল্যা গেছেন ?

মুক্তি একটু অবাক হল—কোথায় চলে গেছেন ?

রিকশাওয়ালা বলল— এস. ডি. ও.-র জীপ আসথল ? সেই জীপে।

—তমলুকের এস. ডি. ও. ?

—না, ইরিগেশানের। এই ইটামগরায় ইঞ্জিনীয়ার থাইল দাসগুপ্তবাবু—তারুর জীপ ! সে তো আধঘণ্টা হয়্যা গেল।

মুক্তি কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল—বাস স্ট্যাণ্ডে চল তাহলে। আর ডাক্তারখানায় যাব না।

রিকশা ঘোরালো লোকটা।

মুক্তি ভাবছিল, উনি একা যেতে পারবেন তো। নিশ্চয়ই দাসগুপ্ত সাহেব চেনা। চেনা হলে নরঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। বাকি পথটার জন্য ভাবনা নেই। স্বামীজীকে সবাই শ্রদ্ধা করে। হয়তো এতক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ। মুক্তির বাড়ি পৌঁছবার আগেই স্বামীজী আশ্রমে পৌঁছে যাবেন। তা ভালোই হল। বাস-এ নিয়ে যেতে হলে অসুবিধা হতো। রিকশাওয়ালা নামল।

মুক্তি ছোট্ট মনিব্যাগটা বের করল। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের তলায় পড়েছিল। মুক্তি একটা নোট দিল তাকে। রিকশাওয়ালার কাছে খুচরো নেই। ভাঙ্গাতে যাচ্ছিল। মুক্তি বলল—থাক্।

স্বামীজী ভালো আছেন, এই খবরটায় মুক্তি এখন খুশি।

বাসটা মহিষাদল পেরিয়ে এখন নন্দকুমারের দিকে যাচ্ছিল। ড্রাইভার মুক্তিকে সামনের একটা সীটে বসতে দিয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে একটু আগে। মুক্তি ভাবছিল, বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সাতটা বা আটটা হয়ে যাবে।

বাসটা একটা স্টপেজে এসে দাঁড়ালো। নামলো কয়েকজন। বাসটা এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। এই সময় মুক্তি হঠাৎ দেখতে পেল, রাস্তা দিয়ে গ্রামের অনন্ত, জগন্নাথ, হরিপদ, পরেশকাকা—প্রায় জন দশেক মহিষাদলের

দিকে চলেছে। প্রত্যেকের মাথায় একটা করে ঝুড়ি। তাতে কোদাল, ছেঁড়া ময়লা কাঁথা, পুঁটলিতে কি যেন বাঁধা আছে। এই সন্ধ্যায় ওদের এইভাবে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে দেখে মুক্তির মনটা কেমন করে উঠল।

সে বুঝতে পারল না এরা এখন কোথায় যাচ্ছে। মহিষাদল পৌঁছতেই ওদের রাত হয়ে যাবে। মুক্তি ডাকল এ্যাই অনন্ত ? জগন্নাথ—

ওরা দাঁড়াল। কে ডাকছে, তা জানার জন্য পেছনের দিকে তাকাল একবার।

অনন্ত কাছে এসে পড়েছিল। বলল—মুক্তিদি তুমি ?

মুক্তি বলল—বাড়ি যাচ্ছি রে। তোরা কোথায় যাচ্ছিস ?

অনন্ত বলল—আর কাই যাব দিদি। মাটি কাটতে যাই। ঘরে কি ভাত আছে ? পোড়া পেটের জ্বালা, দিদি !

মুক্তি করুণ গলায় বলল—ও, মাটি কাটতে। তা কোথায় ?

—দেখি কাই পাই।

—সে কি রে ? কাজ ঠিক না করে যাচ্ছিস্ ?

জগন্নাথ, পরেশকাকা সবাই এসে দাঁড়াল।

জগন্নাথ বলল—কলকাতার কাছে ঠাকুরপুকুরের দিকে মাটির কাজ হবে। একজন খবব দিল।

মুক্তি বলল—ভাল করে খবর টবর না নিয়ে—।

অনন্ত বলল—বাড়ির খবর শুননি কিছু ?

মুক্তি ভয় পেল একটু। বলল—না, কি খবর ?

—সীতাদির অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। তমলুকন্নু ডাক্তার যাইথল।

মুক্তি অবাক হয়ে বলল—কি হয়েছে দিদির !

—জ্বর হইথল।

—সে তো বাবা আমাকে লিখেছে।

—এখন কথাবার্তা একদম বন্ধ।

—কদ্দিন ?

আইজ চার পাঁচ দিন।

মুক্তি নিজের মনে কথাগুলো উচ্চারণ করল। চার পাঁচদিন কথা বন্ধ! সে কি! তারপর বলল—কথা বন্ধ, মানে কি হয়েছে রে!

অনন্ত বলল—কইতে পারবনি, দিদি।

—তমলুক থেকে কে এসেছিল?

—বিলাত ফেরত ডাক্তার। বিজয় জ্যাঠার সঙ্গে দেখা হইথল! কইল, না, ভাল নয় সীতাদি। যাও তাড়াতাড়ি বাড়ি চল্যা যাও।

অনন্ত, হরিপদ, জগন্নাথ আবার মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সেই আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে রাস্তার ধার ঘেঁষে মাহিষাদলের দিকে হাঁটতে লাগল। মুক্তির মনে হ'ল, ওরা তার গ্রামের যে গন্ধটুকু এই সন্ধ্যায় বয়ে এনেছিল, ওদের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে গন্ধটুকু আবার হারিয়ে যাচ্ছে। এই গন্ধের মধ্যে একটা গভীর বিষাদ আছে। দিদি অসুস্থ! অসুস্থ শুধু নয়—কথাবার্তা বন্ধ, এমন গুরুতরভাবে অসুস্থ! সে দিদিকে দেখতে পাবে তো! যদি এর মধ্যে কিছু হয়ে যায়! মুক্তির এখন শুধু ইচ্ছে, কত তাড়াতাড়ি সে বাড়ি পৌঁছতে পারবে।

আশ্চর্য! বাসটা ছাড়ার নাম নেই যেন! কতক্ষণে নরঘাট পৌঁছবে কে জানে! এখনও নন্দকুমারই এলো না। সেখান থেকে ছ' মাইল। নরঘাট থেকে হেঁটে আরও তিন চার মাইল।

যাক্। বাস আবার স্টার্ট নিল। মুক্তি একবার মুখ বাড়িয়ে দেখল,—ছায়া ছায়া অন্ধকারের মধ্যে অনন্ত, জগন্নাথ, পরেশকাকা ক্রমশ দূরের দিকে হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে গাছের আড়াল হচ্ছে অবশ্য। তবু দেখা যাচ্ছে। ওরা যেন ঠিক মানুষের সারি নয়—মানুষের এক নিপীড়িত ভগ্নাংশের মিছিল। দুঃখে দারিদ্র্যে, অভাবে, ক্ষুধায়, রোগে—স্বাধীন ভারতবর্ষ ওদের আর মানুষ রাখে নি! অথচ এখন চাষের সময় আসছে। তবু পেটের দায়ে ওরা ভিটেমাটি, স্ত্রী ছেলে মেয়ে ছেড়ে শহরের দিকে চলেছে। ওদের পায়ে পায়ে, সেই কান্নাগুলো চলেছে শহরের দিকে। মৃত গ্রামের আর গ্রামের মানুষের কান্না নিয়ে শহর ফুলে ওঠে ফেঁপে ওঠে।

মুক্তি গ্রামে ফিরছে, আর ওরা গ্রাম থেকে চলে যাচ্ছে। এ যেন একটা

বিয়োগান্ত নাটক।

মুক্তি অন্ধকার গ্রামগুলোর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে!

নরঘাট এখনো অনেক দূর!

॥ ৪ ॥

বাড়ি ফিরে মুক্তি দিদির ঘরে কতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। কিন্তু সে আলোয় বাইরে নদীতীর ও মাঠের অন্ধকারটাকে আরো ঘন বলে মনে হচ্ছে এখন।

বিছানায় শুয়ে আছে সীতা। নির্বাক নিশ্চল। এই মুহূর্তে মনে হবে, যেন প্রাণহীন। রাত্রির বিস্তীর্ণ অন্ধকারের কোলে মাথা রেখে যেমন মাঠের মাটি কফিনের মতো নীরবে শুয়ে থাকে, এও তেমনি। মুক্তি দিদির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। দিদির মুখ প্রতিমার মুখের মতো সুন্দর, পবিত্র। এখন অসুখে ভুগে ভুগে সে মুখ বড় করুণ লাগছে। বালিশে একরাশ দীর্ঘ ঘন রুক্ষ চুলের অরণ্য ছড়ানো। চাদরে ঢাকা শরীরও বড় শীর্ণ। মুক্তির মনে হয়, দিদির মুখ চোখ এখন কেমন ধূসর লাগে। দিদির গায়ের রং অবশ্য তার গায়ের রঙের চেয়ে একটু ময়লা, যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামল, তবে ধূসর লাগার কারণ হয়ত ঘরের মৃদু আলো, আর বাইরের অন্ধকার এ-দুটো মিশে যাওয়ার ফলে। দিদি কোন কথা বলতে পারছে না। অথচ মুক্তির মনে হয়, রোগের আর কোন খুব খারাপ 'সিম্প্‌টম' এখন নেই। রাস্তায় আসতে আসতে অনন্তর কথা শুনে যা মনে হয়েছিল তা নয়। দুপুর বেলা টেম্পারেচার চার উঠেছিল। গতকালের চেয়ে বেশি। মাথায় প্রচুর জল দেওয়ার ফলে জ্বরটা একটু একটু করে নেমে যায়। মুক্তি এসে একবার থার্মোমিটার দিয়েছিল। দেখল নিরানব্বুই পয়েন্ট ফাইভ। মাথার কাছে একটা টুলের ওপর নানা রঙের ট্যাবলেট, একটা বেদানা, ডাব, জলের গ্লাস।

মুক্তি মোড়াটা সীতার বিছানার কাছে টেনে এনে মাথায় হাত দিয়ে ডাকল—দিদি, দিদিরে?

সীতা চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বলতে পারল না। শুধু ইঙ্গিতে বোনকে আরো কাছে ডাকল। আর মুক্তি মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই দিদি একদৃষ্টে যেন তাকিয়ে রইল।

মুক্তি খুব সেন্টিমেণ্টাল নয়। কিন্তু দিদির এই নির্বাক ভালবাসাটুকু সে এই মুহূর্তে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। মাথা তুলে দেখে, দিদির দু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে! উঃ, কি নিঃশব্দ বেদনা, কি করুণ তার প্রকাশ! মুক্তি তক্তাপোষে শোয়া দিদির দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। সে বুঝতে পারল, দিদি মুখে কিছু বলতে পারছে না ঠিকই। কিন্তু মন অত্যন্ত সচেতন। এই মুহূর্তে ছোট বোনের জন্য কী গভীর ব্যাকুলতা ওর অব্যক্ত অন্তরে উদ্বেল হয়ে উঠছে!

মুক্তি বলল—দিদি, তুই কাঁদছিস? ইস্! আঁচল দিয়ে চোখের জলটা মুছিয়ে দিল মুক্তি। বলল—আমি তোকে ভাল করবই। দেখিস।

মুক্তির মনে হল, দিদি খুশি হয়েছে।

আসলে দিদি হলেও, সীতা মুক্তির বন্ধুর মত। মাত্র বছর তিনেকের বড়। মুক্তি হিসেব করল মনে মনে। দিদি হয়েছিল উনিশ শ সাতচল্লিশের আগষ্টে আর মুক্তি হয়েছিল ফিফটিতে। হ্যাঁ, সামান্য ডিফারেন্স মাত্র। সীতা শান্ত আর মুক্তি নিজে ডানপিটে বলে চিরকালই ওর উপর কর্তৃত্ব করে এসেছে। যেন মুক্তি-ই দিদি, সীতা-ই তার বোন। তাতে সীতা কখনো রাগ করে নি। বরং এর ফলে বোনের প্রতি স্নেহ বেড়েছে। আসলে, সীতার চরিত্র, জননীর চরিত্র। মৃত্তিকার মত সর্বংসহা। সকলের সব অত্যাচার সে নীরবে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে এসেছে। বাড়িতে দিদি-ই সকলের বেশি খাটে, অথচ কথা বলে সবচেয়ে কম। কলেজের সোশ্যালে দিদিকে দেখা যেত একাই সব করছে। কিন্তু নাম করছে অন্যে। এখনও স্কুলে, নামে একজন হেডমিসট্রেস আছেন বটে। তবে দিদি-ই সব। মুক্তির মনে পড়ে একবার ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় তেরপাখিয়ার বাংলোয় ওরা সবাই মিলে পিকনিকে গেছল।

মুক্তির তখন ফার্স্ট ইয়ার কিং সেকেণ্ড ইয়ার হবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দিদি পরিশ্রম করে গেল। সেই রান্না থেকে শুরু করে পরিবেশন করা পর্যন্ত। অথচ মুখে একটি কথা নেই। সেই দিনই মুক্তি দেখেছিল, ওদের বাংলার লেকচারার পরমেশবাবু দিদির সম্পর্কে একটু বেশি সচেতন। মানে দিদিকে ভাল লেগেছিল ভদ্রলোকের। কিন্তু দিদি, তাঁর একটু ঘনিষ্ঠ, নিভৃত পরিচয় করার সকল সুযোগই ব্যর্থ করে দিল। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না— এমনি ভাব দেখাল। ফিরে আসার সময় সবাইকে হলদী নদীর ওপর খেয়া পার হতে হয়েছিল। কিন্তু একটা খেয়ায় ধরল না। দিদি, মুক্তি পরের খেয়ায় আসবে। আরও যাত্রী আছে। পরমেশবাবু ইচ্ছে করেই দিদির সঙ্গে রইলেন। খেয়াটা তখনও ছাড়েনি। হঠাৎ দিদি বলল—'এইরে, আরতির ঘড়িটা যে আমার হাতে। ও ভাববে হারিয়ে টারিয়ে গেল কিনা। মুক্তি, তুই স্যারের সঙ্গে আয়। আমি এটাতেই চলে যাই।

সীতা দৌড়ে ঐ খেয়াটায় উঠল।

আহত পরমেশবাবু জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললেন—মুক্তি তোমার দিদি কি বলতো?

মুক্তি যেন কিছুই জানে না, সারাদিন কিছুই দেখেনি।

বলল—কি আবার?

—না, মানে, কেমন যেন বড্ড—

মুক্তি বলল—ঠিক বলেছেন, স্যার। বড্ড নরম, মাটির মত।

পরমেশবাবু বললেন—ঠিক তা নয়। কিন্তু বড্ড কোল্ড, মানে 'লাইফে'।

মুক্তি সবই বুঝতে পেরেছিল। দিদির জীবনে ভালবাসা ঠিক সুরে বাজেনি বা ঠিক একটা মানসিক পরিপূর্ণতা নিয়ে ফুটে ওঠেনি, বা ভালবাসার গভীর অনুভব তার মধ্যে নেই, অধ্যাপক পরমেশবাবু এই কথাটাই আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ না জানুক মুক্তি জানে, দিদির জীবনের তারে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ রাগিনী হয়ে বাজে। কিন্তু আজ দিদি মুক্তির কথাটাই আগে ভেবেছিল। অর্থাৎ পরমেশবাবু, মুক্তিকে পছন্দ করুক, ওতেই সে খুশি হবে! কতবার বন্ধুদের বলেছে, মুক্তিটার একটা সুন্দর বিয়ে

দিয়ে, তবে আমার। পরমেশবাবু সত্যি বড় ভাল লোক ছিলেন। দেখতেও সুন্দর, সংযত, ভদ্র, শান্ত। তাই দিদি চেয়েছিল, ভাবটা মুক্তির সঙ্গেই হোক। কিছুদিন পরে তিনি তাদের কলেজ থেকে চলে যান। দিদির আচরণে নিশ্চয়ই সেদিন তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন, অপমানিত হয়েছিলেন। আজ তিনি কোথায় কে জানে!

এই তার দিদি সীতা। নিজের জীবনের সকল আনন্দকে, সকল সুখকে সে মুক্তির জন্য বিলিয়ে দিতে পারে। আজ সীতা অসুস্থ। মুক্তি একবার ভাবল, আচ্ছা দিদি বাঁচবে ত? যদি না বাঁচে!

মুক্তির বুকে এই হঠাৎ-আসা চিন্তাটা কেমন নিষ্ঠুরভাবে বাজে। সে দিদির দিকে আবার ভাল করে তাকালো—ইস্, মুখের ওপর সেই ধূসর ছায়া! একি তবে মৃত্যুর পূর্বাভাষ!

সীতা হাত নেড়ে ডাকল। মুক্তি কাছে যেতে ইঙ্গিতে জানাল—যা হাত পা ধুয়ে খেয়ে নে কিছু। কতক্ষণ রোগীর ঘরে বসে থাকবি।

ভাল থাকলে সীতা এতক্ষণে বোনের জন্য পাগল হয়ে উঠত!

মুক্তি বলল—মা, এ ঘরে এসো একটু।

কল্যাণী এলেন এ ঘরে।

মুক্তি বলল—কে দেখছে মা দিদিকে?

কল্যাণী বললেন—তমলুকের ডাঃ মুখার্জী। স্পেসালিষ্ট, এম আর সি পি।

—কি বলছেন উনি?

—না রোগটা ধরতে পারছেন না।

—তবে কি ডিগ্রী নিয়ে ধুয়ে খাব! তার আগে—

—তার আগে, তমলুকের তিনজন বড় বড় ডাক্তার তো দেখলেন।

নামগুলো শুনে মুক্তির কাউকেই পছন্দ হ'ল না। কিন্তু না হয়েও বা উপায় কি!

—বাবা কোথায়?

কল্যাণী বললেন—সন্ধ্যাবেলা মাণিকজোড়ের কবরেজ দীনুবাবুর বাড়ি গেলেন। এবার মাথায় ঢুকেছে কবরেজী করাবেন।

মুক্তি একটু ভেবে বলল—তা মন্দ হয় না মা।

কল্যাণী বললেন—ডাঃ মাইতি বললেন, এক্ষুনি জীবনের ভয় নেই। হার্ট ঠিক আছে। ভাল করে খেতে দিন রোগীকে, যেন 'উইক' না হয় তারপর দেখি—কলকাতা নিয়ে গিয়ে—মানে ব্রেনে কিছু হয়েছে মনে হয়। একবার এক্সরে করাতে হবে। —তা তুই হাত মুখ ধুয়ে নে না। সেই কখন বেরিয়েছিস কলকাতা থেকে। —যা, ওঠ!

মুক্তি বলল—যাই, মা! বড্ড চা খেতে ইচ্ছে করছে।

কল্যাণী বললেন—যা, তাড়াতাড়ি চান করে নে। গোবিন্দ—গোবিন্দ কোথা গেলি রে! দু' বালতি জল তুলে দেত। টিউবওয়েল থেকে।

মুক্তি বলল—আমি নিচ্ছি মা।

কল্যাণী বললেন—জল একেবারে নিচে। তুই পারবি না পাম্প করতে, পাঁচ মাস এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই রে! দেখেছিস, মাঠে ঘাসের পাতা পর্যন্ত নেই। মরুভূমির মতো ধু-ধু করছে সব!

মুক্তি বলল—তবে দিতে বল গোবিন্দদাকে। আমি আসছি। তারপর কি ভেবে বলল—মা, শোনো!

মুক্তি আজকের স্বামীজীর ঘটনাটা বলবে বলেই মাকে ডেকেছিল। কিন্তু সেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়া নিয়ে মা আবার কি মনে করবে, বাড়িতে দিদির এই অবস্থা, এসব ভেবে আর বলল না।

কল্যাণী ফিরে এসে বললেন—কি রে।

মুক্তি বলল—মৃন্ময়দা কোথায়?

—বাড়িতে।

—ও, বাড়িতে! কি করছে এখন?

কল্যাণী বললেন—তোর বাবার কাছে এসেছিল আজ সকালে। কি যেন 'ফার্ম' করবে। সমরের বাবার কাছ থেকে জমি লীজ নিচ্ছে, এসব শুনলাম। ঠিক জানিনে!

মুক্তি বলল—মৃন্ময়দা চাকরি করবে না?

—কি জানি। সমরও বাড়ি এসেছে। তুই আজ আসবি শুনে গেছে।

আসবে সন্ধ্যেবেলা।

মুক্তি সমরদা সম্পর্কে আর কথাটা তুলল না। বলল—জানো, মা, মৃন্ময়দার ছবি বেরিয়েছিল কাগজে।

—ছবি! তাই নাকি! কেন রে?

—ডি এস সি পেয়েছে।

—ডি এস সি পেলে বুঝি ছবি বেরোয়?

মুক্তি কি উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। বলল—না, মানে ভাল রেজাল্ট। সাবজেক্টটাও একটু 'পিকুলিয়ার' কিনা। এগ্রিকালচারে ডি এস সি বড় একটা—।

কল্যাণী বললেন—বেঁচে থাক বাবা। কিন্তু এতো লেখা পড়া শিখে কি করবে? না চাষবাস। ফার্ম করবে। সে তো গ্রামের চাষীরাও করে। তা হলে কি লাভ হল বল?

মুক্তির হাসি পেল, মা-র কথা শুনে।

কল্যাণী বললেন - সমরের প্রমোশন হয়ে গেছে জানিস? এখন বিয়ের চেষ্টা চলছে। ওর অফিসের এক বড় অফিসারের মেয়ের কোষ্ঠী এসেছে।

মুক্তি বলল—সমরদার তো প্রমোশন হবেই মা। ভাল ক্যারিয়র, তাছাড়া বড়লোকদের বড়লোকেরাই দেখে।

কল্যাণী মনে মনে রেগে গেলেন বোধ হয়। বললেন—তোদের কথাবার্তা আমি বুঝিনে মা। —তা হাত মুখ ধুবি, চান করবি, না কেবল বক্‌বক্ করবি?

মুক্তির হাসি পেল। সমরদাকে মা-র খুব পছন্দ। একে বড়লোকের ছেলে। এখন বড় অফিসার, দেখতেও বড় সুন্দর। জামাই হিসেবে পারফেক্ট।

মুক্তি কথাটা অন্যদিকে ফেরাল। বলল—জানো মা, গেঁওখালিতে অনন্ত, জগন্নাথ, পরেশকাকার সঙ্গে দেখা হল।

কল্যাণী বললেন—অনন্তের বৌ আজ সকালে এসেছিল চাল ধার করতে। দুদিন নাকি হাঁড়ি চড়েনি।

—তুমি দিয়েছ?

—এক সের মুড়ি। এমন করে দিলে দুদিনে রাজত্ব বিকিয়ে যাবে। কোথায় পাব? সীতার অসুখে এ পর্যন্ত পাঁচশ টাকা বেরিয়ে গেছে। জানিস? টাকা কোত্থেকে আসে? কোত্থেকে কি হয়?

মুক্তি সত্যি জানেনা, কোত্থেকে কি হয়। সে শুধু জানে, মাসে মাসে তার কাছে টাকা যায়। হিসেব মতোও নয়, তার চেয়ে বেশি। সে টাকা সে খুশিমতো খরচ করে—কারণে অকারণে দামী দামী বই কেনে। এবার ভাবছে 'ফ্রেঞ্চ'টা শিখবে। ভর্তি হয়ে যাবে ক্লাশে।

কিন্তু সে কথাটা এখন মা-কে বললে, মা ভীষণ রেগে যাবে। শুধু নিজেকে শুনিয়েই থেমে থেমে বলল—তা, অনন্তদেরই কোনোকালে খাবার জুটবে না। ওরাই খালি পেটে রোদে পুড়ে পুড়ে লাঙল ধরবে, চাষ করবে। তবু ওরাই দুমুঠো পান্তা পাবে না। গান্ধীজীর ধ্যানের ভারত! খোল, নলচে বদল না করলে হবে না, মা, কিছু হবে না এদেশের।

কথাটা শুনে কল্যাণী যেতে গিয়েও ফিরে এলেন। রুক্ষ গলায় বললেন—তোর বাবাও সারাজীবন ওরকম বলে এল। কে শোনে তোদের কথা? কে কান দেয় তোদের কথায়? খোল নলচে বদলটা করবে কে?

মুক্তি একটু সময় চুপ করে থেকে বলল—শুনবে না বলছ? একদিন শুনতে হবে। তুমি জেনে রেখো মা, বারুদ বড় শান্ত, বড় নির্জীব। কিন্তু কেউ যদি একটু আগুন ছোঁয়ায়, তখন সে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। সব ছারখার করে দেয়।

কল্যাণীর বক্তৃতা শোনার মতো সময় নেই। উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে এসেছিলেন। যেতে যেতে বললেন—সে আগুন আনার লোক মরে ভূত হয়ে গেছে।—যা চান করে আয়।

এখন আবার মুক্তির মনে সেই গ্রীক দেবতা প্রমিথিউসের কথা এসে পড়ল—সেই মানুষের জন্য আগুন চুরি করে আনার ঘটনা—। সেই প্রমিথিউস নির্জন নিষ্ঠুর পর্বতশীর্ষে বন্দী হয়ে আছেন। আর কারা যেন সম্মিলিত কণ্ঠে গান গাচ্ছে: "চাইল্ড অফ সরো, হেভেন ডিফেণ্ড দী—"। আশ্চর্য। স্বাধীনতার এতো বছর পরেও ভারতবর্ষের গ্রামজীবনে কেউ

সামান্যতম বিপ্লব আনতে পারল না। গান্ধীজী চলে যাবার পর, নেতাজীর পর ভারতবর্ষে আজ আর কোন প্রমিথিউস নেই। প্রমিথিউসের মত আজ আর কেউ বলবে না, যে আগুন আমি মানুষের জন্য দিয়ে যাচ্ছি একদিন সে আগুন পৃথিবীতে নতুন যুগ নিয়ে আসবে—তাতে নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। আমার জীবনের মাটি থেকেই নতুন দেশের, নতুন কালের জন্ম হবে।

মুক্তি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। মৃন্ময়দাকে স্বামীজীর খবরটা দেওয়া দরকার। অবশ্য তিনি ভাল হয়ে গেছেন। তবু তো একটা খবর। আর সে খবর দিলে, মৃন্ময় তাকে কি বলবে? অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর হয়ত বলবে, আমি কৃতজ্ঞ!

আশ্চর্য! এই ছবিটা মনে মনে ভাবতে গিয়েই মুক্তির মধ্যে একটা শিহরণ এল। এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ। ভালোবাসা এত স্পর্শকাতর। শুধু নামের উচ্চারণের মধ্যেই, ঠিক সুরে বাঁধা সেতারের তারের মত জীবন বেজে ওঠে, গান হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ের কথাটা একা একা অন্ধকারে মনে মনে বারবার উচ্চারণ করতে এখন বড় ভাল লাগে। মুক্তি উঠোন পেরিয়ে, সরু মাটির রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীতীরে এসে দাঁড়ালো। স্নান করার আগে এই হাওয়ায় একটু ঘুরতে, পায়চারি করতে বেশ ভাল লাগছে।

সারা রাস্তাটা নির্জন। হাট-বার হলে লোকজন চলাচল করত। ভাঙা সাঁকোটা কেমন যেন একটা মৃত জন্তুর কঙ্কাল। তার ওপারে বিরাট মাঠ। সে মাঠে এখন অন্ধকার। দূরে গ্রামের গাছপালার মধ্যে আলোর সূক্ষ্মতম রেখাও নেই। এই গ্রাম-দেশে আলো জ্বালিয়ে রাখাতো অধিকাংশ বাড়িতে বিলাসিতা। গ্রামে গ্রামে নাকি বিদ্যুৎ চলে গেছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে? বোধহয় নরকেই যাচ্ছে!

মুক্তি ধীরে ধীরে নদীর ধারের রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে এখন। নদী থাকার জন্যও হাওয়াটা বড় স্নিগ্ধ।

অবশ্য এটাকে নদী না বলে বড় খাল বলাই ভাল। আসলে এটা হল নদীরই একটা শীর্ণ শাখা। গ্রামের বাইরে নদীর তীরেই তাদের টালির

বাড়িটা। মুক্তির মনে হচ্ছিল, এই রাত্রে বাড়িটাকে কেমন ছবি-ছবি লাগছে। সামনে দিগন্ত খোলা মাঠ। পশ্চিমেও এই নদী। তার ওপারেও মাঠ! বাড়ির সামনে দিদির হাতে তৈরি বাগান। মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে—মাটি! মাটি! মাটি! আর সবখানেই, সারা বাড়িটাতেই দিদির অস্তিত্ব। সাজানো গোছানো, বাগান, তরিতরকারী, বাবার ইজিচেয়ারের ঢাকনা পর্যন্ত। হ্যাঁ, দিদি টিচারী করে বলেই তো সংসারটা যা হোক্ করে চলে। নইলে তার কলকাতার খরচ জোগাতে বিঘে দশ পনের জমির মালিক, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের মাথার সামান্য কয়েকটা চুলও আজ টিঁকে থাকত না। বাড়ি ফিরে মুক্তি তার আশৈশব পরিচিত, দিদির স্নেহ দিয়ে তৈরি এই ঘরবাড়ি এবং এই পরিচিত নদী ও মাঠের নিভৃত জগতের সমস্ত অশ্রুত শব্দ, গন্ধ বুকে ভরে নিতে চায়। বার বার এই মাটিতে হেঁটে সে তার বিস্মৃত শৈশবের আর বহু দুঃখ ও আনন্দ মেশা যৌবনের স্পর্শ পেতে চায়। এই অন্ধকারে, এই নির্জনে, এই আকাশভরা স্তব্ধতার মধ্যে এযেন তার নতুন জন্ম হয়।

মুক্তি পেছন ফিরতেই দেখল একটা ছোট নৌকো জোয়ারে ওপরের দিকে আসছে। তার মনে হল, গেঁওখালিতে যে জোয়ারে সে স্বামীজীর জন্য এতো বড় 'রিস্ক' নিয়েছিল সেই জোয়ার ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে হতে, নানা বাঁকের বাধা পেতে পেতে, তার ঘরের পাশ দিয়ে এখন বয়ে যাচ্ছে। এই স্রোত যাবে গোপালপুর স্কুলের পাশ দিয়ে, নন্দীপুর বাঁ পাশে রেখে সেই কাল্লিনগর পর্যন্ত। সেখানে বড় স্লুইস গেট। তার ওপারে ঝাউ আর বাদামের বন, বালিয়াড়ি। বালিয়াড়ি পার হলেই সম্পূর্ণ একটা নতুন পৃথিবী। সে পৃথিবী, সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর।

আশ্চর্য! মুক্তির জীবনের সঙ্গে, এই পায়ে পায়ে হেঁটে-আসা শাখানদীর স্রোতধারার কোথায় একটা মিল আছে। স্বামীজী জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের একটা উপমা দিতে গিয়ে, সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে নদীর স্রোতের মিশে যাওয়ার কথা একদিন বলেছিলেন। নদীর স্রোত মানেই আত্মা। মুক্তি আজকাল এসব কথা ভাবে। সে ভাবে, এই জীবনের সঙ্গে আরো

কোনো জীবনের যোগসূত্র আছে। তার জীবন যেন অনন্ত কালের যাত্রী। এই আত্মার স্রোতধারা বয়ে চলেছে, কোন এক জন্মে, কোনো এক কালে মুক্তির উদার সমুদ্রে নিঃশব্দে, নিঃশেষে মিশে যাবার জন্য।

আচ্ছা! মুক্তি এসব কি ভাবছে! মাঝে মাঝে এই সব চিন্তা তার সমগ্র মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। তখন এই পরিচিত সংসার, এই গ্রাম, ঘর, মাঠ, নদী—সব কোনো এক অজানা জগতের ছায়া বলে মনে হয়।

—ছোড়দি?

গোবিন্দদার ডাক শুনে মুক্তি দাঁড়ালো।

—ছোড়দি চানের জল দিছি!

মুক্তি সেখান থেকেই বলল—যা-ই।

মুক্তি বাড়ির দিকে ফিরছিল। পেছনে সাইকেলের শব্দ শুনে রাস্তার একপাশে সরে গেল।

সমর নামল সাইকেল থেকে। শক্ত, মজবুত হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরা আছে। মুক্তির মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—বাঃ, কথা বলবে না নাকি?

মুক্তি সুন্দর করে হাসল। বলল—এসো!

॥ ৫ ॥

মুক্তি বাঁশের গেটটা খুলে ধরতে সমর সাইকেলটা উঠোনে নিয়ে এসে বারান্দার একটা খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। বলল—কখন এলে? মাসিমা কোথায়?

মুক্তি বলল—রান্না ঘরে।

—সীতা কেমন আছে?

—একই রকম।

—জ্বর কমেছে ?

—কমেছে। এখন নিরানব্বুই।

সমর একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল—ছাখো, সীতার ব্রেনটা কোনোভাবে এ্যাফেক্‌টেড হয়েছে বলে মনে হয়।

মুক্তি বলল—দিদির কিন্তু সব জ্ঞান আছে। সব বুঝতে পারে। শুধু কেন যেন কথা বলতে পারছে না।

সমর বলল—আমি মাসিমাকে সকালবেলা বলেছি, সীতার ট্রিটমেণ্ট ঠিকমতো হচ্ছে না। মেসোমশায় কোথায় ? কলেজের মিটিঙে।

মুক্তি বলল—না। সমরদা, তুমি একটু বোসো। আমি স্নান করে আসি।

সমর বলল—বাঃ, আমি এলাম। তোমার স্নান করার তাড়া পড়ল।

—না, তাড়া পড়বে কেন ? তবে বিশ্রী লাগছে। যা গরম—

—একটু বসবে না ?

সমরের গলায় অনুরোধ শুনে মুক্তি তাকাল। একটু হেসে বলল—বসছি, বাবা, বসছি।

মুক্তি বেঞ্চটার একধারে বসল।

সমর খুশি হল।

মুক্তি বলল—প্রমোশনের খাওয়াটা কবে খাওয়াচ্ছ বল ?

সমর বলল—খাওয়াটা তোমার কাছেই আমার পাওনা।

—ও মা! কেন ?

সমর উত্তরটা সোজাসুজি দিল না। শুধু বলল—মৃন্ময়ের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল।

অর্থাৎ, মৃন্ময় শব্দটার মধ্যেই সমরের উত্তর রয়েছে। মুক্তি যেন একটু চমকে উঠল। বলল—তাই নাকি ? কোথায় ?

—আমার বাড়ি এসেছিল।

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে ?

—ঠিক জানি না। তবে বাবার সঙ্গে কি সব কথা ছিল।

মুক্তি বলল—জান না কেন? তোমরা দু-জন খুব বন্ধু ছিলে, একসঙ্গে পড়তে। কি ভাল লাগত আমার। অথচ এখন কেমন দূরে দূরে সরে যাচ্ছ

সমর গম্ভীর গলায় বলল—'দিস ইজ লাইফ'।

মুক্তি ভাবছিল, সমরদাও তবে জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে! অথচ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বা, এটা শুধু কথার কথা মাত্র।

সমর নিজেই বলতে লাগল—তার কাছে শুনলাম, তুমি আজ আসছ একবার এসে দেখে গেছি, এলে কিনা।

মুক্তি বুঝতে পারছিল, তার আসার কথা শুনেই সমরদা অস্থির হয়ে উঠেছে! সংসারে এক একজন মানুষ থাকে, যারা আনন্দকে বাইরে বড় বেশি প্রকাশ করে। ফলে, আনন্দকে মনের গভীরে গ্রহণ করার, লালন করার ক্ষমতা কমে যায়। আনন্দের অনুভব চিত্তের সেই স্তর পর্যন্ত পৌঁছোয় না যেখানে তা ফলবান হয়ে ওঠে। মৃন্ময়দা কখনো তা করে না। গভীর আনন্দে সে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

সমর বলল—কি হল? কথা বলছ না যে?

মুক্তি পরিবেশটাকে হালকা করে দিতে চায়। সে বুঝতে পারে, সমরদার তার জন্য এই অস্থির প্রতীক্ষার মধ্যেও সৌন্দর্য আছে, যে সৌন্দর্য শুধু ভালবাসার আলোয় বাজে!

মুক্তি বলল—আমার আসার যে এতো 'ইম্‌পর্ট্যান্স' আছে, তা তো জানতাম না!

সমর কিছু বলল না। শুধু উঠোনের বাগানটার দিকে চেয়ে রইল। দিদি অসুস্থ, তাই বাগানের গাছগুলো এখন লক্ষ্মীছাড়া শীর্ণ, দরিদ্র। আগাছায় ভরে গেছে।

মুক্তি আস্তে আস্তে বলল—সমরদা, তুমি মৃন্ময়দাকে ঈর্ষা কর কেন? সে তো কখনো কোনো কিছু জোর করে না!

সমর দার্শনিকের মতো বলল—'ঈর্ষা মহতের ধর্ম।'

মুক্তি বুঝতে পারল না, এর মধ্যে মহত্ত্ব কোথায় আছে। যাক্‌ বাবা! অত গুরুগম্ভীর কথা তার ভাল লাগছে না এখন। বলল—চা খাবে?

সমর বলল—থাক্।

কথাটা কেন যেন বড় খাপছাড়া ভাবে অন্ধকারে ভেসে রইল। না, অন্ধকারে নয়, মুক্তির মনে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—বসো স্নানটা করে আসি! চলে যেও না যেন!

কলতলার চারদিকে চাঁচের বেড়া দেওয়া বাথরুম। গোবিন্দদা বড় বড় দু-বালতি জল রেখে গেছে। চৌবাচ্চায়ও জল আছে কিছুটা। মুক্তি তোয়ালে আর সাবানটা রাখল। তারপর ঠাণ্ডা জল গায়ে পড়তেই মনে হল, শরীরটা জুড়িয়ে গেল।

স্নান করতে করতে সে সমরদার কথাই ভাবছিল। যেদিন প্রথম ওর সঙ্গে পরিচয় হয়, মানে প্রথম ভালবাসার পরিচয়টা স্পষ্ট হয়।

সেদিনের স্মৃতিটা মুক্তির আজো মনে আছে। ফুটবলে জিতে, সমরদা বাড়ি ফিরছিল। শেষ গোল ও-ই দেয়, তাতেই কলেজ জেতে। তবে সমরদা পায়ে ভীষণ আঘাত পেয়েছিল সে খেলায়।

মুক্তি নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছিল।

মিনিট কয়েক পরেই পেছনে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ। মুক্তি পেছন ফিরে দেখে, সমরদা আসছে।

আঃ, কী আনন্দ! কী আনন্দ! কাছে আসতে মুক্তি খপ করে হ্যাণ্ডেলটা ধরে ফেলল।—এ্যাই নামো।

সমর বলল—নামছি। সীতা কোথায়?

—দিদি, বাজারে ফিরে গেছে।

সমর বলল—শক্ত করে হ্যাণ্ডেলটা ধরতো। ভীষণ পায়ে ব্যথা প্যাডেল করতে পারছি না। নামতে হবে।

সত্যি সমরদা বেশ কষ্ট করে, বহু কসরৎ করে, ডান পায়ে ভর দিয়ে সাইকেল থেকে কোনভাবে নামল। বাঁ পায়ের জয়েন্টটা খুব ফুলে গেছে।

তখন দুজনে সেই নদীর ধারে। কোথাও কেউ নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে তখন।

মুক্তি বলল—এ্যাই সমরদা, একটা কাণ্ড করতে পারবে?

—কি কাণ্ড ?

—আমাকে সাইকেলে করে নিয়ে পালাতে পারবে ? দিদি এসে যা একখানা বোকা হয়ে যাবে না !

সমরদা বলল—না, বাবা। আদৌ প্যাডেল করতে পারছি না। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

মুক্তি কি যেন ভাবল একটু। আসলে এই মুহূর্তে সমরদাকে একা একটু পেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে তার। এক্ষুনি, দিদিটা এসে পড়বে। তখন সব মাটি !

মুক্তি বলল—এ্যাই ? সাইকেলের সামনে বসতে পারবে ? এই রডের ওপরে।

সমর বলল—তা পারব। কিন্তু—

—'নো' কিন্তু, বোস। হ্যারি আপ ! আমি চালিয়ে নিয়ে যাব।

সমরদার বিশ্বাস হচ্ছে না। বলল—একটা পা ভাঙা বাকিটার আশাও তাহলে ছাড়তে হয়। আমি যাব না, বাবা।

মুক্তি বলল—ও, এই তোমার সাহস ? পাঁচটা গোলে হারাই উচিত ছিল। ভীরু, ভীরু কোথাকার !

সমরদা বলল—ভীরু নয়, বাবা। ফেলে দিলে তখন কি হবে !

—কি আর হবে ? বড়জোর—

—বড়জোর খোড়া হয়ে যাব।

সমরদা হাসছিল। বোধহয় লোভও হচ্ছিল একটু একটু। মুক্তি কোমরে আঁচল জড়াল। বলল রেডি। আমার লেডিস সাইকেলটা হলে ডোণ্ট কেয়ার। তোমাদের এই সাইকেল। তা হোক, একবার চেষ্টা করি। ব্রেকদুটো ঠিক আছে তো। মুক্তি নদীপাড়ের উঁচু একটা জায়গায় সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে কোনোভাবে উঠল। তারপর বলল, ওঠো। আঃ হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরছ কেন ? হ্যাঁ ঠিক আছে। সে জানে একবার স্টার্ট নিতে পারলেই ব্যস্। এমনি কোন উঁচু জায়গায় পা রেখে নামবে। মাইল দুই আড়াই রাস্তা মাত্র। আর রাস্তাও খুব সুন্দর !

একটু চলার পর মুক্তি বলল—আর ভয় নেই সমরদা। "নাউ ইউ ক্যান ডিপেণ্ড আপন মী"।

মাইল খানেক চলে আসছে। পাশের গ্রামের তু'একজনকে পেরিয়ে এল মুক্তি। লোকগুলো যেন সার্কাস দেখছে। একটি বৌ বাজারের দিকে চলেছে ছেলে কোলে করে। একবার তাকিয়ে হাসল।

এদিকের রাস্তাটা ক্রমশ নির্জন হচ্ছে।

আঃ, মুক্তি সেদিন খুব কাছ থেকে সমরদাকে দেখছিল। এ খুব আপনার করে দেখা। সমরের মাথা থেকে একটা অচেনা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছিল মুক্তি। কি তেল মাখে কে জানে। সীটের সামনের জায়গাটা সংকীর্ণ বলে তুজনের শরীর খুব কাছাকাছি তখন। মুক্তি সেই প্রথম দেখল, সমরের কপালটা বেশ চওড়া। খেলার জন্য ঘাম হয়েছিল। এখন শুকিয়ে গেছে! সমরদা সত্যি খুব সুন্দর দেখতে। ছেলেরা যে এতো সুন্দর হয়, মানে মেয়েদের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি সুন্দর, সমরদাকে এই মুহূর্তে না দেখলে মুক্তি কখনো তা জানত না। বোধহয় অন্য মেয়েরাও তা জানে না। আর তখনি, তখনি একটা অন্ধ আবেগে সমরদার কপালে মুক্তি—।

সমর অবাক হয়ে গেল।

মুক্তি বলল—ইস্, লজ্জা পেলে বোধহয়।

সমর বলল—ওটা তোমাদের লাগে! কিন্তু—

মুক্তির কী ভাল লাগছিল। বলল—আমি লজ্জাবতী লতা নই। 'ইউ সুড্ নো ইট'।

কিন্তু এবার মুক্তির হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গেল একটু।

তখন তার তুটো ঠোঁটে প্রথম প্রার্থিতপুরুষের নিঃশব্দ স্পর্শ। মুক্তির সারা শরীর তখন ভোরের শিউলি ফুলের মতো শিথিল বৃন্ত হয়ে উঠেছে। সে লজ্জাবতী লতা নয় বলে এতো অহংকার করেছিল, এতো দম্ভ ছিল মনে, সে অহংকার, সে দম্ভ তার এখন ধুলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে। সত্যি, এখন মুক্তি চোখ তুলে তাকাতেই পারছে না! তখনো তার চোখ, কপালে—মাটিতে প্রথম বৃষ্টির স্পর্শের মতো করুণ শিহরণ! সমরদা পিঠে হাত রাখল, যাতে

মুক্তির মুখটা আরো একটু নুয়ে আসে। ধানের পুষ্ট, দীর্ঘ অথচ সবুজ শিষের মতো মুক্তির মুখ সত্যি নেমে আসছিল।

সমরদা একটু সরে গেল। বলল—আরেঃ, হ্যাণ্ডেলটা ঠিক করে ধর। নদীর বড্ড ধারে এসে গেছি।

মুক্তি এখন বড্ড ঘামছিল। ভয়ে ভয়ে বলল— আর পারছি না, সমরদা। বড্ড টলছে সাইকেলটা। এ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে যাবে।

সমর হেসে বলল - এখনও হয়নি ভেবেছ।

মুক্তি ওর দিকে সুন্দর করে তাকালো।

সমর বলল—তাহলে দাঁড়াও। বলেই নিজে ব্রেকটা চেপে ধরল। বলল—বাঁ পাটা মাটিতে ঠেকাও। তারপর অনেক কষ্টে নামল।

দুজনে কতোক্ষণ সেই নদীর ধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তির মনে হচ্ছিল, এই চুপ করে থাকারও একটা ভাষা আছে, ভয়ও আছে। চার-দিকটা তখন নির্জন, ছায়ায় ঢাকা, শান্ত। মুক্তির মনে সেই ছবিটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। একটা ভীষণ ভাললাগার সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম পাপবোধ কেন যেন তাকে বিষণ্ণ করে তুলছিল। সত্যি কিছু ঘটে গেল জীবনে। মুহূর্তের স্মৃতি সারাজীবনের দেওয়ালে অক্ষয় গুহাচিত্র এঁকে রেখে গেল।

সমর মুক্তির হ্যাণ্ডেল-ধরা হাতটার ওপর আস্তে আস্তে হাত রাখল। মুক্তি এই প্রথম উপলব্ধি করল, তার জীবনে শ্রেষ্ঠ যা কিছু, সুন্দর যা কিছু, পরমতম রমণীয় যা কিছু, সে এই সন্ধ্যার একাকীত্বের মধ্যে সমরদার হাতে তুলে দিয়েছে। নিজের বলে, ভবিষ্যতের জন্য আর কিছুই রাখেনি সে। ভালবাসা বোধ হয় গ্রাম থেকে দূরে এই নদীতীরের মাটির রাস্তার মতো এক শব্দহীন বৈরাগ্য।

দূর থেকে দেখা গেল সীতা তাড়াতাড়ি আসছে।

কাছে এসে অবাক। বলল—আরে, দু-জনে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?

সমর উপস্থিত বুদ্ধি রাখে খুব। বলল—তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু গলাটা কেঁপে গেল একটু।

সীতা দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু শুধু হাসল।

বলল—চল।

কিন্তু সে চলা যে কী আনন্দের, কী দুঃখের, তা যদি দিদি সেদিন জানতো!

॥ ৬ ॥

স্নান সেরে মুক্তি নিজের ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটু পাউডার মেখে নিল। সাদা খোল, আর কালো পাড়ের শাড়িটায় তাকে বেশ সুন্দর লাগছে।

আরে, সে এই শাড়িটা পরল কেন? সমরদা সাদা শাড়ি আদৌ পছন্দ করে না। জমকালো রঙের, বিশেষ করে 'ডীপ' লাল রঙের শাড়ি তার খুব পছন্দ। এই শাড়িটা সবচেয়ে পছন্দ করে মৃন্ময়দা। মৃন্ময়দাও আসবে। মুক্তির অবচেতন মনে, একি তারই অভ্যর্থনা। একবার ভাবল, শাড়িটা পাল্টে যায়। কিন্তু ততক্ষণে চা-টা জুড়িয়ে যাবে। সমরদা নিশ্চয়ই তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠছে। তার চা-টাও জল হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে বোধহয় মেজাজটাও উত্তপ্ত হয়ে যাবে—ভেতরে ভেতরে।

সমর তাই বলল—হঠাৎ বিধবার মতো শাড়িটা?

মুক্তি বলল—ওটাই হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। জানি তুমি রাগ করবে। কিন্তু ছাখো, এদিকে চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। কতোদিক সামলাই বল।

সমর একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল—আমি নির্বোধ নই। সিল্কের শাড়ি পরলে তোমাকে সুন্দর মানায়। কেন যে ঐ খদ্দর-টদ্দর পর?

মুক্তি বলল—কেন পরি জান না? গরীব বলে। বড়লোক হলে সিল্কের শাড়ি পরেই রান্নাবান্না করতাম। এই যেমন তুমি। দেশে এসে দামী সার্ট

ট্রাউজার ছাড়া রাস্তায় বের হ'তে একদিনও দেখলাম না তোমাকে ? নেহাৎ লজ্জা লাগে বলে টাই পর না বোধহয়।

সমর বলল—কেন ? প্রিন্ট পরতে পার। সুন্দর সুন্দর রঙের পাওয়া যায়।

মুক্তি বলল—পাওয়া যাবে না কেন ? আমার খদ্দর ছাড়া কিছু পরতে ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না।

মুক্তি বলল—আমি 'ট্রু সোশ্যালিস্ট' বলে। —তুমি সে জিনিস বুঝতে পারবে না। চা খাওয়া হয়ে গেছে ? কাপটা দাও।

সমরের কাপটা হাতে নিতে গিয়ে মুক্তি বুঝতে পারল—ওর গা-টা গরম লাগছে। বলল—তোমার জ্বর নাকি ?

সমর বলল—না। মাথাটা ধরেছে একটু।

—কেন ?

—ঘুম হচ্ছে না কিছুদিন থেকে। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। একটু বেড়াতে যাবে ?

মুক্তি কি যেন ভাবল। বলল—বড্ড টায়ার্ড লাগছে। আজ থাক, কাল যাব।

সমর বলল—না, আজ চল। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—ছুটি কদ্দিনের ?

—দিন পাঁচেক।

—হঠাৎ, এ সময় বাড়ি এলে ?

—বাবা, আসতে লিখেছিলেন।

—কেন ?

—বিয়েটিয়ের ব্যাপারে দরকার ছিল। তাছাড়া জমিটমি নিয়ে—সে তুমি বুঝবে না।

মুক্তি ভেবে নিল, এ সময় মৃন্ময়দা যদি আসে ? যদি সে ফিরে যায়—

সমর ব্যস্ত হয়ে উঠল—কি ভাবছ ?

মুক্তি একটু ইতস্তত করল।

সমর বলল—মৃন্ময় এখন আসবে না।

মুক্তি চমকে উঠল। বলল—মৃন্ময়দার কথা ভাবছি তুমি জানলে কি করে? আর আসবে না কেন? মা বলছিল, সকালে এসেছিল একবার।

সমর বলল—ওর বাবার কোথায় যেন এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। আশ্রমে দেখলাম অনেক লোকজন।

মুক্তি মনে মনে ভাবল—ও, স্বামীজী তবে বাড়ি এসেছেন! কিন্তু আবার কিছু হল না তো? বলল—কেমন আছেন, জান?

—ঠিক জানি না।

কি হল? বেড়াতে যাবে না? এতো করে বলছি! মুক্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সমর বলল—এ্যাই, প্লিজ! চল, বড্ড মাথা ধরছে আমার!

মুক্তি এই মুহূর্তে একবার মৃন্ময়দার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চায়। কিন্তু সমরদাকে সে কি বলবে? সমরদা বড় জেদি। আশ্চর্য দোটানায় পড়ে গেছে মুক্তি। ভেবে ভেবে বলল—ক'টা বাজে?

সমর ঘড়ি দেখে বলল—সোয়া সাতটা।

—ও, আচ্ছা চল। আমি কিন্তু বড্ড টায়ার্ড। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। তখন রেগে যেও না যেন!

নদীর ধারে একটা ঘাসের চাপড়া দেখে দু-জনে বসল। অনেকক্ষণ দু-জনের কেউ কোন কথা বলছিল না। সময়টা এখন কেন যেন ভারি হয়ে উঠছে।

একটু পরে সমর বলল—অন্তত গোটা পাঁচেক চিঠি লিখেছি তোমাকে। একটাও পাওনি?

মুক্তি বড় দুর্বলতা বোধ করছিল। সে জানতো সমরদা এসব কথাই তুলবে। একটু কেশে নিয়ে নিচু গলায় বলল—পেয়েছিলাম।

— একটারও উত্তর দাওনি!

—না।

—কেন?

মুক্তি আস্তে আস্তে বলল—সময় হয় নি।

—কথাটা যে ঠিক বলছো না তা তুমি নিজেও জান। আচ্ছা। যদি বাড়ি না আসতাম, তবে তো দেখা হতো না তোমার সঙ্গে।

—না।

—তাহলে? চিঠিরও জবাব দেবে না, দেখাও হবে না। 'রিলেশানটা' বোধহয় তুমি রাখতে চাও না?—'বি ফ্র্যাঙ্ক প্লিজ'।

মুক্তি বলল—আমি কিছুদিন থেকে বড্ড 'ডিসটার্বড্' আছি সমরদা। তাই সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

সমর বলল—আমি যতদূর জানি, তোমার আমার মধ্যে কোনো 'মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' হয় নি। আই মীন—ফাণ্ডামেণ্টাল মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। ঝগড়া হয়েছে। হতে পারে। অভিমানও হয়েছে। কখনো কখনো দুজনে কথাও বলিনি কিছুদিন। কিন্তু ভালবাসার অভাব আমাদের মধ্যে কখনো হয় নি। অন্তত আমি আমার দিক থেকে বলতে পারি।

মুক্তি নির্বাক বসে রইল।

সমর বলল—তুমি জান, আমার বিয়ের অনেক সম্বন্ধ আসছে। তার মধ্যে আমার ডাইরেক্ট 'বস'-এর মেয়েও আছে। কোয়ার্টারে একা থাকতেও ভাল লাগে না। বড় 'লোনলি' লাগে। বেয়ারা, বাবুর্চি, এদের সহ্য করতে পারছি না।

মুক্তি শুধু বলল—বুঝতে পারি।

সমর বলল—আমার 'বস' বাবার কাছ পর্যন্ত দৌড়েছেন। জানো? টেলিগ্রাম করেছেন, আমি যেন কলকাতা হয়ে যাই।

মুক্তি আগেও শুনেছে কিছু কিছু। ওর মনে সেই চিরন্তন আগ্রহটাই এতক্ষণে মুখর হয়ে উঠল। বলল—মেয়েটিকে দেখেছ?

—দেখেছি।

—তোমার কোয়ার্টারে আসে না!

—আসে কখনো কখনো।

—কি করে? মানে—

— কনভেন্টে পড়তো। এবার পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছে।

দেখতে কেমন?

সমর হঠাৎ একটা অন্ধ আবেগে মুক্তির মুখটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল। বলল—আমি আর কাউকে সুন্দর দেখার দরকার মনে করিনে! এটা তোমাকে বলার দরকার হবে ভাবি নি!

মুক্তি আর পারছিল না। তার চোখে জল এল। সমরদার আশ্চর্য ভালবাসা। বলল প্লিজ, ছাড় একটু।

সমর ছাড়ল না। বলল—আমার একটা কথারও জবাব দাও নি। আমি জানতে চাই!

বোধহয়, এই শারীরিক ঘনিষ্ঠতাটুকু সমরকে উত্তপ্ত করে থাকবে। কারণ ক্রমশ সে শক্ত হচ্ছিল। তার হাতের তপ্ত স্পর্শটা আরও তীব্র হচ্ছিল। অন্যদিন হলে, যখন ওরা সহজ ছিল, স্বাভাবিক ছিল, দু-জনের দু-জনকে কাছে পাওয়াটা যখন সকালের রোদের মতো সুন্দর ছিল, তখন— মুক্তি নিজেকে একটা পবিত্র, সুন্দর, সতেজ গন্ধরাজের মতো দ্বিধাহীন চিত্তে সমরের কাছে তুলে দিত। অথচ আজ? আজ কেন যেন সে ভিজে বারুদের মতো। অথবা ছেঁড়া তারের মতো। আজ বুকের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ গুমরে গুমরে উঠছে শুধু! কিন্তু কেন এ কান্না। সে কি তার মৃত ভালবাসার জন্য!

মুক্তি খুব আস্তে আস্তে বলল—শোন সমরদা!

গলার স্বর শুনে সমর একটু অবাক হলো যেন। বলল—কি শুনব?

নদীতে এখন ভাটা। একটা ছোটো নৌকো এই ভাটায় নরঘাটের দিকে নেমে যাচ্ছিল। মুক্তি সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বলল— হ্যাঁ. বলছি!

॥ ৭ ॥

কতক্ষণ সেই অপসৃয়মান নৌকোটার দিকে তাকিয়ে ছিল মুক্তি। তার মনে পড়ছিল, নৌকোটা যে ভাটার স্রোতে এখন হলদী নদীর দিকে চলেছে সে স্রোত সবশেষে এক সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গেই মিশে যাবে।

স্বামীজী একবার জীবাত্মা আর পরমাত্মার কথা বলতে গিয়ে এই স্রোতের উপমা দিয়েছিলেন। নদী হলো জীবাত্মার প্রতীক, সমুদ্র পরমাত্মার। এই নদীর স্রোতের পরিপূর্ণতা সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে নিঃশেষে মিশে যাওয়ার। এবং মুক্তির তখনি মনে হচ্ছিল, যে মিলন জীবনকে সেই উত্তরণের দিকে না নিয়ে যায়, এই মুহূর্তে সে মিলন যত উজ্জ্বল, যত আকাঙ্ক্ষিতই হোক, সে মিলন যথার্থ নয়, পবিত্র নয়, পরিপূর্ণ নয়।

অর্থাৎ মুক্তির কাছে সেই মৌলিক প্রশ্ন—প্রেয় অথবা শ্রেয়। সে কাকে বেছে নেবে, প্রেয়কে না শ্রেয়কে! প্রেয় লোভনীয়। সে সাময়িক পিপাসা মেটায়। কিন্তু চিরকালের পিপাসা কে মেটাবে? চিরন্তন পিপাসার পানীয় কোথায়? প্রেয়কে বরণ করলে শরীরের তৃষ্ণা না হয় মিটল। হ্যাঁ, সে তৃষ্ণাও সুন্দর। কারণ শরীরও "টেম্পল অফ গড", ঈশ্বরের মন্দির। কিন্তু সেই মন্দিরে যে উদাসীন বিগ্রহ চিরকালের আকাশের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ বসে আছেন, তাঁর আহ্বান কে শুনবে, তাঁর তৃষ্ণা কে মেটাবে! এবং আজ যদি জীবনের কোনো জানালা তাঁর দিকে খোলা থাকে অর্থাৎ আজ যদি শরীরের সুখই তার একমাত্র কাম্য হয়ে থাকে, তবে সে আহ্বান আদৌ এ জন্মে বাজবে কি না!

সমর ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। বলল—কি বলতে চাচ্ছিলে?

মুক্তি সমরের মুখের দিকে তাকালো। তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল—দিদির অসুখ। মনটা ভাল নেই। তাই বলতে গিয়ে একটু "রুড" হয়ে যেতে পারি। তুমি রাগ

করবে না তো ?

সমর বলল—কথাটা না শুনে আগে থেকে কি করে বলব ?

—না থাক্। বলতে ইচ্ছে করছে না। চল এখন উঠি। তোমার শরীরটা আজ ভাল নেই।

সমর বলল—আজ নয়, অনেক দিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না। সে কথা নয়। কথা হলো, তোমার মনে যে 'কনফ্লিক্ট' এসেছে, দ্বন্দ্ব এসেছে, তা তোমার বলাই ভাল! ওতে আমিও শান্তি পাব।

মুক্তি বলল—যদি শান্তি না পাও।

সমর বলল—আমি এখনো একজন স্পোর্টসম্যান মুক্তি। 'সিওর ডিফিট' জেনেও আমি লড়ে যেতে পারি। তুমি আমাকে ভুলে যাচ্ছ।

না, মুক্তি নিশ্চয়ই সমরদাকে ভুলে যায় নি। এ অঞ্চলের বহু মাঠে সমরদার কীর্তি আজও লেখা আছে। কিন্তু ফুটবলের প্রান্তর, আর জীবনের প্রান্তর এক নয়। সমরদার সেই উপলব্ধিতে পৌঁছতে এখনো দেরি আছে।

বিরোধ মূলত সেইখানে।

মুক্তি বলল—তোমার সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব, তাই না সমরদা ?

সমর বলল—শব্দটা শুধু বন্ধুত্ব নয়, শব্দটা ভালবাসা।

মুক্তি কেমন উদাসীন গলায় বলল—হ্যাঁ, তাই, আচ্ছা, তুমি একটা সহজ উত্তর চাচ্ছ, তোমাকে বিয়ে করব কি না!

সমর বলল—তোমার মনে কিছু একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, আমার মনে নয়। আমার মনে সন্দেহ নেই, কখনো ছিল না। তবে অভিযোগ আছে। তোমার ভালবাসায় আমি কখনো সন্দেহ করিনি, যদিও তোমার মন অন্যত্র বাঁধা পড়তে চলেছে, বা বাঁধা পড়তে পারে, এমন একটা আভাস আমি কিছুদিন থেকে পেয়েছি।

সমর উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। এবার থামল।

মুক্তি বলল—প্লিজ, টেম্পার হারিয়ো না। আচ্ছা ধর, আমরা বিয়ে করলাম। তারপর ?

—তারপর আমার দুর্গাপুরের সেই ওয়েল ফার্নিশড্ কোয়ার্টার। সেখানে,

আমরা দুজন থাকব। কখনো এখানে। বাবা, মা এ বিয়েতে হয়তো একটু আপত্তি করবে। কিন্তু তুমি তো জানো, আমাকে।

—বেশ। তারপর?

—আমাদের ছেলেমেয়ে হবে।

কথাটা শুনে আজ মুক্তির মনে কোনো প্রতিধ্বনি বাজল না। বরং খারাপ লাগল। এর মধ্যে যে ইঙ্গিত লুকানো ছিল মুক্তি আজ তাতে খুশি হলো না। কারণ আগে সে মনে করতো এটাই ভালবাসার শেষ পরিপূর্ণতা। আজ তা সে মনে করে না।

সে বলল—আচ্ছা, সমরদা তুমি আমাকে ভালবাস?

সমর রূঢ়ভাবে বলল—প্রশ্নটা অবান্তর।

মুক্তি তবু বলল—অবান্তর হোক। তবু বল।

সমর বলল—বেশ, হ্যাঁ, ভালবাসি।

—কেন ভালবাস তুমি?

—তুমি সুন্দর বলে।

মুক্তি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—সমরদা, আমি সুন্দর, তাই না?

—নিজের রূপের প্রশংসা শোনা খুব ভাল নয়।

মুক্তি বলল—না, না, প্রশংসা শুনতে চাচ্ছি না। আমি শুধু তোমার চোখ দিয়ে আমার 'রিয়েল' মূল্যটা কোনখানে, সেটাই যাচাই করতে চাচ্ছি।

সমর কিছু বুঝতে পারল না।

মুক্তি একটু হেসে বলল—সব কিছুকে 'ফেস ভ্যালু' দিয়ে বিচার করতে তুমি জানো। তুমি রিয়েলিস্ট, মেটিরিয়ালিস্ট তো বটেই।

সমর বলল—ভালবাসি তুমি সুন্দর বলে। যদি তাই বলি?

—বেশ, সুন্দর কাকে বলে?

সমর বোধ হয় প্রথমটায় বুঝতে পারল না কি বলবে। একটু ভেবে বলল—সুন্দর কাকে বলে—তাতো বলতে পারছিনে। তবে দেখতে ভাল লাগে।

মুক্তি বলল—ছাখো, যৌবন মাত্রেই সুন্দর। আমার বয়সের যে কোন

মেয়েই কোন না কোন পুরুষের চোখে সুন্দর। এ সৌন্দর্য একটা 'ফিজিক্যাল রিফ্লেকসান' কিন্তু এ যে চোখের দেখা, এই যে ভাল লাগা—এর মূল্য কি? এবং কোনটা এই মূল্য বিচারের শেষ কথা? চোখ-ই কি ভালবাসার শেষ বিধাতা? সমরদা, রবীন্দ্রনাথের এক নাটকের অন্ধ বাউল কিন্তু চোখের বাইরের আলো দিয়ে বিশ্বকে দেখতে চেয়েছিল। বলেছিল, পৃথিবীতে যখন আলো নেই, হৃদয় তখন সে আলোয় পরিপূর্ণ। তেমনি করে, চোখের ক্ষুধায় না দেখে, মোহের ঝলকানি থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে, একবার আমাকে ছাখোতো—তারপর বল, আমি সুন্দর কি না?

সমর চুপ করে রইল। বোধ হয়, সে কোন কিছু বুঝতে পারছিল না। বলল—ননসেন্স। ওসব হেঁয়ালি রাখ। তোমার মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

মুক্তি সমরদার কথায় কান দিল না। বলল—আচ্ছা, সমরদা চোখ কি সব ছাখে?

সমর অবাক হয়ে বলল—মানে?

—মানে, মনে কর—আমি, এই যে নদী, মাঠ, আকাশ বা তোমাকে দেখছি—সে কে দেখছে? আমার চোখ? চোখ তো একটা ইন্দ্রিয়। একটা 'অরগ্যান'।

সমর বলল—হ্যাঁ, চোখই দেখছে।

মুক্তি বলল—যখন আমি মারা যাব, অথচ চোখের সকল 'প্রসেস' ঠিক থাকবে, তখন কে দেখবে?

সমর একটু ঘাবড়ে গেল। হেসে বলল—এ নিয়ে তো আমি কখনো ভাবিনি।

মুক্তি বলল—প্রশ্নটা তোমাদের কমার্সের আওতায় পড়ে না। মেটিরিয়ালিস্টিক কনসেপসনের আওতায়ও পড়ে না। ওটা ফিলসফির আওতায় পড়ে। আসলে কি জানো, এই যে শরীরের সৌন্দর্য, এর কোন স্থায়ী মূল্য নেই! আজ আমাকে যা দেখছ, পাঁচ বছর পরে তা দেখবে না। কারণ এ শরীর থাকবে না। এই ক্ষয় হয়ে যাওয়াই পৃথিবীর নিয়ম। আজ

আমাকে কাছে পেতে তোমার খুব ভাল লাগে, না হলে তুমি পাগল হয়ে ওঠ। আমি বুঝতে পারি। কারণ তোমার সকল চাওয়া, আমার এই শরীরের মধ্যেই সঞ্চিত আছে বলে তুমি মনে করেছ। এই 'মেটিরিয়ালিস্টিক' দেহটাকেই অধিকাংশ লোক সত্য বলে জানে।

সমর চুপ করে বসে রইল।

মুক্তি ভাবছিল, সমরদা বোধহয় ক্ষুণ্ণ হ'ল। বহুদিন পরে দেখা হবার পর, মুক্তি এই মুহূর্তে এমন একটা দূরত্ব সৃষ্টি করছে, এমন সব কথা বলছে, যাতে তাব পক্ষে ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

গতবার পূজোর সময় যখন দেখা হয়, তখন মুক্তি কত সহজে সমরদার খুশিব কাছে নিজেকে সুন্দর করে তুলে ধরেছিল। তারা একসঙ্গে বেড়িয়েছে, একসঙ্গে খেয়েছে, দুষ্টুমি করেছে, ঘরে বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে। মুক্তি কোনদিন কোন কিছুতেই কৃপণ নয়। তার যে অনেক আছে, দিয়েও তা কখনো শেষ হয় না। বরং কখনো কখনো আরো পূর্ণ হয়, ঠিক ঘরের আলোর ওপর, জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়ার মতো সেই পূর্ণতাটা। এবং সেই উপলব্ধি থেকে আজকের এই নির্জনতার দূরত্ব যে বড় বেশি! বড় কঠিন।

সমর গম্ভীর ভাবে বলল—আমার একটা কথা আছে।

মুক্তি বলল—বেশ বল।

সমর বলল—এতোদিন আমি যা কিছু করেছি, ভেবেছি, দেখেছি সে দুজনের চোখ দিয়ে। সব কিছু ঘটনায় তোমার-আমার সমান অংশ ছিল। যেমন, যখন কোয়ার্টার পাই, তখন ভেবেছি, এ আমার-তোমার কোয়ার্টার। অন্য বিয়ের কোন প্রস্তাবকে আমি পাত্তা দিইনি। আজও দিচ্ছি না, বাবা বলেছে, মা বলেছে। কারণ, তুমি-আমি একই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। তোমার মনে পড়ে না?

মুক্তি বলল—পড়ে। যখন আমি বি. এ. দিচ্ছি, তখন তোমাকে আমি একদিন কথা দিয়েছিলাম।

সমর বলল—আজ কিন্তু তুমি সব কিছু তোমার নিজের "টার্ম"-এ ভাবছ। আজ তুমি 'আমরা' বল না, 'আমি' বল। এটা বাইরে হয়তো খুব

বড় একটা পরিবর্তন নয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা বিপ্লব। আমার অভিযোগ, আমার দুঃখ, সেইখানেই।

মুক্তি চুপ করে রইল। সে উপলব্ধি করছিল, সমরদার কথার সুরে বড় দুঃখের আভাস।

সমরদা কখনো করুণ সুরে কথা বলে না।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর একসময় সমর বলল—কি এতো ভাবছ?

মুক্তি বলল—ছাখো, সমরদা, তুমি ঠিকই বলছ। আমি এখন নিজেকে নিয়েই ভাবি। সত্যি, আমার এ ভাবার সঙ্গে আগের ভাবার মিল নেই। কিন্তু তুমি বুঝতে পার, জীবন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। থাকলেই তার মৃত্যু হয়।

সমর বলল—প্লীজ মুক্তি, একটু সোজা করে বল।

মুক্তি বলল—প্রতিদিন আমাদের মধ্যে নতুন চিন্তা আসে। আমরা নতুন করে ভাবি। নতুন করে জন্ম নিই। তুমি ভাব তোমার অফিসের কথা—

সমর বলল—আমি তোমার কথাই বেশি ভাবি।

মুক্তি বলল—হ্যাঁ, ভাব। কিন্তু সেই "আমি"টাই যে পাল্টে যাচ্ছে, সমরদা।

সমর বলল—যেমন?

—যেমন, হলদীনদীর স্রোতের পলিমাটিতে চর গড়ে ওঠে। আবার কোন দিন সে চর ধুয়ে যায়। এই ভাঙাগড়া কারুর কারুর জীবনে বড় সত্য হয়ে ওঠে। সকলের যে হয়, তা বলব না। তবে আমার বেলায় তা সত্য। জীবন যখন পাল্টে যায়, তখন জীবনের উপলব্ধিরও কারুর কারুর পরিবর্তন হয়, যেমন আমার হয়েছে। একদিনের সত্য, কি আর একদিনের মিথ্যে হয় না? শিশু তো খেলাকেই তার জগৎ বলে মনে করে। সেটাই তার কাছে সত্য। কিন্তু মনের শৈশব চলে গেলে, তার সেই খেলনাকেই আবর্জনা বলে মনে হয়। তাই না? এই 'চেঞ্জ', এই পরিবর্তন না এলে, শিশু যে কখনো মানুষ হয়ে ওঠে না। কাজেই সত্যকে কখনো কখনো 'পারস্পেকটিভ্' দেখে

বিচার করতে হয়।

সমর বলল--ভালবাসারও কি এমন পরিবর্তন হয়? কৈ, আমি তো আজো তোমাকে ঠিক তেমনি করে ভালবাসি। আমার তো পরিবর্তন হয়নি।

মুক্তি বলল—এই কথাটাই যে আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলছে। তুমি তোমার সত্যে ঠিক আছ। কিন্তু সমরদা, আমি যে থাকতে পারছিনে। আমি যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি, তোমার ওপর বড্ড অবিচার করলাম। কিন্তু, কিন্তু আমি যে পারছিনে। কে আমাকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে চায়। সমুদ্রের কাছে এলে স্রোত যেমন খুব তীব্র হয়, তেমনি করে কে যেন আমাকে টানছে। আমি থাকতে পারছিনে। থাকার ক্ষমতা, শক্তি আমার নেই!

সমর স্থির গলায় বলল– সে কে? মৃন্ময়?

মুক্তি বলল—না, ঠিক মৃন্ময় নয়। সে আমার জীবনের একটা ভীষণ গোপন সুর। কেন যেন মনে হয়, তুমি আমি ঠিক পূর্ণ নই। পূর্ণ হতে পারব না কখনো! আমরা যাকে সত্য বলে মনে করছি, সে একটা আচরণ মাত্র। সে একটা খোলস! আমরা আসলে আমাদেরই চিনিই না। চিনি না বলেই, আমাদের কাছে আমাদের আসল পরিচয় প্রকাশ হয়নি, প্রকাশ হয় না!

সমর বলল—স্বামীজীর কাছে দীক্ষাটিক্ষা নিয়েছ নাকি? শুনি নাকি উনি কি সব অলৌকিক কাণ্ড করেন।

মুক্তি আগ্রহ নিয়ে বলল—আমাকে তুমি বুঝতে পেরেছ? এতক্ষণ আমি, সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম, বোঝাতে চেয়েছিলাম।

সমর নিস্পৃহ গলায় বলল—হ্যাঁ আমিও বুঝেছি।

—কি বুঝেছ সমরদা।

—বুঝেছি, তুমি আমাকে আজো ভালবাস। তবে মাঝে মাঝে তোমার মনের মধ্যে ভাবনা হয়, সত্যি আমরা ভালবেসে সুখী হব কি না!

মুক্তি বলল—ঠিক তাই।

সমর বলল—সুখী হয়েছি কিনা—যারা প্রতিদিন সেই কথাটাই ভাবে, তারা কখখনো সুখী হয় না। ঐ ভাবতে ভাবতেই দিন চলে যায় শুধু!

—তবে?

—কোন কিছু না ভাবাটাই বেঁচে থাকার বড় আনন্দ। এতক্ষণে মাথার গণ্ডগোলটা গেছে। বাঁচা গেল! ও, আমাকে যা ভাবিয়ে তুলছিলে!

সমর খুশি হয়ে মুক্তির মুখটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিল। আর মুক্তি এই মুহূর্তে, সেই বহুদিন আগে, ফুটবল ম্যাচের শেষ, নদীতীরে সাইকেলে যেতে যেতে ফেলে আসা গন্ধটা যেন পাচ্ছে!

সমর মুক্তির ঠোঁট দুটো মুছে দিচ্ছিল। সে কতক্ষণ এমনি এক বিস্মৃত শিথিলতার মধ্যে সমরদার কোলে মাথা রেখে পড়েছিল, এখন মনে করতে পারছে না।

হঠাৎ তার মনে হ'ল তবে কি সে আবার পূর্ব জন্মে ফিরে যাবে? এ জীবনে তার জন্মান্তর ঘটবে না? কত জন্ম এমনি করে কেটে যাবে—শুধু রক্তমাংসের সেই আদিম চাহিদা মেটাবার জন্য? নদীর ওপার থেকে স্রোতের শব্দের মতো আত্মার কান্নাই সে শুনবে, আর কিছু নয়। এক সময় চোখ খুলতেই মুক্তি দেখল নদীধার থেকে কি একটা এঁকে বেঁকে উঠে আসছে। কালো, কিন্তু দেখতে সুন্দর উজ্জ্বল। ক্রমশ এগিয়ে আসছে তার দিকে। এই বোধহয়, তার শরীরে মৃত্যুর মতো একটা বিষাক্ত ক্ষত চিহ্ন এঁকে চলে যাবে! ঐ এল! ঐ এল বলে!

মুক্তি ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

সমর বলে উঠল—আঃ কি হ'ল তোমার?

মুক্তি বলল—দেখছ না?

—কি দেখব?

—একটা সাপ, বিষাক্ত সাপ, ঐ, ঐ যে!

॥ ৮ ॥

আশ্রমে যেতে হলে মৃন্ময়দার বাড়িটা বাঁদিকে রেখে নদীধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে হয়। প্রাইমারী স্কুলটার পাশ দিয়ে একটা সরু আলপথ গ্রামের দিকে চলে গেছে। গ্রামের ওপারের মাঠ পার হলেই নরঘাট তমলুকের পাকা সড়ক।

মুক্তি আশ্রমের দিকেই যাচ্ছিল। হাতে একটা টর্চ।

হাঁটতে হাঁটতে প্রাইমারী স্কুলের সামনের সেই সরু রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল সে। ঐ পথেই মৃন্ময়দার বাড়ি। একবার কি দেখে যাবে বাড়ি আছে কিনা! আর জেনে যাবে তার ফার্ম করার ব্যাপারটা কি? সমরদার বাবা কি বললেন জমি লীজ নেবার ব্যাপারে। আর ফার্ম করে কি সত্যি কিছু করতে পারবে মৃন্ময়দা? যে লোক ঠিক সংসারী নয়, নিজের জামা কাপড়-খানি গুছিয়ে রাখতে পারে না, তাকে দিয়ে রিসার্চ চলতে পারে, কিন্তু এগ্রিকালচার চলে না। সার, বীজ নিয়মমতো জল দেওয়া, লোকজন খাটান —তাহলেই হয়েছে! দুদিনেই চাষবাস লাটে উঠবে!

মুক্তি গ্রামের রাস্তার পানে ডান দিকে মোড় নিল। হঠাৎ দেখাও পেল একটি মেয়ে পুকুরের পাড়ের নিচে কি যেন করছে। মুক্তি টর্চ জ্বালল। মেয়েটার মাথায় কাপড় নেই। ময়লা শতচ্ছিন্ন শাড়ীটায় লজ্জা নিবারণ হয়, না, হচ্ছে না। গায়ে কোন ব্লাউজ নেই। খোলা বুক! টর্চটা নামিয়ে মুক্তি বলল, কে ওখানে?

—ওমা মুক্তিদি, রাত্তিরে কই যাব? মুক্তি দেখল অনন্তের বৌ কুসুম যে আজ সকালে তার বাড়িতে চাল ধার করতে গেছল।

মুক্তি বলল—কুসুম, তুই এই রাত্রে ওখানে কি করছিস?

কুসুম উঠে এল। আর উঠতেই ময়লা ছেঁড়া আঁচল থেকে শাকগুলো সব

পড়ে গেল।

মুক্তি বলল—কিরে? শাক তুলছিস? এখন?

কুসুম এগিয়ে এল কাছের দিকে। মেয়েটা যেন মূর্তিমতী দুর্ভিক্ষ। হাড় জির জিরে। বাইশ তেইশ বছরের শরীরে যৌবনের কোন চিহ্ন নেই—সব শুকিয়ে গেছে।

মুক্তি বলল—অনন্ত মাটি কাটতে যাচ্ছে। দেখা হ'ল।

স্বামীর সঙ্গে তাদেরই গ্রামের একজনের দেখা হয়েছে বোধহয় এতেই কুসুম কৃতার্থ হয়ে গেল! বলল—কিছু, কয়নি মুক্তিদি! মনটন খারাপ দেখলনি? বাচ্চাটা ছাড়্যা গেছে।

মুক্তি একটু বানিয়ে বানিয়ে বলল—হ্যাঁরে খুব সাবধানে থাকতে বলেছে। তা, এই সন্ধ্যাবেলা সাপের কামড়ে মরবি যে!

কুসুম বলল—কি করি দিদি। ঘরে মুখে দিবার কিছু নাই। ওবেলা যা ছিল, ওকে খাবি দিছি। বিদেশ যাবে তো। তা ছেলেটা কাঁদছে। শাক সিদ্ধ কর‍্যা দিব। তাই চাট্টি কলমি শাক তুলছি। মুক্তি বুঝতে পারল। যা ছিল, স্বামীকে রেঁধে দিয়েছে। হয়ত চাট্টি মুড়িও বেঁধে দিয়েছে গামছায়। বলল—দিনের বেলায় তুললিনে কেন?

কুসুম বলল—গিন্নীমার কাছে যাইছিলি। এই আইলি। ঐ সমরবাবুর মাগো!

মুক্তি বলল—হ্যাঁ জানি। বল!

—গিন্নীমা কইল সন্ধ্যাবেলা আয়। তা যাইথিলি। তা দেখি গিন্নীমা চটছে। সমরবাবু নাকি খারাপ শরীর লিয়া কাই যাইছে বেড়িতে।

মুক্তি বুঝতে পারল। তার বাড়ি আসবার জন্য এবং নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাসিমা সন্তুষ্ট নয়। বলল—ও। তা, চাল পেলিনে?

—না। দূর দূর কর‍্যা উঠল। মুক্তিদি তুমার দরে কত খাইছি কাজ করছি। বাবু কত ভাল। কিন্তু জমিদারবাবুর গিন্নী, কি কইব তুমাকে দিদি—! আমানাকে কুকুর ভাবে গো!

মুক্তির চোখে অনন্তের সেই ক্ষুধার্ত শিশুর মুখ ভেসে উঠল। কিন্তু সে

ভ্যানিটি ব্যাগটাও ফেলে এসেছে। কি করে এখন? একটু ভেবে বলল—আয়।

—কই যাব, দিদি।

মুক্তি বলল আয় না আমার সঙ্গে।

মিনিট কয়েক পরে, বটতলা পার হয়ে সেই মোড়টা পেরোতেই মৃন্ময়দার বাড়িটা চোখে পড়ল। ঐ তো মৃন্ময়দার পুব দিকের ঘরটায় হ্যারিকেন জ্বলছে।

মুক্তি দ্রুত হাঁটছিল। কেন যে সে দ্রুত হাঁটছে, তা জানে না। কুসুম বলল—ছুটঠ কেনি, মুক্তিদি।

মুক্তি বলল—দূর, ছুটছি কোথায়? তুই তো বুড়ি হয়ে গেছিস্। হাঁটতে পারছিস্নে আমার সঙ্গে।

কুসুম বলল—মুক্তিদি মনে আছে তুমি আমি একসাথে পড়থিলি।

মুক্তি বলল—ও, সেই প্রাইমারী স্কুলে।

—হ'। আইজ তুমি কে আমি কে? পোড়া পেট। লোকটা বিদেশে গেল মাটি কাটতে। ছেলেটাকে ছাড়্যা যাইতে মন উঠে না। তা কবি টাকা পাঠিবে। ছেলেটা কি খাবে? আমি মায়ালোক কি করব। মুক্তিদি এর চাইতে মরা ভাল। কুসুমের গলা বুজে এল।

ফিরে তাকাল মুক্তি।—কিরে তুই কাঁদছিস্।

এই রাত্রির আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, গাছপালার অন্ধকারে, এই রাস্তার ঘাসের মধ্যে মুক্তি এই ক্ষুধার্ত মাটির বুকফাটা কান্না, বুকফাটা হাহাকার শুনছে। ঈশ্বরের দেওয়া এই মাটি, এই ক্ষেত, এই শস্য একদল লোভী মানুষ অপরকে বঞ্চিত করে শুষে নেয়। মুক্তি জানে, অনন্তর জমিজমা ছিল এক সময়। সব জমি সমরদার বাবা হরেন জ্যাঠার পেটে গেছে। ঈশ্বরের দেওয়া আলো, জল, হাওয়ার মতই তো এই মাটি। জমি ঈশ্বরের দান যাকে আধুনিক ভাষায় প্রকৃতির দান বলে। কেন সকলে সমানভাবে তা পাবে না!

কুসুম বলল—মুক্তিদি, কাই যাব?

মুক্তি বলল—এই এসে পড়েছি। আয় না।

মৃন্ময়দার বাড়ির উঠোনের তুলসীতলায় দাঁড়িয়ে মুক্তি ডাকল।

মৃন্ময় বেরিয়ে এল, হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে। তারপর খুশি হয়ে বলল—আরে, মুক্তি এত রাত্রে? বাঃ এসো, এসো! দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

মুক্তি বারান্দার দিকে এগোলো। কিন্তু কেন যেন তার পা চলছে না! অবশ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে একটা আলোড়নের শব্দ সে শুনতে পায়!

ওরা মৃন্ময়ের ঘরে এল। মৃন্ময় পড়ছিল। তক্তপোষের ওপর কি একটা ইংরেজী মোটা বই খোলা। বিছানাটা অগোছালো। বালিশের তোয়ালেটা ময়লা। দেয়ালের পেরেকে খদ্দরের পাঞ্জাবীটা ঝুলছে। একটা দো-ভাঁজ করা কাপড় পরে আছে মৃন্ময়। গায়ে একটা গেঞ্জী, তাও দু-এক জায়গায় ছেঁড়া, ময়লাও কিছুটা। মাথার চুল এলোমেলো।

মুক্তি মৃন্ময়কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল।

মৃন্ময় বলল—বাঃ বোসো।

—বসছি। শোন, পাঁচটা টাকা দাও তো?

—কি হবে?

মুক্তি বলল—কেন? আমি কি সেবার তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একশ টাকা কি হবে?

মৃন্ময় হাসল। আশ্চর্য এই হাসিটা। এতো নিষ্পাপ! এতো পবিত্র! মুক্তি কি আজ মৃন্ময়কে নতুন দেখছে! মৃন্ময় বলল—হ্যাঁ, মনে পড়েছে সেবার একশ টাকা দিয়েছিলে তুমি!

মুক্তি বলল—শোধও করে দিয়েছ।

—তোমার ভাগ্য ভাল।

—ভাগ্য আমার চিরকালই ভাল। এখন জলদি টাকাটা দাও।

মৃন্ময় বলল—দিচ্ছি। বলেই, বালিশের নিচের তোষকটা তুলল। মুক্তি দেখল, গোটা দশেক টাকা কিছু খুচরো পয়সা ছড়ানো। পাঁচ টাকার নোটটা মৃন্ময় বাড়িয়ে দিল। বলল—আর লাগবে না?

মুক্তি বলল—না। এই কুসুম, এইটা নিয়ে গিয়ে চাল টাল কিনিস্।

আর ছাখ, আমি এখন বাড়িতে থাকব। আসিস্ একদিন। বাচ্চাটাকে আনবি।

কুসুম টাকাটা নিয়ে সেই ছেঁড়া ময়লা আঁচলের খুঁটে খুব শক্ত করে বাঁধল। তারপর দুজনের দিকে একবার হেসে তাকিয়ে দাওয়া পেরিয়ে উঠোনে নেমে গেল।

এই নিঃশব্দে চলে যাওয়াটাই অশিক্ষিতা দরিদ্র নারীর ভাষাহীন কৃতজ্ঞতা।

মৃন্ময় বলল—বোসো। কথা আছে। বাবার আজ খুব একটা এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল।

মুক্তি বিস্মিত হওয়ার ভান করে বলল—ও, তাই নাকি ?

মৃন্ময় চিৎকার করে ডাকল, পিসি, ও পিসি—

মোক্ষদা পিসি বোধহয় রান্না করতে করতে উঠে এল। মুখে কপালে বলি-রেখা বৈশাখের রোদে-ফাটা মাঠের মতো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। বুড়ির মুখে একটাও দাঁত নেই। বললে—ওমা মুক্তি না ? পোড়া চোখে কি আজকাল ভাল ছাখতে পাই ! তা এতো বড় হইচ, বিজয় কি বিয়ে টিয়ে দিবেনি।

মুক্তি বলল—কেন পিসি, ভাল বরটর আছে তোমার হাতে ? থাকে তো বল।

মৃন্ময় বলল—পিসি, চা হবে ?

মোক্ষদা বলল—চা ? চিনি তো শেষ হইছে !

মুক্তি মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—রিসেপসানটা মন্দ হচ্ছে না।

মৃন্ময় চটিটা পায়ে গলাল। বলল—তুমি জল চাপাও। আমি চিনি আনছি।

মোক্ষদা পিসি চলে যেতে মুক্তি বলল—থাক্ তোমাকে যেতে হবে না।

—কেন ?

—আমি এক্ষুনি চলে যাব।

—বাঃ, তুমি আমার বাড়ি তো আস না। আজ যদিও বা এলে—

মুক্তি বলল—যদিও বা এলাম, তবু চা-টা থাক্! আমি আশ্রমে

স্বামীজীকে দেখতে যাব একটু। তুমি যাবে আমার সাথে ?

মৃন্ময় বলল—বাবা, ভাল আছেন। আমি একটু আগে এসেছি। আচ্ছা মুক্তি, তুমি কখন বাড়ি এলে ?

—বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেল।

—কোন্ দিক দিয়ে এলে ?

—স্বরপুর হয়ে !

—তুমি শোননি কিছু ?

—কি শুনব !

—বাবার এ্যাক্সিডেন্টের কথা !

মুক্তি বলল--হ্যাঁ, শুনেছিলাম। তবে তিনি যে স্বামীজী তা—। যাক্ ভয়ের কিছু নেই তো !

মৃন্ময় বলল—না, আমি ডাঃ জানাকে ডেকে এনেছিলাম। তিনি বললেন—ভয়ের কিছু নেই। একটু 'স্টিমুলেটিং' কিছু দিয়ে গেছেন। কিন্তু জানো—একজন ভদ্রমহিলা বাবাকে বাঁচিয়েছেন আজ। আশ্চর্য ডেয়ারিং, সাঁতারও বোধহয় ভাল জানতো। ভ্যাখো, নইলে আজ এই মুহূর্তে আমাকে কি অবস্থায় দেখতে, ভেবে দেখ। বাবা ছাড়া আমার তো কেউ নেই, মুক্তি।

ঘরের হ্যারিকেনের মৃদু আলোটা এখন মুক্তির চোখে ঝাপসা হয়ে এল। এ কাকে সে এই আবছা আলোয় দেখছে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একজন 'জুয়েল', এগ্রিকালচারের ডি এস সি—এই সেদিন সব কাগজে যার ছবি বেরিয়েছিল, প্রশস্তি বেরিয়েছিল, আজ এই এক অখ্যাত গ্রামের দরিদ্র খোড়ো ঘরের একটা পুরনো তক্তাপোষে সে আধশোয়া হয়ে মুখ নিচু করে বাবার কথা বলছে। বলছে শুধু নয়, কথাগুলো কেমন ভিজে ভিজে !

মুক্তি একটা মৃত মূর্তির মত চুপ করে বসে রইল।

মৃন্ময় বলল—কোনদিন যদি সেই মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়।

মুক্তি এতক্ষণে কথা বলল—দেখা হলে কি করবে ?

মৃন্ময় বলল—তার কাছে মাথা নিচু করে বলব, আমি, আজীবন ঋণী আপনার কাছে। বলুন, কি করে তা শোধ করব ? মুক্তি, তুমি জান না, কি

মহৎপ্রাণ সেই মহিলার! নিজের জীবন তুচ্ছ করে একজন বৃদ্ধের প্রাণরক্ষা! অথচ স্বামীজী তার তো কেউ নন?

মুক্তি বলল—তুমি কি করে জানলে স্বামীজী তার কেউ নন।

—না, মানে, বাবা বলছেন, মহিলাটিকে তিনি চেনেন না!

—এ্যাক্সিডেন্টের সময় কে আর কাকে চিনে রাখে।

—কিন্তু বাবা, কি বলছেন, জানো?

—না, জানব কি করে?

—বাবা, বলছেন, তিনি স্বয়ং তাঁর জননী! শক্তিরূপিনী জননী তার আরাধ্যদেবী। নইলে তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে বাঁচানো তখন সম্ভব নয়। এ একটা 'মিরাকল'।

মুক্তি বলল—তবে অসাধারণ কেউ কি বাঁচালো?

মৃন্ময় বলল—ব্যাপারটা কি জানো মুক্তি, আমি সাধনমার্গের কিছু জানিনে। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে আছে। সময় হলে, ভারতবর্ষের এই সাধনার ধারাটা একটু 'স্টাডি' করব। এই 'ইটারন্যাল' ভারতবর্ষ; সেই উপনিষদের কাল থেকে রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই যে সাধনার বহু ধারা, এই যে ধর্মের একটানা স্রোত—হাজার ভাঙ্গাগড়া, বিপ্লবের মধ্যে এই যে তার বেঁচে থাকা—এর মূল সত্যটা কোথায়? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বাবার ধারণা, কোনো শুদ্ধ আত্মার নারীর মধ্যে সেই মুহূর্তে মহাশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। এই শক্তিই তাকে বাঁচিয়েছে।

বাবা অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এসব নাকি "প্রিডিটারমিণ্ড" ঘটনা। তাঁর জীবনে এমনি দু'একবার নাকি এ রকম ঘটেছে! আজ ডাক্তারবাবুকে বলছিলেন, শুনছিলাম। তিনি বুঝতে পারেন। এক যোগীপুরুষ একবার তাকে বলেছিলেন। তুমি অমুক দিন অমুক সময় মৃত্যুর কাছ পর্যন্ত গেছিলে। এইভাবে রক্ষা পেয়ে গেছ। সে যোগীকে তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। ভারত এক বিচিত্র দেশ মুক্তি! আমার ভারি আশ্চর্য লাগে। এ সবের কোনো সায়েনটিফিক্ ব্যাখ্যা আছে কিনা—জানতে ইচ্ছে করে।

মুক্তি বলল—আচ্ছা, তুমি এসবে বিশ্বাস কর?

মৃন্ময় বলল—'এ্যাজ এ স্টুডেন্ট অব সায়েন্স' আমি বিশ্বাস করি।

বাঃ, কেন?

মৃন্ময় বলল—আমি মনে করি 'হিউম্যান নলেজ'-এর 'লিমিটেশন' আছে। বহু 'সায়েন্টিফিক ট্রুথ' আজও আবিষ্কৃত হয়নি। মনে কর, এডিংটন যখন বলেন, বহির্বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মূল কেন্দ্রে আছে 'কনসাসনেস' চেতনা। ভারতীয় দর্শন বলবে চিৎশক্তি। বা মনে কর, এই যে ইলেকট্রন প্রোটন এই নিয়ে যে এতো গবেষণা, এতো রিসার্চ—সাংখ্য তা উপলব্ধি থেকেই "এক্সপ্রেস" করেছিলেন। উপনিষদ বললেন—সমস্ত বস্তুর মধ্যে 'ডিভাইনিটি' আছে। যেমন আছে মানুষের আত্মার মধ্যে। এগুলি উপনিষদের কাছে গবেষণার মধ্য দিয়ে অনুভূত হয়নি। অনুভূত হয়েছিল যোগ সাধনার মধ্য থেকে। আজ সায়েন্স বহু সাধনায় বহু চেষ্টায়, বহু গবেষণায় তা আবিষ্কার করছে।

মুক্তি বালিশটা মৃন্ময়ের হাতের দিকে সরিয়ে দিল, যাতে তার ওপর কনুইর ভর রেখে সে কথা বলতে পারে।

মৃন্ময় আবার বলল—মুক্তি, আমার কি মনে হয় জানো, যে মানুষের মন প্রকৃত 'সায়েন্টিফিক', তাকে দর্শনের কাছে, 'ফিলসফির' কাছে হাত পাততেই হবে। আর তাছাড়া কেন আমি বলব—আমি বিজ্ঞানের সব কিছু জেনেছি, আমি সব কিছু জানি। আমার তো মনে হয়—"কিছুই জানিনা আমি এই মাত্র জানি"। —দাঁড়াও আমি আসছি।

মৃন্ময় হঠাৎ উঠে পড়ল।

মুক্তি বলল—আরে, কোথায় যাবে?

—ঐযে, পিসি বলল, চিনি নেই।

—না, থাক্।

—বাঃ, চা হবে কি দিয়ে?

—চা হবে না—তার চেয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চল।

মৃন্ময় কি যেন একটু ভাবল। ডাকল—পিসি! পিসি!

পিসি মুখ বাড়াল।

মৃন্ময় বলল—মুক্তি যে চলে যাচ্ছে।

পিসি বলল—সে কি? আমি জল—

মুক্তি বলল—আর একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ তো মৃন্ময়দার চিনি আনতে যাবার ইচ্ছেই নেই। এতো করে বলছি।

মৃন্ময় বলল—এ্যাই! মিথ্যে কথা বলছ কেন?

মুক্তি বলল—চিনি আনতে যাবে তা হলে?

—যাচ্ছিলাম তো?

—আর গিয়ে কাজ নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। পিসি জল নামিয়ে দাও।

পিসি বলল—বিজয় বাড়ি আছে? জেলেটেলে যায়নি তো?

মুক্তির হাসি পেল। বলল—পিসি, দেশ স্বাধীন হয়েছে জানো?

—কি কইছ?

—দেশ স্বাধীন।

—স্বাধীন হয়্যা কি হাতি ঘোড়া হইচে শুনি। গ্রামের লোক খাইতে পায়, পরতে পায়—যেই কে সেই। ও রকম স্বাধীন-টাধীন হয়্যা কিছু হবেনি। বিজয়কে আবার জেলেটেলে যাইতে বল। যদি কিছু হয়।

মৃন্ময় কাপড় ছেড়ে পাজামা পরল। খদ্দরের পাঞ্জাবীটা গায়ে দিল। বলল—পিসি বেশ লেকচার দিতে পারে। এবার এম, এল, এ দাঁড় করিয়ে দেব। —এই রে, পিসি—বেড়াল বোধহয় মুখে করে কি নিয়ে পালাচ্ছে।

আর পিসি কথাটা শুনেই রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেল।

মুক্তি হাসছিল। বলল—খুব মিথ্যে বলতে শিখেছ আজকাল। বুড়ো মানুষকে ভয় ধরিয়ে দিলে যে।

মৃন্ময় একটা ভাঙা চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল—নইলে পিসিকে থামাই কি করে। ওটা মিথ্যে নয়—ওটা 'ডিপ্লোমেসী'। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ শিখিয়ে গেছেন। নাও চল।

এই রাত্রে গ্রামের রাস্তা ধরে নদী তীরের দিকে যেতে কী আশ্চর্য ভাল লাগছে মুক্তির। প্রতি পদক্ষেপে সে নতুন জীবনের স্পর্শ পাচ্ছে। তারায় ভরা নিঃসীম আকাশ, দূরে হলদীনদীর স্রোতের মৃদু শব্দ, যেন এক আশ্চর্য

সংগীত। তেরপাখিয়ার দিকে নেমে যাওয়া কোন ডিঙি নৌকার মাঝির একটানা সুরের গান ভেসে আসছে। বোধহয় দূরের কোন শিরীষ গাছে ফুল ফুটেছে। তারি গন্ধ ভেসে আসছে রাত্রির বাতাসে। সারা দিনের পথ চলার শেষে পৃথিবীতে বধূবেশী রাত্রির নিঃশব্দ পদসঞ্চার।

মুক্তি হঠাৎ বলল—মৃন্ময়দা একটু দাঁড়াবে। মৃন্ময় অন্যমনস্কভাবে আগে আগে হাঁটছিল। এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—কেন?

মুক্তি বলল—রাত্রে হলদীনদীটাকে কেমন লাগে দেখব।

॥ ৯ ॥

রাত্রির নদী তখন এক আশ্চর্য নৈঃশব্দের জগৎ।

মৃন্ময় দাঁড়াল। সেই দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল—সব নদীকেই আমার গঙ্গা বলে মনে হয়, মুক্তি, সব নদীর জলই গঙ্গার জলের মতো পবিত্র। তাই না?

মুক্তি কোন কথা বলল না। নদী তার কাছেও চিরকালই এক বিস্ময়, বিশেষ করে এমনি রাত্রির নিদ্রিত নদী।

সত্যি, দিনের বেলায় নদীর দৃশ্য এক, রাত্রে আর। দিনেরবেলায় কেমন একটা কোলাহল নদীর শরীরে মাখা থাকে। সে কোলাহল মানুষের, রোদের, দুপারের গ্রাম, তার গাছপালার, তার মাঠের। এ কোলাহল সব সময় শব্দিত নয়, এ কোলাহল বর্ণের। এ কোলাহলের নিজের একটা ভাষা আছে। অথচ রাত্রে এ বর্ণ, এ ভাষা মুছে যায়। তখন নদীর শরীরে নির্জনতা নেমে আসে, সে নির্জনতা ওপারের বিরাট আকাশ কান পেতে স্থির হয়ে শোনে। স্রোতের শব্দও তখন ধীরে ধীরে কমে যায়।

নদী তখন কালিদাসের কোন কাব্যের অপার্থিব নায়িকা হয়ে ওঠে।

মৃন্ময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মুক্তির একটু বসতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আশ্রমে যেতে দেরী হয়ে

যাবে। অর্থাৎ বাড়ি ফিরতেও দেরি। ততক্ষণে বাবা এসে অপেক্ষা করবে।

মুক্তি বলল—একদিন বেড়াতে আসবে এদিকে? নদী তীর ধরে অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে যাব আমরা। কবে আসবে বল?

মৃন্ময় বলল—তুমি কবে কলকাতা ফিরছ।

—দেরি আছে।

—পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

—না হওয়ার মতো।

—তা হ'লে?

—তা হ'লে নির্ঘাৎ সেকেণ্ড ক্লাস। আমি তো আর তোমাদের মতো ভাল স্টুডেণ্ট নই।

মৃন্ময় বলল—আমাদের মতো মানে?

—তুমি, সমরদা, দিদি। কে নয়?

—সমর বাড়ি এসেছে কেন?

—মানে?

—মানে, এ সময় তো কোনো ছুটি-ফুটি থাকে না।

—বলতে পারব না। শুনেছিলাম, বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার আছে। মেসোমশায় কি সব জমিজমার ব্যাপারেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

যেতে যেতে মৃন্ময় বলল—সমর জমি-জমা বোঝে বলে তো মনে হয় না। কয়েক মিনিটের জন্য আজ দেখা হয়েছিল ওদের বাড়িতে। জমি-টমির ব্যাপারে ও খুব 'ইন্টারেস্টেড' নয়। বরং চাকরিতে প্রমোশন পেয়ে, ফ্যাক্টরি সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্টেড দেখলাম। আমাকে কি সব অনেককিছু বলল। ডেবিট, ক্রেডিট, ব্যালেন্সসীট, শেয়ার, ডিভিডেণ্ড—মাথায় কিছু ঢুকল না আমার। তা সমর, খুব সাইন করবে।

মুক্তি বলল—কি করে বুঝলে?

—যেমন ঘন ঘন সিগরেট খাচ্ছিল, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিল, যেন লেডিজ স্টেনোকে কোনো সিরিয়াস চিঠির ডিক্টেসন দিচ্ছে। জানো, আমার হাসি পেল।

—হাসি পেল কেন ?

—কেমন বড় 'সফিসটিকেটেড' কথাবার্তা, চালচলন। মানে, ও আর গ্রামের ছেলে নয়। 'সয়েলচেঞ্জড'। ও শুধু এখন অফিস এক্সিকিউটিভ, তাই হাসি পাচ্ছিল।

মুক্তি বলল—মনে রাখবে, তুমি স্কুলে ওকে কখনো হারাতে পারনি। কলেজে অবশ্য, ওর কমার্স তোমার সায়েন্স।

মৃন্ময় বলল—নিশ্চয়ই মনে রাখব কিন্তু আমি হেরে যাব বলেই জন্মেছি, মুক্তি। আমি জন্ম-পরাজিত তাতে কোনো দুঃখ নেই। আমি যা, তাই।

মুক্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল—কি বললে ? হেরে যাবার জন্য জন্মেছ ? যা বলেছ, বলেছ আর কখখনো ওসব কথা আমার সামনে বলবে না। বড়লোকের ছেলেরা অনেক সময় পয়সা দিয়ে ফার্স্ট হয়। তা জানো ? পেছনে বড় বড় মাস্টার, স্কুলের টিচাররা এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বারদের ছেলে দেখলেই বেশি নম্বর দেয়। আর গরীব লোকের ছেলেদের বই পর্যন্ত থাকে না। তবু তারা যখন সেকেণ্ড হয়, থার্ড হয়, ফোর্থ হয়, ধরে নিতে হবে, মেরিট-এ তারাই বড়, তারাই বেটার। আচ্ছা, তোমার সেই 'ইনসিডেন্ট'টা মনে আছে ?

—কোনটা ?

—ঐ যে কলেজে, তোমার যখন থার্ড ইয়ার। সেই যে, আঃ, তোমার মনে নেই ? রবীন্দ্রজয়ন্তীতে। কলকাতা থেকে কে একজন সাহিত্যিক এসে-ছিলেন। কলকাতায়, এক অবশ্য পার্টির মিটিং ছাড়া তাঁর নাম শোনা যায় না। মিটিঙে, কেবল 'রিয়েলিজম'· 'রিয়েলিজম' করছিলেন। তুমি উঠে দাঁড়িয়ে—স্বামীজীও ছিলেন, বাবা ছিল, হরেন জ্যাঠা সভাপতি। আঃ ঐ যে—

মৃন্ময়ও মনে করতে পারছিল না।

মুক্তি বলল—তোমার যদি পুরনো ঘটনা কিচ্ছু মনে থাকে ! তুমি সব ভুলে যাও !

মৃন্ময়ের হাসি পেল। বলল—তোমার মনে আছে তো !

মুক্তি একটু দাঁড়াল, কি যেন ভাবল। বলল—হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে।

—কবে ?

—রবীন্দ্র সেন্টিনারী কবে গেল ?

—নাইন্টিন সিক্সটিওয়ানে।

—ঠিক। ঐ সময় কলেজে জন্মোৎসব হ'ল। 'সামার ভ্যাকেশন' পড়ার দিন। ঐ সাহিত্যিক এসেছিলেন 'চীফগেস্ট' হয়ে। সেই মিটিং-এ তুমি।

মৃন্ময় বলল—ঠিক মনে পড়ছে না। তবে কার সঙ্গে তর্কটর্ক হয়েছিল।

হ্যাঁ, মুক্তির সব মনে পড়েছে। পুরোদৃশ্যটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আসলে মৃন্ময়দা সম্পর্কে মুক্তির সেই প্রথম ভাললাগা, যে ভাললাগা সমরদাকে ভাললাগার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। তার আগে মৃন্ময়দাকে তো মুক্তি পাত্তাই দিত না। কেমন একটা বিরূপ ধারণাও ছিল। দিদির কাছে মাঝে মাঝে আসত। বইটই নিত। তখন স্কুলে পড়ে। মুক্তি চিনত, জানত, তবে ঠিক পরিচয় হয়নি। জানত হেডমাস্টার মহাশয়ের এই ছেলেটা বখাটে হয়ে গেছে। জেলেডিঙি নিয়ে হলদীনদীতে চলে গেল। হয়তো সারাদিন ফিরলই না। বাড়িতে থাকল তো ছাখো গে, ফুটবল পেটাচ্ছে মাঠে। পড়াশোনা করে না। আবার সিগারেট খায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সময় একদিন, দিদি বাড়ি নেই। মৃন্ময় এসেছিল। আধময়লা জামা কাপড়। বুক পকেট ছেঁড়া। তবে মুখ চোখ উজ্জ্বল, সুন্দর। বিশেষ করে চোখ দুটো। দুষ্টুমিতে ভরা, যেন ইচ্ছে করলে এক্ষুণি ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

মৃন্ময় বলল—সীতা বাড়ি নেই ?

মুক্তি বারান্দায় বসে একমনে ব্লাউজ সেলাই করছিল। বিরক্ত হ'ল। বারে, কেমন তাকিয়ে আছে ছাখ না!

মুখ না তুলে, মুক্তি দাঁত দিয়ে সুতোটা কেটে গম্ভীরভাবে বলল—না। মৃন্ময় তবু দাঁড়িয়েছিল। মুক্তি বসতেও বলল না।

—কখন আসবে ?

মুক্তির গলার স্বর রুক্ষ। বলল—জানি না।

—জাননা? কোথায় গেছে?

—বলতে পারব না।

—সঞ্চয়িতাটা দিতে পারবে?

মুক্তি ভাবল, সঞ্চয়িতার কথা বলে ডাঁট দেখাচ্ছে। বলল—দিদির বই, আমি জানি না।

মৃন্ময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলল—তোমার নাম জানো?

মুক্তি মুখ তুলে তাকাল। অর্থাৎ, ছেলেটা ভীষণ বেয়াড়া তো।

রেগে বলল—আমার নাম নিয়ে কি হবে তোমার?

মৃন্ময় বলল—কাগজে নামটা লিখে, আমার 'জুলিয়া'র গলায় বেঁধে দোব। যেমন ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে। যেন চেনই না আমাকে।

মুক্তি চটে লাল!

—কি বললে? জুলিয়া—

—হ্যাঁ—"ইয়ারলিং" বইটা পড়নি। ঐযে মারজরি কেনান বলিংস-এর লেখা।

—ও। ঐ বই পড়ে—

—হ্যাঁ ঐ বই পড়ে তো আমার কুকুরটার নাম রেখেছি 'জুলিয়া'।

বলেই মৃন্ময় ডাক দিল—জুলিয়া—! আর ডাকা মাত্র একটা ইয়া মোটা উঁচু কালো দিশি কুকুর জিভ বের করে দৌড়ে এল।

মুক্তি চিৎকার করে উঠল—মাগো!

মুক্তির চিৎকারে কল্যাণী ঘরের কাজ ফেলে ছুটে এলেন—কি হল-রে?

—এ্যাই ভ্যাখ না, আমাকে কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে।

মৃন্ময় বলল—না, কাকিমা, আমি সীতার কথা জিজ্ঞেস করছি। ও, উত্তরই দেয় না। যেন দূর করে দিতে পারলে বাঁচে। তাই ওকে ভয় দেখাচ্ছিলাম। আর জানেন কাকিমা, ও ইয়ারলিং বইটাই পড়েনি। কী সুন্দর বই না, শুধু ইংরাজীতে বারোটা এডিশন হয়েছে, ষোলটা ভাষায় ট্রানশ্লেটেড্ হয়েছে। অথচ—

কল্যাণী বলল—এসো বাবা, বোস। মুক্তি, ওঘর থেকে মোড়াটা নিয়ে

আয় তো!

মুক্তি তখন রাগে, লজ্জায় লাল। সে যাকে পাত্তা দিতে চায় না, মা-তাকে আদর করে বসাতে চাচ্ছে! যতো সব! বলল—পারব না।

কল্যাণী হেসে উঠলেন, দুজনের ছেলেমানুষীতে। ঘর থেকে মোড়াটা নিজেই নিয়ে এসে মৃন্ময়কে বসতে দিয়ে বললেন—ও, এক পাগল। কখন যে কি মেজাজে থাকে! তোমার বাবা কেমন আছেন মৃন্ময়।

—ভাল।

—বাড়িতে?

—না, স্কুলে।

তুমি পড়াশোনা কেমন করছ?

—করছি না।

—কেন?

—ইচ্ছে করে না ক্লাশের বই পড়তে।

—তবে?

—বাইরের বই পড়তে ভাল লাগে! কাকিমা কী সব সুন্দর সুন্দর বই—আপনি 'লা মিজারেবল' পড়েছেন? ভিক্টর হুগোর?

কল্যাণী হাসলেন? বইটা তাঁর পড়া। বললেন—তুমি পড়েছ?

—হুঁ, কতোবার।

—বাংলা বই পড় না?

—পড়েছি, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী।

—আনন্দমঠ পড়নি?

—হুঁ।

—রবীন্দ্রনাথের?

—হুঁ! ঐ তো সঞ্চয়িতাটা চাচ্ছিলাম। একটু দরকার। তা মুক্তি দিলই না, বলে, জানিনা। কিছুই জানেনা। তখন বললাম, নিজের নাম জানো তো?

কল্যাণী মুক্তিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন—দেখলি মৃন্ময় কত বই পড়েছে! আর, তোরা কি?

মুক্তির প্রেস্টিজে লাগল। বলল—আমরা আবার কি? আমরা খারাপ। হ'ল তো।

কল্যাণী বললেন—তোরা গল্প কর।

মুক্তি বলল—বয়ে গেছে আমার ওর সঙ্গে গল্প করতে।

মৃন্ময় মুক্তির রাগে লাল-হয়ে যাওয়া মুখের দিকে চেয়েছিল।

মুক্তির মনে হয়েছিল, ছেলেটা কি হ্যাংলা!

আসলে মুক্তি তখন কিশোরী। প্রথম যৌবনের অনভিজ্ঞ অহংকার, সমরদাকে প্রথম ভাললাগা, তখন জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেটাই তখন সত্য। আজ সে বুঝতে পারে, মৃন্ময় হ্যাংলা ছিল না, তার চোখে সেদিন বিস্ময় ছিল, প্রথম ভাললাগার বিস্ময়, প্রথম ভোরের মুগ্ধ আনন্দ। মুক্তি তার চোখে তখন হয়তো এক অপরূপ সুন্দর কিশোরী!

কল্যাণী বললেন—রান্না বান্না কে করে?

মৃন্ময় বলল—পিসি।

—আহা! এ বয়সে স্ত্রী মারা গেলে কী যে কষ্ট হয়। উনি কতো স্নেহ করেন আমাদের। কতো উপকার করেছেন, সে কি, বলব। মুক্তির বাবা তখন জেলে!

একটু থেমে আবার বললেন—আচ্ছা, তোমার বাবা নাকি দীক্ষা নিয়েছেন।

মৃন্ময় বলল—জানিনা।

মুক্তির মনে এতক্ষণে কান্নার মতো কিছু একটা যেন ক্ষণিকের জন্য ছুঁয়ে গেল। তার মনে পড়ল, তার ব্যবহারটা ঠিক হয়নি।

কল্যাণী বলল—বোস, বাবা!

মৃন্ময় বসল না। জুলিয়াকে ডেকে নিয়ে চলে গেল। বলল—সীতা এলে, বইটা নিয়ে যাব।

মৃন্ময়ের সঙ্গে সেই প্রথম এনকাউন্টার। এবং সেই প্রথম আলাপ থেকে দুজনের মধ্যে কি যেন একটা হয়ে গেল। মুক্তি মৃন্ময়কে তখন দুচোখে দেখতেই পারতো না।

একদিন সীতা বলল—কেনরে তুই মৃণ্ময়কে সহ্য করতে পারছিস্ না? ত্যাখ, ও সত্যি ভাল ছেলে।

মুক্তি বলল—বড্ড ‘রাফ’। কেবল বড় বড় বইয়ের নাম করে ড াঁট দেখায়। বিদ্যে জাহির করে। ভাল লাগেনা আমার। সীতা হেসে বলল—দূর, ও তো তোকে ক্ষ্যাপায়। তুই যে দেখতে পারিস না, তাই তোর পিছু লাগে।

মুক্তি বলল—তুই জানিস্না, ও আমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছিল।

—এ্যা, কইরে দেখি।

—আমি ছিঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়েছি।

--কি লিখেছিল?

—যাতা।

—যাতা কিরে!

—হ্যাঁ শোননা—“মুক্তি,

আস্ত একটা দৈত্যি!
রাগ করে সে যা তা বলে
রূপের দেমাক, ড াঁটে চলে
ভালোবাসে, তবুও বলে
একটুকুও নয় সত্যি”

সীতা বলল—ও কবিতা লেখে? কৈ কখনো শুনিনি ত? তবে ভালবাসা-টাসা লেখা ঠিক নয়। মেয়েদের ওসব লিখতে নেই। আচ্ছা, আমি ওকে বলে দেব। ও আমার কথা খুব শোনে।

তারপর একদিন সীতা বলল—দূর, ওকে বলেছিলাম। ও কি বলল জানিস্!

—কি বলল?

—মুক্তিকে ভালবাসতে বয়ে গেছে আমার।

মুক্তির কথাটা বড় লাগল। ছেলেদের ভালবাসা সে কিছু কিছু বোঝে। ভালবাসার আসল স্বাদ, সে বুঝতে পারে। তাই কেউ যদি বলে, ভালবাসতে বয়ে গেছে, মানে সে ভালবাসার যোগ্য নয়, এটা ত তাকে অপমান করা হয়, এটা, ‘ইনসালটিং’, এটা অসম্মান!

এ এক সমস্যা। ভালবাসুক, এটাও সে চায় না। আবার না ভালবাসুক —এটাও সে চায় না। জীবন সত্যি বড় বিচিত্র!

কয়েক মাস পরে, দিদি, সমরদা, আর মৃন্ময় ম্যাট্রিক পাশ করল। দিদি সেকেণ্ড ডিভিশনে। সমরদা ফার্স্ট ডিভিশনে। আর মৃন্ময়, যদিও সকলে বলত ফেল মারবে, তবু অঙ্কে লেটার নিয়ে পাশ করে গেল। মাত্র কয়েক নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশনে গেল না। কিন্তু মার্কশীটে দেখা গেল, ইংরেজীতে আর বাংলায় সমরদার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। সমরদা তেমনি বেশি নম্বর পেয়েছে সাংস্ক্রিটে, হিস্ট্রিতে। অর্থাৎ মুখস্ত যেখানে কাজে লাগে, সেখানে সমরদার জিত। তিন জনেই ভর্তি হল কলেজে। মুক্তির যখন ফার্স্ট ইয়ার, তখন সমরদা, মৃন্ময়দা আর দিদির থার্ড ইয়ার। সেই সময়েই মৃন্ময়দার সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল।

মৃন্ময় কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটার। ইতিমধ্যে কলেজে নাম হয়ে গেছিল, মৃন্ময় ভাল কবিতা লেখে। অধ্যাপকরাও বলতেন ছেলেটা বিচিত্র। পড়লে ভাল রেজাল্ট করবে। কিন্তু পড়বে না। বাংলার অধ্যাপক পরমেশবাবু দিদিকে নাকি একদিন বলেছিলেন, ছ্যাখো সীতা, মৃন্ময় খুব ট্যালেন্টেড্। ও এখনই এমন সব বইয়ের রেফারেন্স দেয়, যা আমারি ভাবতে হয়।

মুক্তির লেখাটা কলেজ ম্যাগাজিনে না ছাপার জন্য মৃন্ময়ের সঙ্গে ঝগড়া। মুক্তি সেই থেকে মৃন্ময়দার সঙ্গে আর কথা বলেনি। পূজোর ছুটি গেল, মৃন্ময়দা একদিনও বাড়ি আসেনি। বড়দিনের ছুটি গেল, এলো না। অথচ আগে কতো আসত। এমনি করে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিলও চলে গেল। দেখতে দেখতে ঝগড়াটা স্থায়ী হয়ে গেল যেন। সেই থেকে মুক্তি, মৃন্ময়দার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটাকেও এড়িয়ে চলতে লাগল। একটা ভীষণ অভিমান বরফের মতো ঠাণ্ডা জমাট বেঁধে গেল বুকের মধ্যে।

তবে মুক্তি দিনে দিনে বুঝতে পারছিল, এই অভিমানেরও একটা বেদনা আছে। সে বেদনাটা তাকে গোপনে কুরে কুরে খাচ্ছে। যতোই সে নিজেকে নির্ভুল বলে জানুক, যতোই সে নিজেকে সত্য বলে জাহির করুক, তবু অভিযোগের ভিত্তিটা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

ক্লাশে যাবার সময় একদিন করিডোরে মুক্তির সঙ্গে মৃন্ময়দার চোখা-চোখি হ'ল। মুক্তি দেখল, মৃন্ময়দার মুখেও ব্যথার ছায়া! মুক্তির কেন যেন কান্না পেল, এবং সে কান্না পাওয়ার কারণ সে নিজেও বুঝতে পারল না।

সীতাই একদিন বলল—ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেল মুক্তি।

মুক্তি বলল—ঝগড়া আবার কি?

সীতা সে কথায় কানই দিল না। বলল—এতে তো কারুর লাভ হচ্ছে না। তুইও দুঃখ পাচ্ছিস্, মৃন্ময়ও দুঃখ পাচ্ছে।

মুক্তি বুঝতে পারল, দিদি তার মনের কথাটা জেনে ফেলেছে। তবু বাইরে তখনও তার দেমাক। বলল—কেন? আমি কি অন্যায় করেছি?

সীতা শান্ত গলায় বলল—অন্যায় করেছিস্। ছাখ, প্রথম কথা, মৃন্ময় ঈর্ষা করে তোর লেখাটা ছাপেনি, এটা আদৌ ঠিক নয়। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুই জানিস, মৃন্ময় আমার কাছে অন্তত মিথ্যে কথা বলবে না।

ও বলল, লেখাটায় বস্তু ছিল না। তাই ছাপিনি। দ্বিতীয় কথা, তুই ওকে ঠাট্টা করে বলেছিস, আঃ, স্বামীজীর ছেলে জুনিয়ার স্বামীজী। তুই জানিস্, মৃন্ময় আর যা সহ্য করে করুক, বাবাকে কেউ উপহাস করছে, ঠাট্টা করছে, এটা সহ্য করে না। করবে না। ও বাবাকে কী ভালবাসে তুই জানিস না! সেদিন ওর বাবাকে টেনে এনে কথাটা বলা তোর উচিত হয়নি।

মুক্তি রেগে গিয়ে বলল—বলেছি, বেশ করেছি।

সীতা মুক্তির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর স্থির গলায় বলল—মুক্তি, মনে রাখিস্, কোন অবস্থায়ই 'আনডিগনিফায়েড্' হওয়া উচিত নয়।

দিদির গলার এ স্বর মুক্তি আগে আর কখনো শোনেনি। তার সব ঔদ্ধত্য সীতার ছোট্ট একটি কথায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় কতোক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মুক্তি।

হ্যাঁ, গ্রীষ্মের ছুটি পড়বে সেদিন। এমনিতেই ছুটি পড়ার দিন কেমন একটা বিদায়-বিদায় ভাব দেখা দেয়। তার ওপর গুজব রটছিল বাংলার স্যার এ কলেজ থেকে চলে যাচ্ছেন। ছুটির পর আর হয়তো আসবেন না। সীতাও শুনেছে সে কথা। খুব ঘটা করে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হচ্ছে সেইদিনই।

জন্ম-শতবার্ষিকী বছর। প্রচুর আয়োজন। এতবড় হল-এও জায়গা হবেনা বলে উঠোনে সামিয়ানা টাঙিয়ে সভার জায়গা করা হয়েছে। এই মফঃস্বল শহরে এত বড় সাহিত্যসভা আর কখনো হয়নি। চারপাশের গ্রামের লোক এসেছে। যাঁরা স্থানীয় লেখক, তাঁরাও এসেছেন! তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। এ অঞ্চলে ছোটখাট অনেক ম্যাগাজিন বেরোয়। সেই সব ম্যাগাজিনের সম্পাদকরাও আছেন। আর আছে, স্কুলের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা। প্রায় হাজার পাঁচেক লোকের সভা। কলেজের এক অধ্যাপক কলকাতা থেকে সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ হালদারকে নিয়ে এসেছিলেন। কাগজে প্রায়ই তাঁর নাম বেরোয়, ছবি বেরোয়, বিবৃতি বেরোয়। এদিক থেকে পাবলিসিটির কাজটা খুব ভালোই হয়েছে।

মুক্তি, সীতা, সমরদা সভায় যাচ্ছিল। সমরদা অবশ্য নেতা। উদ্যোগ আয়োজন তার কথামতোই অনেকটা হয়। কিন্তু মুক্তির সঙ্গে বসে বক্তৃতা শুনবে বলে বোধহয়, তখন সে শ্রোতা হয়ে গেছিল।

পথেই মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা।

সীতা বলল—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

মৃন্ময় বলল—একটু কাজ আছে।

—বাঃ, মিটিং আরম্ভ হয়ে যাবে যে এক্ষুনি।

—হোক্।

—তুমি শুনতে যাবে না ?

মৃন্ময় হঠাৎ একটা কথা বলে বসল। —ওসব পলিটিক্স করা সাহিত্যিকদের লেকচার আমি শুনতে ভালবাসিনা। হরেকৃষ্ণ হালদারের লেখা আমি পড়েছি। আমাকে 'ইমপ্রেস' করেনি।

মুক্তি একপাশে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য এখনও ওরা কেউ কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে না।

সীতা বলল—খুব হয়েছে, চল।

সমর বলল—মৃন্ময় তুমি জান না। উনি খুব ভাল বলেন, স্যার বলেছেন। চল, চল, ওদিকে আর যেতে হবে না।

মৃন্ময় সমরের কথা শুনেও দাঁড়িয়ে ছিল।

সীতা বলল—কি হল? যাবে না?

মৃন্ময় বলল—কাজ ছিল একটু।

—বেশ, সেরে এসো।

মৃন্ময় কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল—আচ্ছা।

সাতা বলল—ঠিক আসবে?

—আসব।

—কোথায় বসবো জানো?

—না।

—ডায়াসের সামনে, একটু বাঁ দিকে। এসো, জায়গা রাখব তোমার জন্য।

মুক্তি, সীতা, সমরদা এসে বসল এক জায়গায়। সভা শুরু হ'ল। মুক্তির গানে সীতা এস্রাজ 'ফলো' করল। রিসাইটেশান হ'ল, ফোর্থ ইয়ারের একজনের প্রবন্ধ পড়া হ'ল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা হ'ল। কিন্তু মৃন্ময়ের আব দেখাই নেই, তখনো আসেনি।

মুক্তিরা গান শেষ হ'তে আবার নিজেদের জায়গায় এসে বসেছিল।

সীতা বলল—মৃন্ময়টা এলোই না, দেখলি।

মুক্তি হঠাৎ বলল—ঐতো দাঁড়িয়ে আছে।

—কোথায় রে?

—ঐ, থার্ড ইয়ারের ছেলেরা যেখানে, বন্ধুদের সঙ্গে। সীতা দেখতে পেল। তাকিয়ে রইল সেদিকে যদি চোখাচোখি হয়।

এবং হ'ল। সীতা ইঙ্গিতে ডাকল।

মুক্তি ভাবছিল, দিদির এতো আগ্রহ কেন! বোধহয় তার সঙ্গে আবার ভাব করিয়ে দিতে চায়। আজ ছুটি পড়ে যাচ্ছে যদি আগের রিলেশান ফিরে আসে। মিছেমিছি একটা ঝগড়া অভিমান জিইয়ে রেখে লাভ কি!

মৃন্ময় এল। সীতা সরে গিয়ে বসার জায়গা করে দিল বেঞ্চে।

এবার প্রধান অতিথির ভাষণ।

আশ্চর্য। ভাষণ শুরু হতে না হতেই হাততালি।

প্রধান অতিথি সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ হালদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বন্ধুগণ!

কিছুক্ষণ বলার পরই মৃন্ময় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—দূর, যা-তা বলছেন!

প্রধান অতিথি তখন মাইকে ঘোষণা করে চলছেন,—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বড়লোকের কবি, বুর্জোয়া কবি। তাই তাঁর কাব্যে গল্পে উপন্যাসে বড়লোকের ছবি। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন যে কি—তা তিনি জানতেন না। গরীবলোকের কোনো খবরই তিনি রাখতেন না।

মৃন্ময় সীতাকে আস্তে আস্তে বলল—দ্যাখো, আমি হলপ করে বলতে পারি ভদ্রলোক মার্কসিস্ট। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ যদি বুর্জোয়া কবি হন, বড়-লোকের কবি হন বেশ তো তবে তাঁর জন্মদিনের সভায় প্রধান অতিথি হয়ে আসার দরকারই বা কি। না এলেই তো পারতেন শ্রদ্ধা জানাতে আসব এবং গালাগালও দেব—এ দুটো একসঙ্গে হয় না।

সাহিত্যিক শ্রীহালদার মশায়ের তখন 'ফ্লো' এসে গেছে। তিনি বলে চলেছেন—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সমস্ত রকমের আধুনিকতার বিরোধী। সমাজ ও বাস্তবজীবনের প্রতি আকাশস্পর্শী উদাসীনতা নিয়ে তিনি অনাবিল সৌন্দর্য ও ব্রহ্মস্বাদস্বরূপ রসের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন!

মৃন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল—দূর আমি চলে যাব। এসব শোনা যায় না।

সমর বলল—কেন? ঠিক কথাই তো বলছেন বোসো, বোসো।

প্রধান অতিথি বলে চলেছেন—রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি সবই কুয়াশাচ্ছন্ন। সবই ভাববাদী ব্যাপার।

মঞ্চে স্বামীজীও বসেছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠে পড়লেন।

বিজয়বাবু আস্তে আস্তে বললেন—জ্ঞানদা একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে যাব।

মুক্তি দেখল বাবাও চলে যাবার জন্য তৈরি। তারও এ বক্তৃতা ভাল লাগছিল না। মৃন্ময়দা ঠিকই বলেছে, রবীন্দ্রনাথের ওপর যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাঁর সভায় প্রধান অতিথি হয়ে আসা কেন?

হঠাৎ প্রধান অতিথি, সাহিত্যের 'রিয়ালিস্টিক' ধারায় চলে এলেন। বললেন—এই রিয়ালিস্টিক আদর্শই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। রোমান্টিক সাহিত্য এখন মরে পচে ভূত হয়ে যাচ্ছে। একদিন এই রবীন্দ্র সাহিত্যেরও এমনি অবস্থা হবে, যখন—

'আই প্রটেস্ট, স্যার'—

একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ ভেসে আসতে সভাটা যেন চমকে উঠল। বিজয়বাবু, জ্ঞানবাবু ফিরে তাকালেন!

মুক্তি দেখল, মৃন্ময়দা দাঁড়িয়ে।

প্রধান অতিথি বলে উঠলেন—কে? কে? কে প্রতিবাদ করছেন!

মৃন্ময় বলল—আমি, স্যার।

সেই অধ্যাপক যিনি শ্রীহালদারকে এনেছেন, তিনি বললেন—আপনি চালিয়ে যান দাদা। ও ছেলেমানুষের কথায় কান দেবেন না। কি জানে ও। শুনবেন না ওসব।

ওদিকে দূরে মৃন্ময়ের একদল বন্ধু দাঁড়িয়েছিল। তারা চিৎকার করে উঠল —মৃন্ময়কে বলতে দিন, বলতে দিন। ওকে বলতে দিতেই হবে।

সভায় একটা হৈ চৈ বেধে যাচ্ছিল। প্রিন্সিপ্যাল এগিয়ে এলেন।

সমরের বাবা হরেন মাস্টারমশায় সভাপতির আসন থেকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

প্রধান অতিথি রাজনীতি করা মানুষ। তিনি ঘাবড়ালেন না। কড়াগলায় বললেন—কি বলতে চাও তুমি?

মৃন্ময় তেমনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল—রোমান্টিক সাহিত্য মরে পচে ভূত হয়ে যাচ্ছে—এই কমেন্টটারই আমি প্রতিবাদ করতে চাই। আপনার মতে যদি রোমান্টিক সাহিত্য মরে পচে যায়, তবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি এতদিন কোথায় বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যেত। তা যায়নি। আমাদের রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যেও রোমান্টিকতা আছে। এবং এই রোমান্টিকতা নিয়ে আজও বেঁচে আছে। আজও তার নতুন মূল্যায়ন চলছে। মানব সমাজের শেষদিন পর্যন্ত তার জনপ্রিয়তাও অক্ষুণ্ণ থাকবে। আপনি

৬

স্যার, ভুল কথা বলছেন।

হাততালি, আর হাততালি। সভায় অনেকক্ষণ ধরে শুধু হাততালিই চলতে লাগল।

হরেনবাবু অনেক কষ্টে সভা শান্ত করলেন।

সাহিত্যিক হালদারমশায় বড় চালাক মানুষ। বললেন—যেমন? উদাহরণ দাও?

মৃন্ময় বলল—উদাহরণ আমি দিয়েছি, স্যার। আরও চান? তবে শুনুন স্যার, গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলিকেই বিশ্ব সাহিত্যের সবচেয়ে 'পারফেক্ট' ড্রামা বলা হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে কি রোমান্টিসিজম নেই? আমি একই সঙ্গেই শেক্সপীয়ার, কালিদাস—তাদের কথাও বলতে পারি। এঁদের সৃষ্টি কি মরে পচে ভূত হয়ে গেছে?

শ্রীহালদার বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন—দ্যাখো, 'রোমন্টি-সিজম' এই কথাটার মূলে যেতে হবে আমাদের। রোমান্টিকতা সাহিত্যে প্রথমে আসে—

মৃন্ময় তখনও দাঁড়িয়েছিল—বলল, আমি একথারও প্রতিবাদ করছি, স্যার। 'রোমান্টিক' শব্দটা সাহিত্যে প্রথমে আসেনি। এসেছিল ছবির ক্ষেত্রে। নিসর্গ চিত্র, মানে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা শিল্পীদেরই প্রথম 'রোমান্টিক' বলা হত। এটা ঘটেছিল সেভেন্টিস্থ্ সেঞ্চুরিতে। পরে সাহিত্যে শব্দটা 'ইউজড্' হয়, বিশেষ করে প্রথমে কবিতার ক্ষেত্রে। সম্ভবতঃ 'কোলরিজ' তাঁর কোনো বক্তৃতায় রোমান্টিসিজম এই শব্দটা বিশেষভাবে ব্যবহার করে-ছিলেন।

প্রধান অতিথি বোধহয় অবাক হয়ে উঠেছিলেন। এই মফঃস্বলে এসে এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন, তিনি ভাবেন নি। এবার নতুন চাল দিলেন। বললেন—আমার বলার কথা হ'ল, যা দুর্বল, তা মরে যাবে—এটাই আমার বক্তব্য। তুমি যে গ্রীক ট্র্যাজেডির কথা বলছ, ওগুলো ক্ল্যাসিক।

মৃন্ময় বলল—স্যার, গ্যেটে এরকমই একটা মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলতেন ক্ল্যাসিক মানেই 'হেলদি', মানে শক্তিমান। আর "রোমান্টিক"

মানেই রুগ্ন "সিকলি"। কিন্তু স্যার, আপনি কি বলতে পারেন, তাঁর "ফাউস্ট"-এ রোমান্টিসিজম নেই।

বড় কঠিন প্রশ্ন।

প্রধান অতিথি চুপ করে রইলেন।

মৃন্ময় আবার বলল—গ্রীক ট্র্যাজেডির কথাই বলছি স্যার। বিখ্যাত সমালোচক এবারক্রম্বি বলেছেন, শ্রেষ্ঠ গ্রীক ট্র্যাজেডিয়ান এ্যাসকাইলাসও রোমান্টিক ছিলেন। তাঁর নাটকগুলিকে কি আপনি রুগ্ন 'সিকলি' বলতে চান? এমন যে প্লেটো, তিনিও ছিলেন রোমান্টিক। হোমারের মধ্যেও কি আমরা একজন মহৎ রোমান্টিক কবিকে খুঁজে পাব না? আপনি বলুন? বিশ্ব সাহিত্যে আপনি এমন একজনও মহৎ কবি, মহৎ লেখক দেখান যাঁর সৃষ্টির মধ্যে রোমান্টিকতা নেই? আমার মনে হয় স্যার, রোমান্টিসিজম-এর সংজ্ঞাটাই আপনার বলার মধ্যে স্পষ্ট হয়নি। আপনি যদি বলতেন—রোমান্টিসিজম—সাহিত্যের একটা উপাদান মাত্র, অর্থাৎ এলিমেণ্ট—তাহলে আমি প্রতিবাদ করতাম না। কিন্তু যদি বলেন, রোমান্টিসিজম, ক্ল্যাসিসিজম-এর বিপরীত—তা হলেই আমি আপত্তি করব, স্যার। কারণ, কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রোমান্টিকতা ছাড়া কখনও স্থায়ী হতে পারেনা, কালোত্তীর্ণ হতে পারে না। এ অসম্ভব! রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে আপনার এই ভবিষ্যৎবাণীও ভুল। শুধু তাই নয়—সাহিত্য সম্পর্কে আপনার কনসেপসনটাই 'রং'।

সভা তখন নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ কোন পক্ষই কোন বাদ-প্রতিবাদ করল না। তারপর হাততালিতে সভাটা ফেটে পড়ল। মৃন্ময়ের বন্ধুরাই সবচেয়ে বেশি।

মুক্তির আজ আর সব মনে নেই। সভাপতি হরেন জ্যাঠামশায় কোনরকম দু'একটা কথা বলে সভা শেষ বলে ঘোষণা করলেন। আর শেষ হতেই মৃন্ময়ের বন্ধুরা ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল।—মাইরি, তুই যা দেখালি না!

সীতা চুপ করে ছিল।

আর মুক্তি আনন্দিত না দুঃখিত—তা সে ঠিক অনুভব করতে পারছিল

না। কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সীতার সঙ্গে সঙ্গে সভার বাইরে এসেছিল। তারপর যখন আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল, তখন সে মৃন্ময়দাকে খুঁজতে লাগল। সমরদা তখন কোথায় উঠে গেছে।

সীতা নির্বাক।

মুক্তি সেই দিনই বুঝতে পেরেছিল, মৃন্ময়দা তার লেখা অমনোনীত করার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সায়েন্সের ছাত্র। তবু তার সাহিত্যবোধ অনেকের চেয়ে পারফেকট এবং বহু অনুশীলিত। সে ফাঁকা কথা বলে হাততালি কুড়োয় না। নিজেকে জাহিরও করেনা—অন্তত কেউ তাকে আঘাত না করলে তো নয়ই! আর কি সংযম! নিজে কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও, নিজের কোন লেখা সে প্রকাশ করে'নি।

আর একথা তো সত্যি, মুক্তি, এ বই ও বই ঘেঁটে কিছু পয়েণ্ট জোগাড় করেই প্রবন্ধটা লিখেছিল। তার নিজের বলার কথা কি ছিল তাতে? সে কি সত্যি রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রকৃত পাঠক! তবে সমরদাও তাকে "মিসলীড" করেছে।

সে "জেলাস" বলে তার ওপর দোষারোপ করেছে—যা যথার্থ নয়, এমন কি শোভনও নয়।

সীতা বলল—মুক্তি, তোর কি হল রে?

মুক্তি বলল—কেন?

—এমন গম্ভীর হয়ে গেলি?

—কৈ গম্ভীর হয়েছি!

—হয়েছিস্। তুই জানিস্ না। দ্যাখ, মুক্তি, তোকে আমি সেদিনও বলেছিলাম, মৃন্ময় শত্রুতা করে তোর লেখা ছাপেনি—এটা ঠিক নয়। তোর আর সমরের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সাহিত্য সম্পর্কে মৃন্ময়ের জ্ঞান কত "ডীপ" তার স্টাডি কত "ভাস্ট", তা আজ দেখলি তো! মিছেমিছি তাকে কত "রাফ" কথা বলেছিস্! ছিঃ!

মুক্তি চুপ করে রইল।

সীতা পেছনে ফিরে বলল—কিন্তু, মৃন্ময়টা গেল কোথায়? দেখছি না,

তো। বাড়ি ফিরব কার সঙ্গে। বাবা চলে গেছে, মৃন্ময়ের বলার পরে। ...মর চীফ গেস্টের সঙ্গে চলে গেল দেখলাম। ইস্ রাত্রি ন'টা এখন। কি করা যায়।

মুক্তি বলল—আমি একটু খুঁজে দেখব?

—ছাখ, পাস্ কিনা!

আসলে মুক্তি তখন একটু একা থাকতে চায়, একা থেকে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের কথা চিন্তা করতে চায়।

মৃন্ময়দাকে সে এদিক ওদিক খুঁজছিল।

দিদির বন্ধু মিনতি জানার সঙ্গে দেখা হ'ল।

মুক্তি বলল—মিনতিদি, মৃন্ময়দাকে দেখছ?

মিনতি বলল—কেন রে?

—আমরা কার সঙ্গে বাড়ি ফিরব তাই খুঁজছি ওকে।

—তোদের ঝগড়া মিটে গেছে?

মুক্তি বলল—ঝগড়া? কার সঙ্গে?

মিনতি বলল—আমরা বুঝি জানি না! সব জানি!

—তা, মৃন্ময় বোধ হয় রেষ্টুরেণ্টে বসে চা খাচ্ছে।

—একটু ডেকে দেবে মিনতিদি?

মিনতি সুন্দর করে হাসল। বলল—ভাব করবি? আচ্ছা, দিচ্ছি, বাবা দিচ্ছি।

দিদি, মৃন্ময়দা, মুক্তি তিনজনে ফিরছিল নদীধার দিয়ে। মাঝে মাঝে সভা ফেরত লোকজন যাচ্ছিল কথা বলতে বলতে।

মৃন্ময়দা একদম চুপ। কি যেন ভাবছে সে। যেন তার যাওয়া শুধু যাওয়াই। আর কিছু নয়।

কিন্তু মুক্তি। মুক্তির যাওয়া আজ শুধু যাওয়া নয়।

আজ তার প্রত্যাবর্তন।

অন্ধকার তখন নদী তীরে, জলে, মাঠে বিছিয়ে পড়েছে। দূরের গ্রামগুলি

এখন স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। শুধু সেগুলিকে অন্ধকার ছবির মত একটা ধূসর পটভূমি বলে মনে হয়। আর সেই পটভূমির বুকে জীবনের মত এক বিষাদময় নির্জনতা এই মুহূর্ত নদীতাবের দীর্ঘশ্বাসে বেজে উঠেছে!

সীতা এগিয়ে গেছল একটু।

তখন মুক্তি আর মৃন্ময় খুব কাছে, পাশাপাশি তবু দুজনেই নির্বাক। যেন দুজনের মধ্যে কোনদিন কোন পরিচয়ই ছিল না।

মুক্তি আর থাকতে পারছিল না। তার সব অহংকার তখন অশ্রু হয়ে উঠতে চাইছে।

আস্তে আস্তে ডাকল—মৃন্ময়দা। এ্যা-ই—।

মৃন্ময় চলতে চলতে দাঁড়াল।

মুক্তি কোন কথা বলল না, বলতে পারল না। সে থর থর করে কাঁপছিল। শুধু মৃন্ময়ের ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে চুপ করে রইল।

আর কী আশ্চর্য! সে সময়, সেই মুহূর্তে, সেই নির্জনতার মধ্যে মুক্তির দুচোখ ছাপিয়ে জল এল।

এতদিনের সব অভিযোগ সব অভিমান তখন কোথায় কোন অন্ধকার বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেল। আঃ, কী পবিত্র এই অশ্রু, কী সুন্দর এই কান্না, কী গভীর, অপার্থিব এর অনুভব!

মৃন্ময় অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক সময় বলল—আশ্চর্য তুমি এতো সেন্টিমেন্টাল!

॥ ১০ ॥

এক বিস্মৃত, সুন্দর, আচ্ছন্ন অনুভূতির মধ্য দিয়ে ওরা কখন নদীতীর ধরে অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে। এই অনুভব মুক্তির জীবনের

এক গোপন আলোকিত জগৎ। সেটা ঠিক ভালবাসা নয়—কিন্তু একটা আশ্চর্য ভাললাগা। অথবা সেটাই হয়ত, আসল ভালবাসা যা সে তখন, সেই অনভিজ্ঞ দিনগুলিতে, ঠিক চিনে উঠতে পারেনি, যা আজ তার কাছে সকালের রোদের মত সত্য!

এই ভালবাসার বেদনা, যন্ত্রণা এবং আনন্দ, আজ মুক্তির জীবনের অমৃতময় সম্পদ!

আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাবার জন্য মুক্তি বলল—মৃন্ময়দা কটা বাজে বলত! মৃন্ময় বলল—টর্চটা জ্বাল। ঘড়ি দেখি।

মুক্তি টর্চ জ্বালল।

সেই আলোয় এ রাত্রিতে দুজনের দুজনকে আবার নতুন করে দেখা!

মৃন্ময় বলল—রাত নটা মাত্র।

—স্বামীজী ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?

—কি জানি।

—ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু চলে আসব।

—আচ্ছা।

—তুমি বাড়ি পৌঁছে দেবে তো?

—আচ্ছা।

—আচ্ছা কেন? না দিতে পারলে ভাল হ'ত। তাই না?

মৃন্ময় বলল—ঠিক তা নয়। মানে, তুমি সমরের সঙ্গে বেড়াতে ভালবাস। আমার আবার আসেনা এসব।

মুক্তি বলল—তুমি কি করে জানলে, সমরের সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসি?

—জানি।

—বেশ, আর কি জান?

—সমরের সঙ্গে তোমার ভালবাসা আছে। তোমাদের বিয়ে হবে। ঠিক না?

মুক্তি বলল—ঠিকও যেমন, ঠিক নাও তেমন।

মৃন্ময় হেসে বলল—তুমিও দেখছি, ন্যায় শাস্ত্রের ভাষায় কথা বল

আজকাল।

মুক্তি বলল—তোমার কথা কিছুটাতো ঠিক। সমরদার সঙ্গে আমার বহু-দিনের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। সেই কলেজ লাইফ থেকে। তাতে আমার অংশই বেশি ছিল, বলতে পার। প্রথমের দিকে আমার ভূমিকা ছিল প্রধান। কিন্তু তার কিছুদিন পরে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

মৃন্ময় বলল—ওটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপার আমি শুনতে চাইনা।

মুক্তি বলল—না, ঠিক পার্সোনাল নয়। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

—বল ?

—তুমি এই ক'বছরে, মানে এম.এস.সি. পড়া শুরু থেকে কোন মেয়েকে ভালবাসনি।

মৃন্ময় বলল—মনে পড়ছেনা।

মুক্তি খুশি হয়ে বলল—সেকি মনেই পড়ছে না ? আশ্চর্য ব্যাপারতো! তুমি দেখছি একেবারে !

মৃন্ময় বলল—একেবারে বোকা। তবে তার আগে যখন কলেজে পড়ি থার্ড ইয়ারে, তখন একজনকে ভালবাসতে ইচ্ছে করত। এর বেশি নয়। কিন্তু কি করব ? আমাকে দেখলেই সে দূর দূর করে ওঠে! আর কিছুদিন পরে জানলাম, সে অনেক বড় কিছুকে ভালবাসে। মহিলারা বীরের গলায়ই মালা দিতে চায়। আমি চিরকালের ভীরু! তখন আর কি করি! ভাবলাম, এ জীবনে ও খেলাটা থাক্। তাইতো পড়ায় খুব মন দিলাম! রেজাল্টটাও মন্দ হল না।

মুক্তি হেসে বলল—তবে গ্যাখো, এসব একমাত্র তার জন্যই, যে দূর দূর করে উঠত তোমাকে দেখে। তার কাছে তোমার 'গ্রেটফুল' থাকা উচিত। তাই না ?

মৃন্ময় বলল—নিশ্চয়ই গ্রেটফুল আছি, থাকব। কিন্তু তোমরা সীতার ট্রিটমেণ্টের কি করছ ? কদ্দিন এমনভাবে থাকবে—কি মনে হয় তোমার ?

মুক্তি বলল—ব্রেনে কিছু হয়েছে বোধ হয়। শোন, বাবা কবরেজের বাড়ি

গেছে মানিকজোড়ে। এতক্ষণে ফিরেছে হয়ত। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়াও হবে।

মৃন্ময় বলল—ঠিক আছে। তবে আসার সময় একটা টর্চ দিও। পিসি কিন্তু রেগে যাবে। ভাত নিয়ে বসে থাকতে হবে বুড়িকে। সত্যি, পিসি আছে বলে চাট্টি খেতে পাই।—ও, এই তো আশ্রমে এসে গেলাম। তুমি দাঁড়াও, আমি দেখি, বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা!

মৃন্ময় দাওয়ায় উঠে আস্তে আস্তে ডাকল।

– বাবা!

একবার ডাকতেই স্বামীজীর সাড়া পাওয়া গেল।

—কে? খোকা? আয়।

– তুমি ঘুমোয় নি? ডাক্তার বলছিলেন, ওষুধে খুব ঘুম হবে।

স্বামীজী ক্ষীণ গলায় বললেন—আমি যে অপেক্ষা করছি, একজন আসবে। সে না এলে ঘুমুতে পারছি না। তাই এই তো এখান থেকে গেলি। আবার?

মুক্তি সব শুনছিল। সেই প্রথম দিনের ঘটনাটাও তার মনে পড়ছিল। সে কি আবার কোন 'মিস্টিক' পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়বে। আবার কোন অলৌকিক ঘটনা তার চিন্তাশক্তিকে অবশ করে দেবে?

মৃন্ময়দা বলল—মুক্তি এসেছে।

আশ্রমের ভেতরে একটা প্রদীপ টিম্ টিম্ করে জ্বলছিল। মুক্তি সেই আলোয় দেখল স্বামীজী মাটিতে পাতা কম্বলে শুয়ে আছেন। দীর্ঘ দেহ, সাদা দাড়ি, মাথায় সাদা দীর্ঘ চুল, সাদা চাদর একটা গায়ে।

মৃন্ময় বাবার পায়ের কাছে বসল।

স্বামীজী বললেন—বোসো, মা।

মুক্তি খুব সতর্ক। বলল—এক্সিডেন্টের কথা শুনেছি। কেমন আছেন এখন?

স্বামীজী হেসে বললেন—যেমন রেখেছ?

মুক্তি চমকে উঠল। কিন্তু হেসে বলল—বাঃ আমি রাখার কে?

স্বামীজী বললেন—ছেলেকে কে রাখে, মা ছাড়া ?

—আমি আপনার মা ?

—তারি অংশ। মহাশক্তির প্রকাশ যে তোমার মধ্যে, মা।

মৃন্ময় বারান্দায় বেরিয়ে গেল। আজ আশ্রমে গ্রামের একজন লোক শুয়েছিল স্বামীজীর যদি কিছু দরকার-টরকার হয়। মৃন্ময় থাকতে চেয়েছিল।

স্বামীজী বললেন—না, দরকার নেই। ঐ লোকটি স্বামীজীর খানিকটা শিষ্যের মত। স্কুলের পিয়ন ছিল এক সময়। মৃন্ময় তার সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলছে এখন।

মুক্তি একটু পরে বলল—কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। আমি আজ যাই।

স্বামীজী বললেন—না মা। সাংসারিক কথাবার্তা বলতে কষ্ট হয়। এতো ধর্মের কথা, দর্শনের কথা। এতেই, বিশ্রাম হয় মা, এতেই আনন্দ।

মুক্তি এক সময় বলল—আচ্ছা, আপনি মৃত্যুকে ভয় পান ?

স্বামীজী একটু সময় চুপ করে ভাবলেন কিছু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—পাই মা। তবে যাতে আর না পেতে হয়, সে চেষ্টাটাই এবার থেকে করব। আমার কিছু কিছু ক্রুটি থেকে গেছল।

—কিসের ক্রুটি ?

—তুমি ঠিক বুঝবে না মা ? সাধনার কিছু কিছু 'প্রসেস' আছে তো। এই 'প্রসেস'-এ ক্রুটি ছিল। তাই আমার যে 'প্রগ্রেস' হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। আমি মায়ামুক্ত হতে পারিনি।

মুক্তি বলল—মায়া, মানে মৃন্ময়দার ওপর মায়া। এই তো ?

স্বামীজী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—বোধ হয়, অনেকটা সত্য !

—এ মায়া কি অন্যায় ?

—ঠিক অন্যায় নয়, মা। কিন্তু অসম্পূর্ণতা।

—তবে সম্পূর্ণতা কখন আসবে ?

—যখন সব ছেড়ে, গেরুয়া মাটির রঙে জীবনকে রাঙিয়ে নিয়ে চিরদিনের

জন্য চলে যাব। মানুষ জন্ম থেকেই একাকী—'আই এ্যাম এলোন'। তাই আর একজন নিঃসঙ্গের সন্ধানে আমাকে একদিন বেরিয়ে পড়তেই হবে। কেমন আশ্চর্য লাগছে শুনতে তাই না?

মুক্তি কথাটা শুনল। কেমন রোমান্টিক লাগছে যেন। তবু বলল—আপনার এই সাধনার ধারাটা ঠিক নয়। সংসার থেকে এই পালিয়ে যাওয়া—এটা 'এসকেপিজম'।

স্বামীজী বললেন—তুমি ঠিক বলছ, মা। তবে কি জানো? সেই রামকৃষ্ণের কথা। বাড়িতে বড় মাছ এলে মা কোন ছেলে কি খেতে ভালবাসে, সেইমত রান্না করেন। আমার মনের সঙ্গে এই সন্ন্যাসের ধারাটা খাপ খায়। চিরকালই আমার কাছে মহৎ সাহিত্য, তাই, যা আমাকে বৈরাগ্যের দিকে নিয়ে যায়। টলস্টয় ডস্টয়েভস্কি তাই আমার ভাল লাগত। তুমি জানোনা, ছেলে বেলায়ও আমি এক বার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছলাম। সে অনেক দিনের কথা। এক যোগী পুরুষের দেখাও পেয়েছিলাম। তিনি বললেন—ফিরে যা বেটা। সময় হয়নি!

স্বামীজী চুপ করলেন। মুক্তিও চুপ করে রইল। তার মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই কোন একদিন স্বামীজী মৃন্ময়কে ফেলে আবার নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়বেন।

মুক্তি ভাবছিল, এই সাধনার ধারাটা কি? এবং কেন? এই পৃথিবী কি সুন্দর নয়? কি ক্ষতি এতে? মুক্তি বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, আমি আছি বলেই তো এই রাত্রির নিঃশব্দ জগৎ আমাকে স্পর্শ করছে। আমি আছি বলেই ঐ উদার, মহৎ, বিরাট স্তব্ধ নক্ষত্রখচিত মহাকাশ আমি দু' চোখ মেলে দেখছি। এতো পৃথিবীর মহাকাব্য! আমি আছি বলেই এই-মাত্র নিদ্রিত নদীর দৃশ্য দেখে এলাম। আমি আছি বলেই, পিতার স্নেহ, দিদির ভালবাসা, বন্ধুর ভালবাসা—এই ভালবাসার অনুভবের কী আশ্চর্য সৌন্দর্য। হঠাৎ সমরদার কথাও মনে হল মুক্তির—যে তাকে সত্যি ভালবাসে—অর্থাৎ মানুষ, মাটি, আকাশ, জল—এই নিয়ে যে জগৎ আমার চোখের সামনে প্রসারিত আমি আছি বলেই তো তার অদৃশ্য স্পর্শ অনুভব করছি।

এর চেয়ে কি আরও কোন মহৎ জগৎ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে? সে জগতের স্পর্শ, অনুভব কি আরও অমৃতপূর্ণ। সে জগতে আমি কি আনন্দ পাব? এবং সেই অনিশ্চিত আনন্দের জন্য, এই পৃথিবীর নিশ্চিত বাস্তব আনন্দ আমি কেন ছেড়ে যাব! তাতে কি লাভ?

এ বড় কঠিন প্রশ্ন!

স্বামীজী চোখবুজে শুয়েছিলেন। মুক্তির মনে হচ্ছে বোধহয় ধ্যান করছেন। মুক্তির চিন্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। বললেন—তোমার মনে নানা প্রশ্ন, তাই না, মা?

মুক্তি অবাক! বলল—প্রশ্ন তো আছেই।

স্বামীজী বললেন—প্রশ্ন থাকা ভাল।

—কেন?

—প্রশ্ন থাকলেই একদিন উত্তর খুঁজে পাবে। আচ্ছা মা বলতো, জীবনের লক্ষ্য কি?

মুক্তি বলল—লক্ষ্য বোধহয় 'সাকসেস'।

—কিসের 'সাকসেস'?

—সাংসারিক জীবনের।—'ওয়ার্ল্ডলি সাকসেস'।

—ও তো সকলেই চায়। অর্থ, খ্যাতি, সম্মান, রূপ কে না ভালবাসে? কার না প্রার্থনা? কিন্তু ওরা সাধারণ। তোমার চাওয়াটা কি?

মুক্তি নিজেও জানে না। হঠাৎ কে যেন তার মনের মধ্যে একটা উত্তর পৌঁছে দিল। সে বলল—প্রজ্ঞা।

স্বামীজী বললেন—ঠিকই বলেছ, মা। জীবন মানে তো, কেবল বেঁচে থাকা নয়। জীবন মানে—এই সংসারের দুঃখ-আনন্দকে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করে এমন কিছুর চিন্তা করা—যাতে এইসব কিছুকে তুমি অতিক্রম করে যেতে পার। জ্ঞান, প্রজ্ঞা সেই সিঁড়ি, যা বেয়ে বেয়ে সেই উত্তরণের আলোয় পৌঁছতে হয়।

মুক্তি বলল—এই জ্ঞান, এই প্রজ্ঞা কোথায় পাওয়া যায়?

স্বামীজী বললেন—উপনিষদ। উপনিষদ হচ্ছে 'সায়েন্স অব ফিলসফি',

'সায়েন্স অব রিলিজান'। একবার পড়ে দেখবে।

মুক্তি বলল—আমার মনে হয় পড়ে কিছু হয় না।

—সবার হয় না। তোমার হবে।

—কেন ?

—তোমার মধ্যে যে মা, প্রশ্ন আছে। আসল কথা কি জান ? এই প্রশ্ন থেকেই আসে মনন। এই মননের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত জীবনের পরিচয়। আর মননের পরিচয় হচ্ছে—"স্পিরিচুয়াল হাংগার", যা তোমার মধ্যে আছে, যা তোমার অন্তরে ক্ষীণ ধারায় বইছে। প্রথম দিন, যেদিন তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলে, মনে আছে. মা. সেইদিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি পরিশুদ্ধ আত্মা! তুমি একটু আগে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই কিনা! আমি বলেছিলাম, পাই। কারণ আমার মোহ আছে, মায়া আছে, আসক্তি আছে। যদি না থাকত, তবে আজই আমি খুশি হয়ে জলের তলায় চলে যেতাম। তাতো পারিনি। তখন বাঁচবার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। মৃত্যুকে আমি ভয় পেয়েছিলাম। তাই আমি এখনও অসম্পূর্ণ।

মুক্তি চুপ করে শুনছিল। সে যেন আজ এক গুরুগৃহে বসে ব্রহ্মবিদ্যায় পাঠ গ্রহণ করছে। কোন আরণ্যক যুগে ঋষির কাছে বসে, এই ভাবেই ছাত্রের পাঠ গ্রহণ করা হত। অবশ্য এই ধর্ম জীবন এখনও তার কাছে কুয়াশাছন্ন আকাশের মতো। অথচ কোনদিন সন্ধ্যেবেলা সেই জীবনের দূরতম দ্বারদেশে তাকে তো পৌঁছতেই হবে। নইলে এ সবই ব্যর্থ হয়ে গেল।

মুক্তি বলল—আপনি এই যে অসম্পূর্ণতার কথা বলছেন, মানে যে মোহ আপনাকে আজ মৃত্যু ভয়ে ভীত করেছে, কোনদিন কি মানুষের পক্ষে তা থেকে মুক্তি সম্ভব ? মানুষ মৃত্যুকে ভয় করবে না এমন দিন কি আসতে পারে ? সে কি সম্ভব ?

স্বামীজী চুপ করে কি যেন ভাবলেন। বললেন—হ্যাঁ, সম্ভব।

-- কি তার পথ ?

স্বামীজী বললেন—আত্মাকে জানাই তার পথ।

মুক্তি ভাবল এই সব শব্দ বড় জটিল, বড় অস্পষ্ট, বহু অর্থে ব্যবহৃত।

তবু বলল—আত্মাকে কি করে জানা যায় ?

—চিত্ত পরিশুদ্ধ হলে। ক্রিশ্চানিটিও তাই বলছে 'ব্লেসেড আর দ্য পিওর ইন হার্ট : ফর দে শ্যাল সী গড'।

- কখন চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় ?

—সত্য অনুসরণ করলে চিত্ত পবিশুদ্ধ হয।

মুক্তির কাছে এই সব স্পষ্ট নয়। এই 'আত্মা', এই 'সত্য'—এসব ফিলসফিক শব্দ বড় জটিল, বড় কঠিন বড দুর্বোধ্য। শুধু সে জানার জন্যই পরপর প্রশ্ন করছিল। এ যেন মাটিতে অনাগত কালের বৃষ্টির জন্য কিছু বীজ ফেলে রাখা। বৃষ্টি হলে সে বীজ থেকে যদি কখনো অঙ্কুর চোখ মেলে। এমনও হতে পারে, সে অঙ্কুর একদিন ফলবান বৃক্ষে পরিণত হল। এই বীজ, এই মাটি, এই বৃষ্টি—চাষ আবাদের এই তিন শর্ত। জীবন আমাদেরও তেমনি। বীজ চাই—যে বীজ অধ্যাত্ম বাণী। মৃত্তিকা চাই—যে মৃত্তিকা হৃদয়। বৃষ্টি চাই—যে বৃষ্টির অপর নাম অনুশীলন। হয়ত একদিন তার জীবনেও ফসল ফলতে পারে। কে জানে !

স্বামীজী এক সময় বললেন—তুমি আজ বড় টায়ার্ড। বাড়ি যাও মা।

মুক্তি এবার নিজের স্বার্থেই একটা কথা বলল। —আমার দিদি খুব অসুস্থ। আপনি আশীর্বাদ করুন, সে যেন ভাল হয়। আপনি বললে, দিদি ভাল হয়ে উঠবে।

স্বামীজী হাসলেন। চোখ বন্ধ করে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। মুক্তি ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

স্বামীজী চোখ মেলে তাকালেন। তাঁকে কেন যেন একটু অস্বাভাবিক লাগল। মুক্তির কান্না পাচ্ছিল, ভয় লাগছিল !

স্বামীজী হেসে বললেন—পাগলি মেয়ের কাণ্ড ছ্যাখো।

মুক্তি বলল—আপনি বলুন, দিদি ভাল হবে ! বলতেই হবে আপনাকে।

স্বামীজী বলল—সীতা ভাল হয়ে উঠবে !

আঃ, কী আনন্দ ! কী আনন্দ ! মুক্তির ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে এই মুহূর্তে সে বাড়িতে খবরটা দেয় !

স্বামীজী বললেন—মৃন্ময় কোথায় গেল মা।

—বাইরে গেছে।

—তুমি মা জানো, ও এবার কি করবে?

—শুনলাম, এখানে 'ফার্ম' করবে।

স্বামীজী বললেন—সেই ভাল। চাকরি করুক আমি চাইনে। জীবন যেন স্বাধীন হয়। কিন্তু আমার জমি-টমি কত আছে, আমার তো মা, মনে নেই এখন।

মুক্তি বলল—হরেন জ্যাঠামশায়ের কাছে জমি 'লীজ' নিচ্ছে।

—ও।

মুক্তি বলল—আমার ভয় হয়, মৃন্ময়দা এসব পারবে না। সাংসারিক বুদ্ধি খুব কম। আপনি বারণ করে দিন ওকে।

স্বামীজী চুপ করে রইলেন। তারপর একটু পরে বললেন—আমার বলার দিন বহু আগে শেষ হয়ে গেছে, মা! ওকে ওর মতে চলতে দাও। তাই চলেও এসেছে। আমি কি ওকে, কখন কি পড়বে না পড়বে, কিছু বলেছি? ও সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস আমি কারি।

মুক্তি আবার সেই প্রশ্নটার সামনে এসে দাঁড়াল—ঈশ্বর আছেন, কি, নেই। তার রূপ কি? তিনি কি শিব, না কৃষ্ণ, না কালী—তাঁর প্রকৃত রূপটা কি?

স্বামীজী কেন যেন হাসলেন। বললেন—ঈশ্বরের ইচ্ছা বলছি ঠিকই। এই সব কথা বলতেই আমরা আজও অভ্যস্ত। আসলে তাঁর কোন রূপ নেই। ঈশ্বর বিমূর্ত।

মুক্তি অবাক! আবার সেই 'মিস্টিসিজম'-এর প্রভাবে পড়ছে না ত? স্বামীজী বার বার তার মনের কথা নিজেই প্রকাশ করছেন। এ কি ভাবে সম্ভব হয়? যোগের দ্বারা? সে শুনেছে, যোগের দ্বারা মানুষ অসাধারণ এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

স্বামীজী বললেন—ঈশ্বর বিমূর্ত। তবে সাধনার সুবিধের জন্য কেউ কেউ তাঁকে মূর্তির মধ্যে কল্পনা করেন। কিন্তু সাধনার শীর্ষস্তরে তার প্রয়োজন হয়

না। তখন জানবে মা, সকল বস্তুর মধ্যেই ঈশ্বরের স্পর্শ।

মুক্তি বলল—এরও আবার স্তর আছে নাকি?

—হ্যাঁ, তিনটে স্তর আছে, মা। প্রথম স্তর ঐ যে দেব দেবীর মূর্তির কথা বলছ। লোকে তাকেই এতো কাল দেবতা বলে জেনে এসেছে সেটা ঠিক নয়। কিন্তু সেটারও দরকার আছে। এর ফলে তোমার মন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে কিন্তু ঈশ্বর তা নন। শুধু এই ঈশ্বরের দিকে তোমার মন ধাবিত হচ্ছে, এটাই তোমাকে দ্বিতীয় স্তরে নিয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় স্তর হল—ঈশ্বরকে তোমার নিজের মধ্যে অনুভব করা। তখন মন্দির, দেবদেবী, পুজো-টুজোর আর প্রয়োজন হয় না। তখন তোমার অন্তর পবিত্র হয়েছে, ঈশ্বরের আবাসের জন্য যে পবিত্রতার প্রয়োজন হয়। এই স্তরেই তুমি নির্মল আনন্দের স্পর্শ পাচ্ছ, ঈশ্বরকে তুমি তোমার মধ্যে অনুভব করছ। এই স্তরে অনুশীলন করতে করতে তুমি তৃতীয় স্তরে যাচ্ছ।

মুক্তি বিশেষ কিছু বুঝল না। তবু বলল—তারপর?

স্বামীজী বললেন—সে স্তরে অর্থাৎ তৃতীয় স্তরে, পৌঁছলে, তোমার মনে হবে ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি একাত্ম। তুমি ঈশ্বরের বন্ধু। তোমার অন্তত তাঁরই বাসভূমি। সে স্তরে যে পরম শান্তি আছে মা, তার কোন ভাষা নেই। সে অনির্বচনীয়। এর নাম অমৃতত্ত্ব। নদীর জল তখন সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে। তার পৃথক কোন সত্তা নেই।

স্বামীজী একটু থেমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—জানি না, সেদিন কবে আসবে জীবনে!

স্বামীজী চুপ করলেন। মুক্তিও চুপ করে বসেছিল। অন্ধকার ঘরের এক কোণে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছে। রাত্রি এখন কত?

॥ ১১ ॥

মুক্তি আর মৃন্ময় দুজনে সেই পথ ধরেই ফিরছিল। নরঘাট থেকে লাষ্ট বাস চলে গেছে। তবে মোড়ের কাছের দোকানপাট বন্ধ হয়নি। মুক্তি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। তার মনে হচ্ছিল, বাবা কবরেজ বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাকে খুঁজছে।

তবে তার মনে একটা সাহস এসেছে, স্বামীজী বলেছেন, দিদি ভাল হয়ে যাবে। কি ছিল, এই কথার মধ্যে কে জানে, তবু মুক্তি কেমন একটা আশ্বাস পাচ্ছিল।

হঠাৎ পেছন থেকে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ। ব্রেক কষে নামল সমর। দুজনের দিকে একটু তাকিয়ে বলল—এতো রাত্রে কোত্থেকে এলে?

মুক্তি বলল—স্বামাজীকে দেখে ফিরছি। তুমি?

—আমি কাল ভোরে চলে যাব ভাবছি, তাই মনে হল, একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

মৃন্ময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মুক্তির গলাটা কেমন যেন করুণ শোনালো। —ও কালই চলে যাচ্ছ? কেন? আজ সন্ধ্যায় বললে, এক সপ্তাহের ছুটি।

—তাই নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু—

মৃন্ময় বলল—তোমরা কথা বল, আমি যাই।

মুক্তি বুঝতে পারল তার ওপর রাগ করেই সমরদা চলে যেতে চাচ্ছে। চিরকালই ও ভীষণ অভিমানী। আজ সন্ধ্যাবেলার ব্যবহারে বোধহয় ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মুক্তি বলল—মৃন্ময়দা যেওনা। আচ্ছা, সমরদা এই তো সবে পরশু এসেছ। এর মধ্যে চলে যাওয়ার কি হল? রাগ করেছ? মাও, বলছিল।

সমর খুশি হল যেন। বলল—এটা চাকরি।

মৃন্ময় হেসে বলল—নিশ্চয়ই! আমরাও ব্যবসা বলছিনে।

সমর চুপ করে গেল।

মুক্তির মনে হ'ল, সমর কেন যেন আজ বড় অসহিষ্ণু। কি হয়েছে ওর!-বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ চলে এসেছি বলে, এমন রাগ করার মত কি হতে পারে। অথবা কি মৃন্ময়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছি বলে, মনে মনে অভিমান!

তিনজনেই এক সঙ্গেই আসছিল।

সমর এক সময় বলল—মৃন্ময়, তোমার বাড়ি গেছলাম।

মৃন্ময় বলল—তাই নাকি? কখন?

—এই আসছি। পিসি বলল, ফিরতে রাত হবে।

—গরীবের বাড়তে? হঠাৎ?

—একটু দরকার ছিল। লীজ দলিলটা কবে রেজেষ্ট্রী করতে চাও?

মৃন্ময় বলল—তাতে যে কিছু সময় লাগবে। টাকা সংগ্রহ করতে হবে আমাকে।

—বাবা বলছিল একটু খোঁজ নিতে।

মুক্তি বলল—কত টাকা, সমরদা?

সমর বলল—এখন পাঁচ হাজার। আর রেজেষ্ট্রী করতে যা লাগে। কেন? তুমি দেবে?

—বাঃ, আমি দিতে যাব কেন? জমি তো আমি লীজ নিচ্ছি না।

মৃন্ময় বলল—দ্যাখো সমর, তোমার বাবার সঙ্গে আজ সকালেই আমার কথা হয়েছে। টাকাটা যে এতো শীগগির চাই তা উনি বলেননি। টাকা আমি দেব—তবে আমাকে একবার কলকাতা যেতে হবে। স্কলারশিপের টাকা কিছু পাওনা আছে। চেকটা আসেনি এখনো।

সমর বলল—বেশ। আমি বাবাকে বলব।

মুক্তি বলল—জ্যাঠামশায়ের টাকার এমন দরকারের কথা কখনো শুনিনি।

সমর বলল—হঠাৎ একটু দরকার হ'ল। বাবা এই ইলেকশানে 'কনটেস্ট' করতে চায় দেখলাম। তাতে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক টাকা দরকার।

মুক্তি বলল—তাই নাকি? কোন পার্টির নমিনেশনে?

সমর বলল—এখনও ঠিক হয়নি। লেফটিস্ট-নেতারা যাওয়া-আসা-

করছেন দেখলাম।

মৃন্ময় বলল—এটা কি রকম হ’ল ?

সমর হেসে বলল—কেন, শোননি ? ‘দেয়ার ইজ নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ এ্যাণ্ড ওয়ার’।

মৃন্ময় হাসতে হাসতে বলল—আমার ভাই কারুর সঙ্গে “লাভ” ও নেই, “ওয়ার” ও নেই। দাও, একটা সিগ্রেট দাও।

সমর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ডান হাতে ধরে বাঁ হাতে ট্রাউজারের পকেট থেকে দামী সিগ্রেটের প্যাকেটটা বের করল।

মৃন্ময় দুটো সিগ্রেট বের করে বলল—ম্যাচ কই ?

সমর এ পকেট সে পকেট হাতড়াল। ও, এই যে! মৃন্ময় নিজেরটা ধরিয়ে সমরের সিগ্রেটটাও ধরিয়ে দিল।

মুক্তি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছিল। হঠাৎ বলল—আরে! মাটিতে গাড়ির দাগ দেখছি। জীপ বলে মনে হচ্ছে। কে আবার এল ?

কেউ উত্তর দিল না।

ওরা তিনজনে চুপচাপ হাঁটছিল। সমর গম্ভীর, মুক্তিও। কিন্তু মৃন্ময়ের কোন চিন্তা নেই। গুনগুন করে গান করছিল সে। বৈশাখের এই প্রথম রাত্রিতে নদীতীর থেকে সুন্দর হাওয়া আসছে।

মুক্তি ভাবছিল, মৃন্ময়দা এক বিচিত্র মানুষ! আনন্দই তার প্রকৃত রূপ। কোন দুঃখ নেই, চিন্তা নেই। ভালবাসার যে যন্ত্রণা, এই মুহূর্তে মুক্তিকে ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত করে তুলছে, পীড়িত করে তুলছে, সমরদা যে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এই রাত্রে তার কাছে ছুটে এসেছে, মৃন্ময়দার চরিত্রে তার কোন চিহ্ন নেই, প্রতিফলন নেই! সেখানে আসা-যাওয়ার দুদিকেরই দ্বার খোলা আছে। সে সকলের ঊর্ধ্বে এক আনন্দময় সত্তা। মুক্তি সমরের বুকের জ্বালা বুঝতে পারে। মুক্তিও বুঝতে পারে, এই দুজনকে নিয়ে তার জীবনেও বড় দ্বন্দ্ব। এর শেষ কোথায়, তা সে ভাবতে পারে না। কিন্তু মৃন্ময়দা সম্পূর্ণ অনুদ্বিগ্ন। সে এই মাটির পথের মত। কোন্ পথিক কোথায় যায় আসে, তার লাভ ক্ষতি কিছু নেই। এই তো কেমন একটা রবীন্দ্র-সংগীতের সুর

ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের মনে চলেছে। একেই, শিশুর মত দু'হাত দিয়ে বিশ্বকে ছুঁয়ে যাওয়া বলে।

মৃন্ময়দা হঠাৎ বলল – তোমরা এগোও। আমি একটু চা খাব।

মৃন্ময় চলে যেতে মুক্তি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিল। সে আশঙ্কা করছে, সমরদা এবার কিছু বলবে। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও সমরদা যখন কিছু বলল না, তখন মুক্তি নিজেই বলল—তুমি রাগ করেছ ?

—কি করে জানলে ?

—এই যে কাল দুর্গাপুর চলে যেতে চাচ্ছ ?

সমর উদাসীনভাবে বলল—আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

মুক্তি অন্ধকারে সমরের মুখের দিকে একটু চেয়ে চুপ করে রইল। তারপর কি ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—কে বলেছে ?

—আমি জানি।

—যদি তোমার জানা ঠিক না হয়।

—সেটা অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আমার এতো ভুল হয় না।

মুক্তি বলল—ছাখো, সমরদা, তোমার সঙ্গে বহুদিনের বন্ধুত্ব। অনেক মান অভিমানের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি এমন 'ইম্‌পেসেণ্ট' আর কখনও হওনি।

সমর ক্ষুব্ধগলায় বলল—জানো, আজ আত্মহত্যার কথা মনে হয় আমার।

মুক্তি হঠাৎ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ধরে ফেলল—কি ? কি বললে ? আর একবার বল। 'রিপীট ইট'।

সমর বলল—আমি ঠিকই বলছি, মুক্তি। তুমি জানো, আমি যা বলি, তা করি। আমি লাইফে বড় একটা কম্প্রমাইজ করে চলি না। 'ইউ নো ইট'।

মুক্তি হতবাক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারছিল, সে আজো ভালবাসে। নচেৎ শুধু মাত্র "আত্মহত্যা" শব্দটা তাকে এভাবে আঘাত করবে কেন ? ভালবাসার বোধহয় বহু অদৃশ্য শেকড়, যা মাটির সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে, সাধারণত সেগুলিকে চেনা যায় না। শুধু কখনও টান

পড়লেই বোঝা যায় সেই অদৃশ্য শেকড়গুলোর শক্তিও কম নয়।

মুক্তি বলল - বেশ কথা দাও, আর কখনো ঐ শব্দটা উচ্চারণ করবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সমর বলল—কেন ?

মুক্তি বলল—বেশ তুমি কি চাও !

সমর বলল—কিছু না। শুধু আমরা যেমন ছিলাম, তেমনি থাকবো। আমার অধিকার কেউ কোনভাবে চ্যালেঞ্জ করুক, এ আমি চাইনে।

মুক্তি চুপ করে রইল। সে বলতে চেয়েছিল, জীবন যখন পাল্টে যায়—তখন ভালবাসারও রূপান্তর হয়। আঠারো বছরের মন আর পঁচিশ বছরের মন এক নয়। এবং সে ক্ষেত্রে মুক্তি কি করবে? সেখানে চ্যালেঞ্জ তো আসবেই।

সমর বলল—মুক্তি, মৃন্ময়ের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই। আমরা বহুদিনের বন্ধু। কিন্তু ভালবাসার ক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি সহ্য করবো না। সেক্ষেত্রে আমার কাছে আর কোন 'অলটারনেটিভ' নেই।

সমর হঠাৎ থামল।

মুক্তি একটা মৃত মূর্তির মত সেই অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল—সমরদা এসো !

তাদের বাড়ির সামনেই জীপটা দাঁড়িয়েছিল। কোন ড্রাইভার নেই।

মুক্তি বুঝতে পারল, তাদের এলাকার এক্স এম. এল. এ. বিভাস হাজরা এসেছেন।

তা, বিভাসবাবু বেশ রসিক লোক। বারান্দায় ইজি চেয়ারটায় বসেছিলেন। মা বোধহয় রান্না ঘরে। যাক, বাবা কবরেজ বাড়ি থেকে এখনো ফেরেনি। এতো দেরি হওয়ার কারণটা মুক্তি বুঝতে পারল না।

মুক্তিকে দেখে বিভাসবাবু উল্লসিত হয়ে বললেন—আরে এসো এসো, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ। দিনটা ভালই গেল।

মুক্তি এতোক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। হেসে বলল—আর কার ? নিজের মুখ দেখেই উঠেছিলেন। তা কি ভাল গেল ?

—কেন ? তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আগে তোমার সুন্দর হাতের এক কাপ চা খাইতো।

সমরদা অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তি বলল—তুমি একটু দিদির ঘরে যাও। আমি আসছি। হ্যাঁ, দেখুন সুন্দর হাতের চা-টা কিন্তু সুন্দর হয় না।

সমর যেতে যেতে বলল—মৃন্ময়টা কি যে করে! এখনো পাত্তা নেই। ও এলে ডেকে দিও।

বিভাসবাবু বললেন—চায়ের কথা বলছ ? আরে, ঐ হাতে যা তুলে দেবে, তা সুন্দর। বিষ দিলেও চেটে পুটে খাব।

মুক্তি বলল—ও, তাই নাকি!

—আলবত তাই। তা, এ শাড়িটায় তোমাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু!

—মানাবেই তো। খদ্দরের শাড়ি। আপনারা তো মিটিং-এর সময় ছাড়া খদ্দর পরেন না।

বিভাসবাবু আমতা আমতা করে বললেন—না, ঠিক নয়। মানে—

মুক্তি বলল—ও মানে ডিক্সনারিতে নেই। তা' এতো রাতে ?

—বিজয়দার সঙ্গে কথা আছে। বাঃ, তুমি বোসো, মন খুলে দুটো কথা বলি। ক'দিন পরে দেখা হ'ল।

মুক্তি বলল—মা-কে ডেকে দিচ্ছি যত ইচ্ছে কথা বলুন। আমি দিদির ঘরে যাব। কল্যাণী এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। বললেন—সীতাকে নিয়ে কী করি বলুন তো, ঠাকুরপো!

বিভাসবাবু অবাক হয়ে বললেন—সীতা এখনো ভাল হয়নি ? সেকি! কবে যেন এলাম এখানে, তখনও তো—

কল্যাণী বললেন—না, ঠাকুরপো। ভাল হওয়াতো দূরের কথা। আরও বেড়েছে। আজ চার পাঁচদিন একেবারে কোন কথাটথা বলতে পারছে না। কি যে করি! আপনার দাদা তো এখন পাগল। দিনরাত ঐ চিন্তা, মেয়ে—মেয়েকে নিয়ে কি করি! যত হোক বড় মেয়ে তো!

—তাই নাকি ? তা ভাল হয়ে যাবে! কিচ্ছু ভাববেন না। এমন হালকা কথায় মুক্তি বিরক্ত হয়ে বলল—ভাল হয়ে যাবে ? কি করে জানলেন ?

বিভাসবাবু একটা সিগ্রেট বের করে প্যাকেটের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বললেন —হবে, হবে, আমি বলছি হবে।

রাগতে গিয়েও মুক্তির হাসি পেল। নেতা হয়ে গেলে মানুষ কি রকম কথা বলে যেন। মোড়াটা টেনে এনে বসে বলল—আজকাল রোগটোগও এম্ এম এল এদের অর্ডার মেনে চলে বলে তো জানতাম না।

বিভাসবাবু হেসে বললেন—বৌদি, মুক্তি বেশ কথা বলে কিন্তু। একেবারে চাঁচাঁ-ছোলা। তা, কে দেখছে এখন ?

কল্যাণী বললেন, তমলুকের ডাঃ মুখার্জী, ডাঃ মৈত্র, ডঃ রমন আগে দেখেছেন।

ডাক্তারদের নাম শুনে বিভাসবাবু ছি ছি করে উঠলেন।—ওসব ওল্ড ফুলস দিয়ে কিস্সু হবে না, কিস্সু হবে না বৌদি। ইয়ং ডাক্তার দেখান।

কল্যাণী বললেন—ডাঃ মুখার্জী ছাড়া এরাও তো সব ইয়ং। সব ফরেন ফেরত। কলকাতায় প্রাকটিস। সপ্তাহে একদিন করে মফঃস্বল শহরে। ডিগ্রী দেখে সবাই ভুলে যায়। প্রচুর আয়।

বিভাসবাবু যেন কিছু একটা ভাবতে লাগলেন। মাথা নাড়লেন কয়েকবার। নিভে যাওয়া সিগ্রেটটা দামী লাইটার বের করে আবার ধরালেন। তারপব গম্ভীর হয়ে বললেন—হ্যাঁ, কিছু ভাববেন না আমি আছি। এখানে এসব চিকিৎসা হবে না। কিস্সু জানে না। সব "টুকলিফাই" করে পাশ করাতো। সীতাকে 'ফরেন'এ পাঠিয়ে দেব। শুধু শুধু সময় নষ্ট করা। কাল সঙ্গেই নিয়ে যাব ওকে। বুঝলেন না বৌদি, 'ফরেন' বলুন, মানে আমেরিকা, ইউরোপ, ওসব এখন, আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে, জল ভাত।

কল্যাণী ভীষণ খুশি হলেন। বললেন—দাঁড়ান ঠাকুরপো, ভাতটা ফুটে গেল বোধহয় আমি আসছি। আপনি ততক্ষণ মুক্তির সঙ্গে কথা বলুন। আচ্ছা মুক্তি—তোর মেজাজটা এমন খারাপ কেন রে ?

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মুক্তির মনেও বিভাসবাবুর প্রস্তাবটা ভাল লাগল। হ্যাঁ, দিদির ব্রেনে যদি কিছু হয়ে থাকে ! সে শুনেছে ব্রেনে টিউমার হয়—সেটা

বড় মারাত্মক অসুখ। তার এক বান্ধবীর দাদা খুব বড়লোক, এতেই মারা যান। অপারেশন হয়েছিল! কিন্তু অপারেশন টেবিলেই এক্সপায়ার্ড। তা হলে দিদিকে কোন ফরেন হসপিটালে যদি বিভাসবাবু পাঠাতে পারেন। এজন্য তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! তা উনি খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এম. এল. এ. ছিলেন. সন্দেহ নেই। পারতেও পারেন। দিদিকে বাঁচাতেই হবে। দিদি না থাকলে তার জীবনে কিছুই যে থাকবে না!

মুক্তি বলল—দিদিকে কি সত্যি বাইরে পাঠানো সম্ভব?

বিভাসবাবু বললেন - এই ছাখো তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

—না, কথাটা কি জানেন। লোকে বলে, আপনারা পলিটিসিয়ানরা মানুষকে শুধু শুধু আশ্বাস দেন। রোগী কিন্তু আশ্বাসে বাঁচে না বিভাসবাবু।

বিভাসবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—আমি শুধু শুধু আশ্বাস দিই? কেউ বলতে পারবে একথা? ডেকে এনো তাকে আমার সামনে।

মুক্তি বলল—কেন? যদি আমি-ই বলি। মনে করুন, ইলেকশানের সময় তো কতো কথা বলেছিলেন আপনি! করেছেন সে সব?

ঠিক এই সময় কল্যাণী গরম সুজির প্লেট হাতে নিয়ে বাইরে এলেন। বললেন—মুক্তি একগ্লাস জল নিয়ে আয় তো।

মুক্তি বলল—আনছি মা।

কল্যাণী বললেন—ঠাকুরপো, সীতার অসুখ দেখে মুক্তির মন মেজাজ ঠিক নেই। ওর কথায় কিচ্ছু মনে করবেন না যেন।

বিভাস বললেন—না, না, কিচ্ছু মনে করিনি! ওর গালাগালি শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু এ্যাই সেরেছেন। আমি যে মিষ্টি খাইনে বৌদি।

—ওমা! কেন?

– আর কেন! ব্লাডের মধ্যেই সুগার দেখা দিয়েছে। ঐ মাঝে মাঝে চা-টা শুধু খাই।

কল্যাণী অবাক! বিভাসবাবুর চল্লিশ বছরও বয়েস হয়নি। এরই মধ্যে সুগার। হেসে বললেন—আপনার দাদাকে এখনও সেরখানেক রসগোল্লা দিলে, একাই শেষ করে দেবে!

মুক্তি জলের গ্লাস নিয়ে এসে রাখল।

কল্যাণী বললেন—তা হলে কয়েকটা লুচি করে দিই ঠাকুরপো।

বিভাসবাবু বললেন না, না, কিছু দরকার নেই। খেতে বড্ড অবেলা হয়ে গেছে। কলেজের যে সব কাণ্ড!

মুক্তি এখন শান্ত। বলল—কলেজে কি?

—ওহো, তোমাকে বলিনি। আজ ইনটারভিউ ছিল। মুক্তি একটু অবাক হ'ল—কিসের ইনটারভিউ?

ঐ যে হিস্ট্রির লেকচারার নেবে। আগের ভদ্রলোক তো চলে গেছেন অনেক দিন।

কল্যাণী বললেন—ইনটারভিউতে কাকে 'সিলেকট' করলেন?

বিভাসবাবু বললেন—ঐ হরিপদকে, হরিপদ মুখার্জি।

মুক্তি বলল—আমি চিনি থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। ইণ্টারমিডিয়েট দুবার ফেল করেছিল। তবে এ বছর পি, এইচ, ডি ম্যানেজ করেছে কিন্তু আপনি ইণ্টারভিউ নিলেন?

বিভাসবাবু বললেন—নোব না কেন? ও, তুমি ভাল ছাত্রী। আবার এখন এম, এ পড়ছ। কিন্তু তুমি অবাক হচ্ছ কেন মুক্তি? এ্যাঁ? এতে অবাক হবার কি আছে? ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি বলে কি কলেজের লেকচারারের ইনটারভিউ নিতে পারব না! স্কুল কলেজে পড়াটাই সব? কি হল? উত্তর দাও?

মুক্তি শুধু শান্ত গলায় একরাশ হতাশার সঙ্গে বলল—না। বলার কিছু নেই।

বিভাসবাবু বললেন—ছাখো মুক্তি, তুমি জানবে জীবনের অভিজ্ঞতার দামটাই সবচেয়ে বেশী। এই যেমন ধরো। গীতা। গীতা যিনি লিখেছিলেন, তিনি কোন্ ইউনিভার্সিটি থেকে এম, এ পাশ করেছিলেন? এ্যাঁ?

কল্যাণী বললেন—তুই সীতার ঘরে যা দেখি। উঃ তোকে নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা! কেবল ঝগড়া, ঝগড়া, ঝগড়া। হ্যাঁ, ঠাকুরপো। সীতাকে কি সত্যি বাইরে কোথাও পাঠাতে পারবেন? কৈ আমার দিব্যি করে বলুন তো।

বিভাসবাবু বললেন—পারব বৌদি, পারব। আপনি ওর প্রেসক্রিপসন-গুলো আমাকে দেবেন। আর বিজয়দার একটা দরখাস্ত।

—এই বলে লিখবেন আমি একজন পলিটিক্যাল সাফারার! স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বমোট দশবার কারাবরণ করেছি! আমার প্রথমা কন্যা এক অদৃষ্টপূর্ব রোগে আক্রান্ত। এখানকার কোন চিকিৎসক তার রোগ নির্ণয় করতে পারছেন না। অতএব—

—দরখাস্ত আমি লিখতে পারব না বিভাস। তোমাদের কাছে আবেদন, নিবেদনের মধ্যে আমি নেই।

হঠাৎ একটা গম্ভীর গলা উঠোন পেরিয়ে ভেসে এল।

বিভাসবাবু চমকে উঠলেন একটু। বিজয়দা বাড়ি ফিরেছেন।

॥ ১২ ॥

সীতার ঘরের এক কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

মুক্তি সেই আলোয় দিদির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। ঘরের পশ্চিমে এক ফালি বারান্দা। সমরদা চুপ করে, সেই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

মুক্তি দেখছিল, দিদির নিরক্ত মুখে কেমন ধূসর—তামাটে ছায়া। গায়ে হাত দিল মুক্তি। একি! আবার জ্বর এল নাকি? টেবিলে ওষুধপত্র, জলের গ্লাসের কাছে থার্মোমিটারটা পড়েছিল। সেটা নিয়ে মুক্তি জ্বর দেখল। এখন ৯৯.৫! না, বেশি জ্বর নয়। থার্মোমিটার খাপে ভরে রাখতে গিয়ে প্রেসক্রিপসানগুলোর ওপর নজর পড়ল মুক্তির। এক একটা করে পড়ে দেখল। সবগুলো লেটার হেডেই বড় বড় বিদেশী ডিগ্রীর ছড়াছড়ি। গাল ভরা বিদেশী ডিগ্রীব ওপর আমাদের লোভ চিরকালের। বিদেশীদের সার্টি-ফিকেট ছাড়া আমাদের মন ওঠে না। এই ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমাদের কবে ঘুচবে কে জানে। মুক্তি ভাবছিল, বিদেশী ডিগ্রীর এতো আয়োজন,

এতো সত্ত্বেও দিদি কিন্তু ভাল হচ্ছে না। মা, ঠিকই বলেছিল, ডাক্তাররা রোগটা ধরতেই পারছে না। যদি এইভাবে আর কিছুদিন চলে তবে দিদিকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

সমর বারান্দা থেকে ঘরে এল।

মুক্তি বলল—তোমার কি মনে হয় সমরদা? দিদি ভাল হবে?

সমর বলল—বাইরে কোথাও পাঠানোই ভাল। সত্যি এদেশে সীতা ভাল হবে না। অসম্ভব। তোমরা মিছিমিছি সময় নষ্ট করছ।

—কিন্তু টাকা কোথায়?

—কেন? 'লোন' নিতে বল কাকাবাবুকে।

বাজারে প্রচুর লোন পাওয়া যায়। এই তো আমাদের ফ্যাক্‌ট্রির জন্য দশকোটি রুবল 'লোন' নেওয়া হল। অবশ্য ইণ্ডিয়ান কারেন্সীতে আমরা শোধ করব, উইথ ইনটারেস্ট।

—ইনটারেস্ট কত?

—খুব করে তলিয়ে দেখলে মনে হবে একটু 'হাই'। কিন্তু তাতে কি? আসল কথা 'উই ওয়াণ্ট মোর প্রডাকশান'।

—তোমাদের কারখানার কি তৈরি হয়, সমরদা?

—স্টীল। জাতির 'ব্যাকবোন'।

মুক্তি বলল—জাতির জীবন তো আর তৈরি করতে পার না।

সমর হাসল। —তুমি কি যে মাঝে মাঝে বলনা, মুক্তি, হাসি পায়। জাতির জীবন আবার ফ্যাক্‌ট্রিতে তৈরি হয় নাকি!

মুক্তি বলল—আমি বলছি, তাহলে শুধু মেরুদণ্ড নিয়ে কি হবে, আসল তো হল শরীর, লাইফ, জীবন। ভারতবর্ষের নতুন জীবন তৈরি হতে পারে—এমন একটা কিছু গড়ে তোলা যায় না? এই ভারতবর্ষের মাটি জল মিশিয়ে নতুন জীবন গড়ে ওঠে না? সব যে চলে যাচ্ছে সমরদা। চলে যাবেও। চরিত্র যাবে, ধর্ম যাবে, সংস্কৃতি যাবে, সাহিত্য যাবে, সংগীত যাবে, সমাজ যাবে—শুধু তখন তোমার 'ব্যাকবোন' তৈরির ফ্যাকট্রি চালিয়ে কি কিছু রাখতে পারবে? কারখানা দিয়ে কি জাতি গড়া যায়, চরিত্র গড়া যায়?

সমর বলল—তোমার হেঁয়ালি সত্যি দুর্বোধ্য। কি যে তুমি বল, বুঝি না। মডার্ণ ওয়ার্ল্ডে কারখানাই সব। প্রডাকশানই শেষ কথা।

মুক্তি বলল—হবে হয়ত। তবে আমার কাছে মানুষই সব। মানুষই শেষ কথা।

কল্যাণী ডাকছিলেন—মুক্তি, বাবা এসেছেরে। বাইরে আয়।

মুক্তি বলল—যাই—মা। এ্যাই, সমরদা যাবে নাকি বাইরে?

সমর বলল—চল।

মুক্তি, সমর বারান্দায় বেরিয়ে এল।

বিজয়বাবু পেছনের এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন—কবরেজমশায়কে সঙ্গে করেই নিয়ে এলাম। উনি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছলেন। তাই দেরি হল একটু। বসুন, দীননাথদা।

বয়েস সত্তর হলেও বিজয়বাবুর স্বাস্থ্য আজও ভাল। গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী। পরণে খাটো ধুতি। সবই মোটা খদ্দরের। চটিটা খুলে মাদুরের এক পাশে বসে পড়লেন তিনি।

মুক্তি বাবাকে প্রণাম করতে বিজয়বাবু বললেন—মুক্তি, দীননাথদা সীতাকে দেখুন। কি বলিস?

বিভাস এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। বিজয়বাবুকে তিনি চেনেন, সমীহ করেন। কিন্তু এই কবরেজকে দেখানোর ব্যাপারটা আর বোধহয় সহ্য করতে পারলেন না। বললেন—বিজয়দা শেষ পর্যন্ত হাতুড়ে কবরেজ নিয়ে এলেন! আমি যে সীতাকে ফরেন-এ পাঠাবো ভাবছি।

বিজয়বাবু বললেন—দ্যাখো বড় বড় ডাক্তার। এক একজনের এক হাত লম্বা ফরেন ডিগ্রী। এদের দেখিয়েও কিছু হ'লনা। একজনের সঙ্গে আর একজনের মত মেলেনা। আজ ভোরে কথাটা মাথায় এল। যে দেশের অসুখ, আরোগ্যের ওষুধ সেই দেশেই কোথাও আছে। আমাদেরই সেটা খুঁজতে হবে। তাই মনে হ'ল, একবার কবরেজী চিকিৎসা করাই। সীতার ভাল হওয়া নিয়েই কথা। কি বল বিভাস?

মাদুরে বিজয়বাবুর পেছনে কবিরাজমশাই বসেছিলেন। যেন ঝিমুচ্ছিলেন।

মাথার চুল সব সাদা, গায়ের রং কিন্তু ফর্সা, বয়সের তুলনায় শরীর ভাল। পরণে মোটা আধময়লা খদ্দর। সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য বলে সুনাম আছে। বহুদর্শী প্রবীণ কবিরাজ এ অঞ্চলের।

তাঁর উদ্দেশ্যে হাতুড়ে শব্দটা শুনে মুক্তি জ্বলে উঠল। বিশেষ করে বাবা যাকে ডেকে এনেছে! কিন্তু সে কিছু বলল না। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করল।

বিজয়বাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুই কি বলিস্ মুক্তি?

মুক্তির গলার স্বরে একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা ফুটে উঠল। বলল—হ্যাঁ, উনি দেখবেন।

বিভাস বলে উঠল—মুক্তি তুমি "এগ্রি" করছ! আশ্চর্য! তোমাকে অন্তত এতোটা ব্যাকডেটেড ভাবিনি। ভেবেছিলাম, কাল সকালেই সীতাকে জীপে করে বরাবর কলকাতা নিয়ে চলে যাব।

মুক্তি আর সহ্য করতে পারল না। এবার সোজা বলল—আমাকে কতোটুকু আপনি জানেন বিভাসবাবু? আর কাকে হাতুড়ে বলছেন? আপনি কবরেজমশায়কে চেনেন? আপনি জানেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র যখন লেখা হয়েছিল, তখন আপনাদের মডার্ণ ফার্মাকোলজির জন্ম হয়নি?

বিজয়বাবু শুধু বললেন—ঠিক কথা।

বিজয়বাবু যেন একটু সাহস পেলেন। এমন সময় মৃন্ময়কে আসতে দেখে খুশি হয়ে বললেন—আরে এসো, এসো। ভালই হয়েছে। ঠিক সময়ে এসেছ। বিভাস, মৃন্ময়কে চেনো তো? ও আমাদের দেশের গৌরব। থাক্, বাবা থাক্, প্রণাম করতে হবে না। সমর, বোসো তোমরা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মৃন্ময়, সমর তোমরা, বাবা আমাকে একটু 'এডভাইস' দাও তো। সীতার অসুখ নিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটাকে বোধহয়, বাঁচাতে পারলাম না। তা শোন, আমি এই কবরেজমশায়কে ডেকে আনলাম। এঁকে তোমরা চেন তো। আমরা কতবার একসঙ্গে জেলে গেছি। এখন বিভাস বলছে, ওকে 'ফরেন'-এ পাঠাবে। কাল জীপে করে কলকাতা নিয়ে চলে যেতে চায়। সমর বলল—ফরেন-এ কোথায় পাঠাতে চান বিভাসবাবু?

বিভাস বলল—ভাবছি, আমেরিকা পাঠাব।

সমর এক ফুৎকারে নাকচ করে দিল—রাবিস!

বিভাস বেগে উঠল—হোয়াট? রাবিস? কি বলছ তুমি?

সমর বলল—আমি বলছি, ওসব বুর্জোয়া কান্ট্রিতে পাঠিয়ে কিস্সু লাভ নেই। কোন সোশ্যালিষ্ট কান্ট্রিতে পাঠাতে পারেন?

বিভাস রুক্ষস্বরে বলল—মানে?

মুক্তি বলল—দোহাই তোমাদের সমরদা, বিভাসবাবু। আপনাদের ঐ সব 'ইডিওলজির' কচকচি রাখুন। রোগী এখন "ডেথ বেড"-এ আপনাদের 'ইডিওলজি' নিয়ে তর্ক সুরু হয়ে গেল! উঃ আশ্চর্য! কববেজমশায়, আপনি চলুন, দিদির ঘরে। মৃন্ময়দা, তুমি আসবে একটু!

মৃন্ময় বলল—আসছি।

বিজয়বাবুও সঙ্গে সঙ্গে এলেন।

চারজনে সীতাব ঘরে এসে দাঁড়ালেন। কবিরাজমশায় মোড়াটা টেনে নিয়ে তক্তপোষেব কাছে বসে বললেন—মুক্তি, আলোটা এদিকে দাও তো মা!

মৃন্ময় একমনে একটার পর একটা প্রেসক্রিপসনগুলো দেখছিল।

কবিরাজমশাই, রোগের আনুপূর্বিক ইতিহাস শুনতে লাগলেন—বিজয়, তা হলে প্রথমে জ্বর হয়েছিল।

—হ্যাঁ, দাদা।

—কত জ্বর উঠত?

এরিমধ্যে কল্যাণী এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—চার, সাড়ে চার।

আচ্ছা বৌমা জ্বরটা ঠিক কখন বেশী উঠত বলতে পার?

—ঠিক দুপুরের সময়।

—কমে যেত কখন?

—বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কমত।

কবিরাজমশায় মনে মনে কি ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন—
—বেশ। আচ্ছা, এরকম কদ্দিন ছিল?

—বেশি দিন নয়। জ্বরটা একটু বাঁকা মনে হতেই উনি একজন

এম আর সি পিকে ডাকলেন। ঐ যে শহরে সপ্তাহে একদিন করে আসেন, কয়েক হাজার টাকা নিয়ে যান।

কবিরাজমশাই বললেন—তারপর ?

—তিনি ওষুধ দিতে একদিনেই জ্বরটা কমে গেল। পরদিন ভাত খেল। কিন্তু তার দুদিন পরে আবার জ্বর।

মৃন্ময় বলল—ওষুধের এ্যাকশানটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বরটা আবার এল মনে হয়।

কবিরাজমশাই বললেন—ঠিক বলেছ বাবা। তার পরই···

কল্যাণী বললেন—এমনি করে ডাক্তারের পর ডাক্তার বদল হতে লাগল। চারজন ডাক্তার চলে গেলেন। মেয়েটার দশা দেখুন। বেঁচে আছে কিনা, দেখলে সন্দেহ হয়। বিছানার সঙ্গে মিছে গেছে। আর ওকে চোখে দেখতে পারিনে।

কবিরাজমশাই অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর এক সময় বললেন—একবার আলোটা তুলে ধরতো বাবা—মুখটা দেখি।

মৃন্ময় আলোটা তুলে ধরতে, কবিরাজমশাই অনেকক্ষণ ধরে সীতার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চোখের পাতা টেনে দেখলেন। আঙুলের নখও টিপলেন একবার! কপালে কয়েকবার হাত বুলোলেন। তারপর বললেন—হয়েছে, আলো নামাও।

মৃন্ময় আলোটা নামিয়ে রাখল।

ততক্ষণে কবিরাজমশাই, নাড়ী দেখছেন। চোখ বুজে, ডান হাতের তিনটে আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ নাড়ী টিপে বসে রইলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট। যেন কবিরাজমশাই ধ্যান করছেন।

মুক্তি, মৃন্ময় সবাই অবাক হয়ে দেখছিল। সারা ঘরে একটা পিন পড়লেও শব্দ উঠবে।

নাড়ী দেখা শেষ করে কবিরাজমশাই উঠে বাইরে এলেন। এসে সেই মাদুরে তাঁর পুরনো জায়গায় চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

মুক্তি আসতে আসতে শুনতে পাচ্ছিল। বিভাস আর সমর কি নিয়ে

কথা বলতে বলতে হো হো করে হাসছে।

মুক্তি বলল—আপনাদের ইণ্ডিয়ানজির ঝগড়া মিটে গেছে তা হলে।

সমর বলল—এডজাস্টমেণ্ট! বুঝলে? মুক্তি, পলিটিকস মানেই 'টেম্পোরারি এডজাস্টমেণ্ট এণ্ড কোয়ালিশন'।

কবিরাজমশাই অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন—আচ্ছা, বিজয় ক'মাস বৃষ্টি হয়নি বলতে পার?

বিজয়বাবু বললেন—পাঁচ ছ'মাস নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, ঠিক এ ক'মাস এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। মাঠে একটা ঘাসের ডগা পর্যন্ত দেখবেন না। দুপুর বেলা তো মাঠের দিকে তাকালে মরুভূমি মনে হবে। লু বয়। আবহাওয়া পাল্টে গেছে দেশের। সারা ভারতবর্ষ বোধহয় মরুভূমি হয়ে যাবে!

সমর বলল—তার সঙ্গে রোগীর কি সম্পর্ক, তাতো বুঝলাম না।

বিভাস বলল—সমর, আরে মরুভূমিতেও আজকাল চাষবাস হচ্ছে হে। আমেরিকায় তো!

সমর বলল—দাদা রাশিয়ায়ও।

মুক্তি বলল—প্লীজ, আপনারা একটু চুপ করুন।

বিভাস বলল—আমি তাহলে আজ আসি বিজয়দা। আমার একটু বিশেষ কথা ছিল আপনার সঙ্গে। বুঝতেই পারছেন, ইলেকশন আসছে।

বিজয়বাবু কবিরাজমশায়ের দিকে তাকিয়ে, বললেন—দাদা, আপনি কি ভাবছেন?

কবিরাজমশাই বললেন—মন দিয়ে শোন বিজয়। নাড়ী দেখে আমার মনে হ'ল, আগের অসুখটা ছিল, পিত্তাধিক্য বশতঃ কিন্তু এখন শরীরে বায়ুর প্রকোপ প্রচণ্ড। নাড়ীতে তাই পেলাম।

মুক্তি বলল—এখন ট্রিটমেণ্টের কি হবে?

মৃন্ময় বলল—সীতার অসুখটা তাহলে কি?

কবিরাজমশাই বললেন—অসুখটা বাবা, একরকমের উন্মাদ রোগ। আমাদের আয়ুর্বেদে এর নাম 'মূকোন্মাদ'। তাই রোগী কথা বলতে পারছে না। আবহাওয়া মরুভূমির মত। এর মধ্যে সীতা নিশ্চয়ই স্কুলেও যেত। এই করে,

ওর মাথার স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে গেছে। আয়ুর্বেদে এ রকম রোগীর কথা পাওয়া যায়। তবে খুব কম।

মুক্তি বলল—আপনি কি তাহলে দিদির ট্রিটমেণ্ট করবেন?

কবিরাজমশায় থেমে থেমে বললেন—তোমার বাড়ির পেসেণ্ট, তোমরা বল। আমি তো ভেবেছি, কয়েকদিন চিকিৎসা করে দেখব—আমাদের ওষুধে কাজ দেয় কিনা। কিন্তু বিভাসবাবু, সমরবাবু যা বলছেন, ঐ ব্রেন টিউমারের কথা—

বিজয়বাবু বললেন—না, না, দাদা আপনি ট্রিটমেণ্ট করুন। মৃন্ময়, তুমি কিছু বল।

মৃন্ময় বলল—আমার মনে হয়, কবরেজমশায় ঠিক কথাই বলছেন। আবহাওয়া সীতার শরীরের ওপর 'এফেক্ট' করেছে। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো 'টেমপোরারিলি ইনএ্যাকটিভ' হয়ে যেতে পারে। এটা সায়েন্টিফিক বলে আমার মনে হয়।

সমর বলল—ননসেন্স, ডি এস সি হয়েছ বলে, মেডিক্যাল সায়েন্সও বুঝবে, তার কোন মানে নেই।

মৃন্ময় সমরের দিকে একবার তাকাল শুধু। কিন্তু কোন উত্তর করল না।

কল্যাণী ট্রেতে করে পাঁচ কাপ চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে মুড়ির প্লেট।

বিজয়বাবু বললেন—তোমার মত কি, কল্যাণী?

কল্যাণী প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে বললেন—ছাখো, আমার মনে হয়, বিভাস ঠাকুরপো যখন 'ফরেন' পাঠাতে পারবেন বলছেন, সমরেরও যখন তাই মত, তখন এ চান্সটা নেওয়াই ভাল। একবার চান্স চলে গেলে, আর নাও আসতে পারে।

বিজয়বাবু চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—ছাখো, এ ব্যাপারে নানা প্রশ্ন জড়িত। প্রথম প্রশ্ন, এত টাকা কোথায় পাব। যদি আমার সব জমিজমা বিক্রি করেও দিই, তাতেও টাকা উঠবে না।

সমর বলল—জমিটমি রেখে কিছু ফায়দা নেই, কাকাবাবু, ওসব বিক্রি করে শহরে চলে যাওয়াই ভাল। বাবাকেও তাই বলছি। এই মাটি আঁকড়ে

অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকার কোন মানে হয়না। মোস্ট 'প্রিমিটিভ এ্যাণ্ড ব্যাকডেটেড' আইডিয়া।

বিজয়বাবু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—'নেক্সট' প্রশ্ন। সীতাকে যদি পাঠানো সম্ভব হয়ও, তাহলে সঙ্গে আমাদের কাউকে যেতে হবে।

মুক্তি সোজা বলল—আমি দিদিকে ছেড়ে থাকব না, যাবনা। বাবা, আপনি ও লাইনে ভাববেন না।

সমর বলল—মুক্তি তুমি এতো 'আনরিজনেবল' কেন? প্রশ্ন হচ্ছে, সীতাকে ভালো করা। সে ভালো করার জন্য, যা প্রয়োজন তা করতে হবে। তারজন্য জমি-জমা বাড়িঘর বিক্রি করতে হবে, দরকার হলে।

বিভাস বললেন—'রাইট ইউ আর' একেই বলে 'প্রগ্রেসিভ থিঙ্কিং' প্রয়োজন মেটানো-ই হ'ল বড় কথা। মডার্ণ সোসাইটির সেটা অবদান—প্রয়োজনবোধে প্রয়োজন মেটানো, এবং সে জন্য যে ব্যবস্থা দরকার তা নিতে হবে।

মৃন্ময় বলল—না, আমি আপনার সঙ্গে একমত নই, বিভাসবাবু প্রয়োজন মেটানোয় বড়ো কথা নয়। প্রয়োজনের পেছনে এথিকস আছে কিনা দেখতে হবে, তার চরিত্র দেখতে হবে এবং তা মেটানোর পেছনেও 'এথিক্যাল কনসেণ্ট' আছে কি-না দেখতে হবে।

সমর বলল—থামো, এথিক্যাল ভ্যালুজ-এর দাম নেই এখন। তা জানো?

কবিরাজমশায় ধীরে ধীরে বললেন—ছাখো, আমি তোমাদের সকলের কথা শুনলাম। ভেবেও দেখলাম। মেয়েটার জীবন নিয়ে প্রশ্ন যখন, তখন আমি বলব, তোমরা ফরেন-এ পাঠাবার তদ্বির তদারক কর। আমি ইতিমধ্যে দিন সাতেক দেখি। বুঝলে বিজয়—সাত দিনের মধ্যে আমি বুঝতে পারব, রোগী সারবে কিনা। যদি না সারে তবে তোমাদের যা খুশি তাই করবে।

সমর রুক্ষ গলায় বলল—এই সাত দিনের মধ্যে পেসেণ্ট যদি এক্সপায়ার করে?

কবিরাজমশায় সমরের দিকে তাকিয়ে বললেন—নাড়ীতে মৃত্যুর লক্ষণ

নেই। সাতদিনের মধ্যে পেসেণ্ট এক্সপায়ার্ড করতে পারে না, অন্তত আমি এই মুহূর্তে যা দেখছি, আমার জ্ঞান যা বলছে।

বিভাস বলল—আপনি গ্যারান্টি দিতে পারেন? দেখুন, আমি কিন্তু এখানকার এক্স-এম এল এ, ভেবে-টেবে কথা বলবেন।

সমর হাসল।

মুক্তি বলল—বিভাসবাবু, সন্ধ্যে থেকে আপনাদের অনেক অত্যাচার আমি অনেক কষ্টে সহ্য করেছি। আর পারছি না। কবরেজমশায়, ওদের হয়ে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনি চিকিৎসা স্টার্ট করুন। দিদির যা হয় হবে। পেসেণ্ট আমার বাড়ির। আপনাদের এই মাতব্বরি অসহ্য। আর পারছি না, আমরা।

কবিরাজমশায় বললেন—বেশ। তা বিজয়, কিছু অনুপান জোগাড় করতে পারবে তো!

—যেমন?

—মধু, পলতা পাতা। আমি কয়েকটা বটি দিয়ে যাচ্ছি, সঙ্গেই আছে। কৃষ্ণ চতুর্মুখঃ। আর হ্যাঁ, একটা তেল দেব। শোন, তেলটা স্নান করাবার অন্তত আধঘণ্টা আগে মাথায় একটু চপচপে করে মাখাবে। মাখিয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখবে। অনেকক্ষণ। তারপর ভাল করে মুছে দিও। তা কাউকে পাঠাতে পারবে আমার সঙ্গে?

বিজয়বাবু বললেন—গোবিন্দ? গোবিন্দ কোথায়?

কল্যাণী বললেন—গোবিন্দকে দোকানে পাঠিয়েছি। বাড়িতে ডালটাল কিছু নেই।

বিভাস বললেন—ঠিক আছে, বৃহস্পতিবার আমি আসব। এর মধ্যে ফরেন যাবার কাজটা এগিয়ে নেব। আজ আসি।

॥ ১৩ ॥

বিভাসবাবু চলে যেতে মুক্তি দিদির ঘরে ফিরে এল। সীতা তেমনি শুয়ে আছে। শরীরে এখন যেন জীবনের চিহ্ন নেই। মুক্তি আবার থার্মোমিটার দিল। না, জ্বর আর আসেনি। এখনও জ্বরটা বাড়ে দুপুরের সময়। মুক্তি মনে মনে ভাবছিল, সাতদিন! মাত্র আর সাতদিন। তারপর যদি ভাল না হয়, তবে জমি-জমা ঘর-বাড়ি বিক্রি করে তাদের 'ফরেন' যাবার টাকার জোগাড় করতে হবে। তারপর সেই শহরের কোন অন্ধগলিতে বড়জোর দুটো ছোট ছোট সঁ্যাত সঁ্যাতে ঘর ভাড়া করতে হবে। বারান্দার এক ধারে রান্না। মুক্তিকে পড়াশোনা বন্ধ করে কোথাও কেরাণীর চাকরির জন্য ধর্ণা দিতে হবে। হয়ত এই বিভাসবাবুর কাছে প্রতিদিন দৌড়াতে হবে তাকে চাকরির জন্য। ওঃ, আর ভাবতে পারে না, মুক্তি! তার এতদিনের পরিচিত জীবন, এই গ্রাম ঘর-বাড়ি উঠোন, নদীতীর, জমি—সব থেকে তাকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে এই মৃত্তিকার প্রোথিত জীবনের গভীর শেকড় উৎপাটিত করে, তাকে আবার নতুন করে অপরিচিত কঠিন, হৃদয়হীন কংক্রিটের রাজ্যে আশ্রয় নিতে হবে! মুক্তির জীবনে একী সংকট দেখা দিল, কী কঠিন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল!

মুক্তি ডাকল—দিদি, দিদিরে?

সীতার চোখ বেয়ে তখন জল পড়ছে। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় এই দৃশ্য বড় করুণ লাগল মুক্তির। দিদি বোধহয়, কথাবার্তা সব শুনেছে।

মৃন্ময় এসে দাঁড়াল।

মুক্তির হঠাৎ মনে পড়ল, স্বামীজী আজ রাত্রে বলেছেন, সীতা ভাল হয়ে যাবে। আর এই কথাটা মনে হতেই মুক্তি কোথা থেকে একটা বলিষ্ঠ বিশ্বাস ফিরে পেল। বলল—মৃন্ময়দা, আমি ঠিক বলেছি না?

মৃন্ময় বলল—আমি এই কবরেজী ট্রিটমেন্টের পক্ষে, যে যাই বলুক।

শোন, আমার মতে ভারতবর্ষের রোগের চিকিৎসা, ভারতবর্ষের ভেষজ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। তাই বলে যে বাইরের সায়েন্টিফিক রিসার্চের সাহায্য নেব না, তা নয়, কিন্তু মূল উপাদান হবে ভারতবর্ষের। সীতার ব্রেনে যদি অপারেশান করতেই হয়, তবে নিশ্চয়ই তা করতে হবে। আচ্ছা, মুক্তি, সমর বোধহয় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তুমি একটু যাও, ওর কাছে। ও কেন যেন 'ইনসালটেড্ ফীল' করছে। আমার সঙ্গে কথাই বলছে না।

মুক্তি এতক্ষণ যে ঘটনাটা ভুলে থাকতে চেয়েছিল, আবার সেই ঘটনাটা তাকে চিন্তিত করে তুলল। সমর আজ কিছুতেই খুশি নয়। বোধহয়, মৃন্ময়দার 'প্রেজেন্স'-এ ও খুশি হতে পারছে না। কিন্তু তার কি করার আছে।

মুক্তি বলল—তুমিও চল। আমার একা ভাল লাগছে না।

ওরা বাইরে এল।

মৃন্ময় বলল—সমর, ফিরবে এখন ?

সমর অনিচ্ছার সঙ্গে বলল—হ্যাঁ, যাব এবার।

—কাল দুর্গাপুর ফিরে যাচ্ছ না ত ?

—না। ভাবছি, ছুটিটা কাটিয়েই যাই।

—সেই ভাল। তোমরা এলে, গ্রামের ভাল হয়। এই তো এতক্ষণ চা খেতে খেতে ঐ দোকানে বসে বসে কথা বলছিলাম।

সমর বলল—গ্রামে এলে আমার কি ইচ্ছে হয় জান ? সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দিই।

মুক্তি বলল—রাগ কোরোনা, সমরদা, ইচ্ছেটা খুব ভাল নয়।

মৃন্ময় হেসে বলল—আচ্ছা সমর তুমি গ্রামের ওপর এতো খাপ্পা কেন ?

সমর রূঢ়ভাবে বলল—এই দারিদ্র্য আমি দুচোখে দেখতে পারিনে। আজ সন্ধ্যায় ওপাড়ার একটা মেয়ে চাল ধার করতে এসেছিল। জানো, মৃন্ময়, এই লোকগুলো এমনি করে তিলে তিলে না মরে, যদি লড়াই করে মরত তবে দেশের চেহারাটাই পাল্টে যেত।

মুক্তি ভাবছিল, সমরের সঙ্গে তার চিন্তার ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে।

উত্তরটা মৃন্ময় দিল। বলল—দেশের চেহারা বদলে দেবার জন্য, এলোক-

গুলোর লড়াই করে মরাই উচিত ছিল! এটা তোমাদের মার্কসপড়া বিদ্যে। তোমরা বিপ্লব ছাড়া কিছু ভাবতে শেখনি। তোমাদের কথা মানেই বিপ্লব, রক্তাক্ত বিপ্লব।

মুক্তি বলল—হায়, সমরদা, তোমাদের গায়ের জোর যতটা, ভালবাসার জোর যদি ততটা থাকত!

সমর ধীরে ধীরে বলল—ভালবাসার জোরও বোধহয় শেষ কথা নয়, মুক্তি।

মুক্তি সমরদার গোপন অর্থ-টা বুঝতে পেরে চুপ করে রইল।

মৃন্ময় চুপ করে মাদুরে বসেছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল—তোমরা কথা বল, সমর। আমাকে এবার যেতে হবে। পিসি ঘুমিয়ে পড়ল বোধহয়।

মুক্তি বলল—দাঁড়াও টর্চ একটা দিই।

মৃন্ময় বলল—না, দরকার নেই। জ্যোৎস্না উঠেছে। দেখেছ? তারপর সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল: আঃ "আকাশ আমার ভরল আলোয়—" তারপর? মুক্তি, পরের লাইনটা যেন কি?

মুক্তি বলল—"আকাশ আমি ভরব গানে"। মুক্তি দেখল, মৃন্ময় তেমনি পুবদিকে তাকিয়ে আছে। গ্রামের গাছপালার ওপরের আকাশে এখন গ্রীষ্মের প্রথম রাত্রির জ্যোৎস্না বিছিয়ে পড়ছে। নক্ষত্রের আকাশ এখন নির্মল, সুন্দর, গম্ভীর। কোথাও একটুও মেঘের কালো স্পর্শ নেই। তবে বৃষ্টি! বৃষ্টির পথ কতদূর। বৃষ্টি কবে আসবে! আজ পাঁচমাস এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য এই প্রান্তর, এই মাঠ, এই বৃক্ষশ্রেণী পিপাসার্ত! আর গ্রামের মানুষ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে—জ্বলে পুড়ে যাওয়া ফাটা মাঠের মাটিতে কবে এক পশলা বৃষ্টি হবে! চাষের সময় আসবে কবে!

হঠাৎ মৃন্ময় বলল—মুক্তি, আমার মনে হয় বৃষ্টি নামবে।

মুক্তি অবাক! খুশি হয়ে বলল—কি করে জানলে মৃন্ময়দা?

—আকাশ দেখে!

—তাই নাকি! আকাশে কি দেখলে?

—চাঁদের চারদিকে একটা হালকা মেঘের স্তর পড়েছে দেখেছ? আর ঈশান কোণে একটু কালোছায়া।

মুক্তি উঠোনে নেমে এসে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।—হ্যাঁ, দেখছি।

মৃন্ময় বলল—গ্রামের লোক কি বলে জানো? 'দূর পরশ নিকট জল' তুমি জানবে, আকাশ আর হাওয়া দেখে, গ্রামের বহুলোক নির্ভুলভাবে বৃষ্টির 'ফোরকাস্ট' করতে পারে। তাই শুনে শুনে শেখা।

মুক্তি বলল—মানে?

—মানে, চাঁদের চারদিকে ঐ স্তরটা যত বিস্তৃত হবে তত সকাল সকাল বৃষ্টি নামবে।

সমর এতক্ষণ চুপ করেছিল। বলল—মৃন্ময় আজকাল সায়েন্স পড়ে পড়ে 'মোস্ট আনসায়ন্টিফিক' কথাবার্তা বলে। আশ্চর্য!

মৃন্ময় হাসল। বলল—সত্যি। সমর, আমি যে একটা ডি এস সি—এটা গ্রামে এসে ভুলে যাই। এতে আমার কিন্তু ভাল লাগে। চলি সমর। মুক্তি, চললাম।

মৃন্ময় গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

মুক্তি তার যাবার পথের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। চেয়ে চেয়ে ভাবছিল, মৃন্ময় তার সকল উদাসীনতা দিয়ে কি করে কত অনায়াসে তার জীবনের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে। এ খবর মৃন্ময়দা বোধহয় নিজেও জানে না।

সমর বলল—মুক্তি এসো।

কল্যাণী বাইরে এলেন। ইজিচেয়ারটায় বসে বললেন—মুক্তি, সমরের জন্য প্লেটে পায়েস রেখেছিলাম, এনে দেতো। এতো ঝামেলা যাচ্ছে, বাবা, আর মনে কিছু থাকে না।

সমর বলল—এবার যাব, কাকিমা। রাত সাড়ে ন'টা।

কল্যাণী বললেন—মুক্তি, কৈ আনলি?

—যাচ্ছি, মা।

মুক্তি চলে যাচ্ছিল। কল্যাণী বললেন—তরকারিটা যদি হয়ে থাকে নামিয়ে রাখিস্। ঢাকা দিবি রে। তুই আবার যেমন।

মুক্তি পায়েসের প্লেট এনে সমরের হাতে দিল।

কল্যাণী বললেন—জল কৈ ? ঐ ত্যাখ। যা বলব না, তা যদি তুই করতে পারিস্।

মুক্তি বলল—আমি অতো পারব না মা।

সমর খেতে খেতে বলল—মুক্তি আমার বেলায় বড় কৃপণ, কাকিমা। এক গ্লাস জল দেবে, তাতেও আপত্তি।

মুক্তি বলল—আপত্তি নয়, অনিচ্ছাও নয়। কিন্তু কি জান, এতো 'টায়ার্ড', এমন সব ঘটনা ঘটছে, যে আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মা, বাবার আসতে কত দেরি হবে বলল ?

—কেন রে ?

—না, আমি খেয়ে শুয়ে পড়ব।

অর্থাৎ, মুক্তি নিজের বিছানায়, নিজের মত পরিবেশে শুয়ে শুয়ে, মৃন্ময়ের কথা ভাবতে পারবে, যে মৃন্ময় ঐ জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে বলতে পারে 'আকাশ আমার ভরল আলোয়'। মৃন্ময়দা, তোমার আকাশ নয়, সে আরেক জনের মনের আকাশ যে ভরেছে, সে খোঁজ তুমি রাখ না, তুমি রাখলে না ?

সমর বলল—আরে, জল কৈ ?

মুক্তি ক্লান্ত গলায় বলল—ও হ্যাঁ, দিই।

—কি ভাবছিলে যেন তুমি ?

—ভাবনার কি শেষ আছে ? না, মন কোন সময় ভাবনা ছাড়া হয় ?

সমর বলল—স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলে না কেন ? উনি বলতে পারতেন। মনটন নাকি যৌগিক ক্রিয়ায় চিন্তাশূন্য করা যায়। ভারতবর্ষে কত যে বুজরুকি চলে ?

মুক্তি জলের গ্লাসটা রেখে বলল—বুজরুকির কথা কি বলছ ?

সমর বলল—ঐ যে সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক কাণ্ড!

মুক্তি বলল—তুমি কখনও কিছু দেখনি ?

—দূর দূর ওসব ভেল্কিবাজি। কেন ? তুমি দেখেছ নাকি ?

—না। তবে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বলেছেন, সীতা ভাল হয়ে যাবে।

সমর বলল—মাই গড! তুমি তাই বিশ্বাস করে বসে আছ?

মুক্তি ক্ষুণ্ণ হল! তার বিশ্বাসকে এই মুহূর্তে কেউ আঘাত করুক, তা সে চায় না। সে তো মেনে নিয়েছে 'ফরেন' যাওয়ার 'প্রিপারেশন' চলতে চলতে, দিদির কবরেজী চিকিৎসা চলুক। বলল—বিশ্বাস করে অন্তত দাঁড়িয়ে নেই, সমরদা!

—স্বামীজীকে নাকি, কে এক মহিলা আজ নদী থেকে বাঁচিয়েছে। নইলে আজ টেঁসে যাচ্ছিলেন।

কল্যাণী বললেন—তাই নাকি?

সমর বলল—তাহলে দেখুন, যিনি নিজের ভবিষ্যৎই জানেন না, বলতে পারেন না, তিনি পরেরটা বলেন কি করে? কাকিমা, এই অন্ধ বিশ্বাসই ভারতবর্ষের কাল হয়েছে। ঐ পাথর, ঐ দেবতা, ঐ কালী, ঐ শিব, ঐ বিষ্ণু! উঃ ইমবেসাইল!

কল্যাণী একটু পরে বললেন—সমরকে একটু এগিয়ে দে মুক্তি।

মুক্তি কেমন উদাসীন গলায় বলল—আচ্ছা, যাচ্ছি।

দুজনেই নিঃশব্দে হাঁটছিল। মুক্তির সারাটা দিন একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে কেটে গেল। এর মধ্যে শুধু মৃন্ময়ের সঙ্গটুকু, আর স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলার আনন্দটুকুই যা ব্যতিক্রম।

মুক্তি বলল—এবার আমি ফিরব সমরদা।

সমর বলল—বাঃ, কেন? আর একটু এসো।

মুক্তি বলল—বড্ড টায়ার্ড আমি সমরদা। শরীর ভেঙে আসছে।

সমর বলল—জানি। কিন্তু টায়ার্ড বলে আসতে চাচ্ছ না, না ভাল লাগছেনা বলে? মৃন্ময় হলে নিশ্চয়ই তাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।

একটু সময় চুপ করে থেকে মুক্তি বলল—তাই নাকি?

—কেন? আজ তো কিছু আগে তার বাড়ি গেছিলে। যাওনি?

মুক্তির গলার স্বর ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠছিল। শান্ত গলায় সে বলল—কার বাড়ি যাব, না যাব, তাও তোমার পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করছে নাকি! সমরদা, তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে!

—না, ভুলব কেন। আমি ভুলিনি। আমি জানি, তুমি চিরকালই তোমার খুশি মত চল। এবং বিয়ে হলেও সে রকম চলবে।

মুক্তি স্থির গলায় বলল—আমার স্বাধীনতা আমি কারুর কাছে 'সারেণ্ডার' করতে চাইনে।

—মৃন্ময়ের কাছে ?

মুক্তি ফুঁসে উঠল। বলল—বার বার তুমি মৃন্ময়কে এর মধ্যে টেনে আনছ কেন ? মৃন্ময় তোমার কি করেছে ?

—মৃন্ময় আমার যে ক্ষতি করেছে, জীবনে আর কেউ সে ক্ষতি করেনি। আচ্ছা, মুক্তি একটা কথা !

মুক্তি নিজেকে সামলে নিল। কারণ তর্কে লাভ নেই। শান্ত গলায় বলল—কি কথা ?

সমর বলল—একটা সত্য কথা বলবে ?

—আমি কি মিথ্যে কথা খুব একটা বলি !

—না, বলনা বলেই আমি জানি ! আমার ধারণাও তাই। তাহলে বল, মৃন্ময়কে কবে থেকে ভালবাস ?

মুক্তি একটু সময় চুপ করে রইল। বলল—ভ্যাখো, এই ভালবাসার ব্যাপারটা এতো সেন্‌সিটিভ' যে, মানুষের প্রায়ই বুঝতে ভুল হয়। তোমার সঙ্গে ভালবাসা, আর মৃন্ময়দার সঙ্গে ভালবাসা, আই 'মীন', শব্দটা যদি ভালবাসা হয়—তবুও এক নয়। তোমার সঙ্গে ভালবাসায় আমরা বড় কাছে এসেছি। পুরনো ঘটনাগুলো তুমি ভেবে ভ্যাখ ! আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে, তোমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি আমাকে ভালবাস ! তুমি বলেছিলে, আমি দেখতে সুন্দর বলে। আমি যে সুন্দর, সে 'সার্টিফিকেট' আমার বহু পুরনো। কিন্তু আমার শরীর সুন্দর বলে, কেউ যদি ভালবাসে, তবে আমার কাছে সে ভালবাসা, আজ বড় 'ভালগার' লাগে।

সাইকেলটা হাতে নিয়ে সমর নিঃশব্দে, মাথা নিচু করে হাঁটছিল। মুক্তি থামতে বলল—তারপর ?

মুক্তি বলল—শোন, একদিন মৃন্ময়দাকেও এই প্রশ্ন করেছিলাম। অনেক-

দিন আগে। তখন মৃণ্ময়দা এম এস-সি দেবে। ওর বাবার জন্য কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার ছিল। মৃন্ময়দা বলল—তুমি সুন্দর ঠিকই কিন্তু শরীরের সৌন্দর্য, সে তো একদিন চলে যাবে, মুক্তি। ঐ সোন্দর্যের ওপর চিরদিনের ভালবাসার ভার সহ্য হবে না।

আমি বললাম—তবে?

মৃন্ময়দা বলল—তুমি কি বুঝতে পারবে আমার কথা?

আমি বললাম—চেষ্টা করব।

মৃন্ময়দা বলল—শোন, সুন্দরের ঠিক কোন 'ডেফিনেশন' বা সংজ্ঞা এ পর্যন্ত কোন 'ফিলসফার' দিতে পারেনি। তবে আমি একটা উপমা দিয়ে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতে পারি।

আমি বললাম—যেমন?

—যেমন, তুমি সুন্দর, ঠিক এই নদীর মত, যে নদী থেকে শস্যের ক্ষেতে জল দেওয়া যায়, যে নদীতে আমি স্নান করে পবিত্র হই। কথাটা শুনতে তোমার কিছুটা 'পোয়েটিক' মনে হবে, কিন্তু ছাখো, প্রকৃত সৌন্দর্য তাই। প্রকৃত সৌন্দর্যের মধ্যে এই পবিত্রতা সবচেয়ে বড় কথা। আমি তোমাকে এই চোখ দিয়েই দেখি, এবং দেখি বলেই তোমার কাছে যাইনে। এই ভালবাসাকে আমি গোপন করে রাখতে চাই!

আমি বললাম—ঠিক বুঝলাম না, মৃন্ময়দা।

মৃন্ময়দা বলল—আত্মার সৌন্দর্যই আসল। তোমার শরীর, তোমার যৌবন—এই সব লোভ, এই সব ক্ষুধাকে অতিক্রম করে যে সৌন্দর্য—সে সৌন্দর্য তোমার মধ্যে আছে। তুমি হয়ত ঠিক জান না। আর ক'জনই বা নিজের পরিচয় জানে, জানতে চায়।

মুক্তি বলল—সমরদা, আমি সেদিন নিজেকে জানতে পারলাম। জানতে পারলাম, আমাকে যে চোখ দিয়ে তুমি দেখছ, সেটা ঠিক নয়—সে দেখাটা 'ইনকমপ্লিট', অসম্পূর্ণ। ওর ওপর বেশি দিন ভর করা চলবে না। ভর দিতে গেলে, একদিন সম্পর্কটা ভেঙে যাবে! কি জানি সে সময় এসেছে কিনা!

সমর হঠাৎ মুক্তির ডান হাতটা চেপে ধরল। মুক্তির মনে হচ্ছিল, সমরদা

রেগে গেছে। চিরকাল বিপ্লব বলে বলে, ওরা গায়ের জোরটাকেই বড় বলে জানে। এবং মানুষ তখনই রাগে যখন সে যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে না।

মুক্তি বলল—আঃ, লাগছে, হাতটা ছাড়ো!

সমর বলল—না, তোমার আমার সম্পর্কের একটা 'সোডাউন' হয়ে যাওয়া ভাল। ওতে আমি নিশ্চিত হব। ভাবব, জীবনের একটা 'চ্যাপ্টার' শেষ করে এলাম।

মুক্তি বলল—কেন যে তুমি আজ সন্ধ্যে থেকে এতো 'এক্সাইটেড' হচ্ছ, বুঝি না। কদ্দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল—অথচ তুমি যেন কিছুতেই খুশি নও। কি চাও তুমি, সমরদা, কিসে তুমি খুশি হবে।—আঃ সত্যি লাগছে। ছাড, প্লীজ!

সমর কি একটা অন্ধ, অথচ অব্যক্ত আক্রোশে ফুঁসছিল। সে মুক্তিকে আরও জোবে, আরও কাছে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছিল।

মুক্তি বলল—ছিঃ, একি করছ! দ্যাখো, তোমাকে একদিন সত্যি ভালবাসতাম। দেখা না হলে পাগল হয়ে উঠতাম আমি। এমন সুন্দর ভালবাসার সৌন্দর্যকে অসম্মান করতে নেই। 'লেট আস রিমেন ফ্রেণ্ডস ফর এভার'। আঃ, ওকি! দ্যাখো সমরদা, ভালবাসাকে অসম্মান যারা করে তারা ভালবাসার যোগ্য নয়। এই ভালবাসাই আমাকে নীচে নামতে দেয় না। নইলে তুমি জানো, তোমার হাতের যে আঙ্গুলগুলো আমার শরীরে এখন জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে—এক মুহূর্তে সেগুলোকে আমি ভেঙে দুমড়ে চুরমার করে দিতে পারি। আমার এই হাতের সরু সরু আঙ্গুলগুলোয় প্রচণ্ড জোর, আশা করি তুমি অন্তত তা জান। জান না?

সমর হঠাৎ ছিটকে সরে গেল। সাইকেলটা একটা গাছে ঠেস দিয়ে রেখে এখন হাতটা ঝাড়ছে কেবল।

মুক্তি চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বলল—দাও, একটু ম্যাসেজ করে দিই।

সমর কোন কথা বলল না। সাইকেলটায় কোনভাবে উঠে দ্রুত প্যাডেল করে চলে গেল।

মুক্তি একটু সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। রাস্তাটা সোজা গিয়ে আবার

ডান দিকে বেঁকে গেছে। তারপর সেই মোড়টা পড়বে, যেখানে নরঘাট-তমলুকের বাস দাঁড়ায়। সেখানে কয়েকটা টালির ছোট ছোট দোকান। চা হয়, বেগুনি আর চপ ভাজা হয়। তার গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মৃন্ময়দা আজ ওখানে চা খেয়েছিল। এখন সব বন্ধ, কোথাও লোকজন নেই। রাত্রি ক্রমশ গভীর হচ্ছে। নদীতীর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। এখন ওধারের বাবলা বনে কি একটা পাখি ডাকছে। ডাকটা এই রাত্রে কান্নার মত লাগে।

ভালবাসার মৃত্যু বোধহয়, এমনি কান্নার মত। এমনি নির্জন, এমনি বিষন্ন, এমনি অশ্রুময়।

॥ ১৪ ॥

এ ক'দিন মুক্তি অক্লান্তভাবে দিদির সেবা করেছিল। কবরেজী ওষুধ সে নিজে খল-নুড়িতে পিষে মধু দিয়ে দিদিকে খাইয়েছে। বিকেলে খাইয়েছে পলতার রসের সঙ্গে। দুপুরে দিদির মাথায় নিজে তেল মাখিয়েছে।

কলাপাতা নিয়ে এসে গোবিন্দদাকে বলেছে— দু বালতি জল দাও তো।

গোবিন্দ বলল—জল ত কলতলায় দিছি ছোড়দি।

মুক্তি বলল—তুমি যদি কখখনো মানুষ হতে গোবিন্দদা। কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলে, তবু যদি কিছু বোঝ।

গোবিন্দ অবাক। বলল—কেন, ছোড়দি ?

—আরে দিদির মাথা ধোয়াব। তোমার তোলা জল গরম হয়ে গেছে। দেখছনা, রোদে সব পুড়ে যাচ্ছে। আগুনের হল্কা বইছে। দাও, আবার তুলে দাও।

গোবিন্দ সদ্যতোলা দু'বালতি টিউবওয়েলের জল ঘরে এনে রাখল।

মুক্তি বলল—আমি মাথাটা তুলছি। বালিশের নিচে কলাপাতাটা ঠিক করে বিছিয়ে দাও। না না, হয়নি। হ্যাঁ।

মুক্তি দিদির মাথাটা খুব সাবধানে তুলে ধরল !

গোবিন্দ বলল—বড়দি কি বাচ্চা নাকি গো। এমন সাবধানে ধরচ, যেন কচি শিশু।

মুক্তি ধমক দিয়ে বলে—তুমি তোমার কাজ কর।

কলাপাতা বিছানো হলে মুক্তি বলে, মগটা কৈ ?

গোবিন্দ দৌড়ে কলতলা থেকে মগটা নিয়ে এলো।

মুক্তি ততক্ষণে কবরেজী তেলটা চপ্‌চপে করে দিদির মাথায় মাখিয়েছে। ওর মাথার চুল কি সুন্দর ঘন লম্বা। বালিশে যখন দিদি চোখ বুজে শুয়ে থাকে, তখন কি সুন্দর লাগে। লোকে তাকেই কেবল সুন্দর বলে। সে বোধহয় রংটা ফর্সা বলে। কিন্তু দিদির রং শ্যামল হলে কি হবে, দিদি তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি সুন্দর, এ-কথা মুক্তি হলফ করে বলতে পারে। আর মন ? অমন মাটির মত নম্র শান্ত। মাটির স্নেহশীল, ক্ষমাশীল মন কেউ কখনো পায়নি।

গোবিন্দদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, মুক্তি সীতার গা-টা ভিজে গামছা দিয়ে বেশ করে মুছে দেয়।

সীতা শুধু চেয়ে থাকে। মুক্তি বুঝতে পারে, দিদির চোখের কোণে জল। মুক্তি ভাবে, দিদিকে সে কিছুতেই বিদেশে যেতে দেবে না। কোন্ অজানা দেশ, সে দেশের হাসপাতাল। তাও যদি বাঁচার সম্পূর্ণ গ্যারান্টি থাকত। তার চেয়ে, এই ভাল। যদি মারা যায়, তবে এমনি করে সে দিদিকে সাজিয়ে দেবে—তারপর নদীর ধারে, যেখানে মুক্তি দুবেলা, যাওয়া-আসা করতে পারবে, সেখানে দাহ করে আসবে। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছে হয়, তার দিদির জীবন যেন এই মাটিতে, এই পরিচিত রোদ, আলো হাওয়ার জগতেই শেষ হয় !

কথাটা ভাবতে গিয়েই মুক্তির শরীর শিথিল হয়ে আসে। গ্রীষ্মের এই দুপুরের দগ্ধ মধ্যাহ্নের মত মন উদাসীন হয়ে ওঠে। মুক্তি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। সামনের সেই হলদীর শাখা নদীটা পার হলেই, বিরাট মাঠ, সেই দিগন্ত পর্যন্ত একটানা চলে গেছে। এখন দুপুর রৌদ্রে মরীচিকা খেলা করছে।

দূর গ্রামের ধারে। আশ্চর্য! ঠিক যেন সমুদ্রের ঢেউ। উঃ কী অসহ্য উত্তাপ এই রোদের। মাটি, গাছপালা, ঘাস, সব পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে।

ইস্, নদীর ওপরের বাঁশের সাঁকোটা কি ওরা সারাবে না। আচ্ছা, হঠাৎ যদি আজ বৃষ্টি নামে তবে মাঠে কাল সকালেই লাঙ্গল নামবে। তখন গ্রামের লোক যাবে কি করে? নদী সাঁতরে। না, বাবাকে বলতে হবে! আর বললে, বাবাও কি করবে। সেই কবে থেকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে এখানে একটা কংক্রিটের, অন্তত কাঠের পুল করে দেবার জন্য বলে আসছে। আজো হয়নি।

মুক্তি দিদির ঘরে ফিরে এল। দিদি বোধহয় ঘুমুচ্ছে। এখন মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েছে। শরীরটাও। তাই ঘুম আসছে বোধহয়। দিদির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হয় আচ্ছা, দিদির সঙ্গে যদি পরমেশবাবুর বিয়ে হ'ত, তবে? ভারি সুন্দর হ'ত। দুজনে সুখী হ'ত। কি আশ্চর্য দেখতে! প্রশস্ত কপাল, দুটি নত চোখ, নাক, মুখ—দুটি সুন্দর সরু ঠোঁট—এ ঠোঁটে কখনও কোন প্রেমিক স্পর্শ করলে, ভালবাসার অজস্র আনন্দ অশ্রু ঝরে পড়ত!

হঠাৎ সমরদার কথা মনে পড়ল। সমরদাই তাকে প্রথম স্পর্শ করেছিল। জীবনে যে কোন নারী, তার প্রথম পুরুষকে মনে রাখে। সম্ভবত তাই, সমরদা এতো অত্যাচার করলেও, মুক্তি কোন সময় না কোন সময় তাকে ক্ষমা করে। ভীষণ রাগ করে, কিন্তু আবার তাকে না দেখতে পেলে খারাপ লাগে।

আচ্ছা সমরদা তিনদিন হ'ল আসেনি। কোথায় গেল! সেদিন রাত্রে খুব রাগ করেছে নিশ্চয়ই। কাকে পাঠানো যায়!

কেউ ঘরে ঢুকতে মুক্তি চমকে উঠল।

কল্যাণী বললেন—আজো তো উপশমের কোন লক্ষণ দেখছি না। বরং আমার তো মনে হয়, রোগটা বাড়ছে। এখন জ্বর কতো রে?

মুক্তি থার্মোমিটার দিল। একটু পরে তুলে নিয়ে বলল—তিন।

কল্যাণী হতাশ গলায় বললেন—না, হবে না। মিছিমিছি দিনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিভাস ঠাকুরপোকে সেই দিনই বলে দিলে হ'ত।

মুক্তি বুঝতে পারল, কথাটা তাকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলা।

মুক্তি বলল—কালও তো এমন সময় তিন ছিল। আর দুপুরের দিকে রোজ তো এই থাকে।

—তাহলে, সারার লক্ষণটা কি দেখছিস বল? তুই তো নিজের হাতে ওষুধ খাওয়াচ্ছিস, তেল মাখাচ্ছিস, জল দিচ্ছিস। আমাকে কিছু করতে দিস্ না। মুক্তির কিছু বলার নেই।

কল্যাণী বললেন—কি? খেতে দিবি এখন?

মুক্তি বলল—ঘুমুচ্ছে।

—তবে?

—ঘুম থেকে উঠুক। আমি ততক্ষণে চান করেনি। মুক্তি বারান্দায় এল। বিজয়বাবু তখন ইজিচেয়ারে বসে এক মনে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। মুক্তি বাবার মুখ দেখে বুঝতে পারে, সেখানেও হতাশা জমে উঠেছে।

মুক্তি বলল—বাবা, ঐ বাঁশের সাঁকোটা কি তোমরা সারাবে না?

বিজয়বাবু মুখ ফেরালেন। বললেন—কেন মা!

মুক্তি বলল—হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে, তখন লোকও পাবে না, বাঁশ দড়ি-টড়ি এসব কিছু পাবে না। তাই বলছিলাম।

বিজয়বাবু বললেন—ঠিক বলেছিস্! দেখি, আজ সন্ধ্যা বেলা যাব, ওদিকে। হ্যাঁরে, সীতার কি কিছু 'ইমপ্রুভমেন্ট' দেখছিস নে?

মুক্তি বলল—এখনো কিছু দেখছিনে, বাবা। তবে এখনো তিনদিন হাতে আছে।

বিজয়বাবু বললেন—তোর মা, আমাকে বাড়িতে টিকতে দিচ্ছে না। কেবল বলছে, মেয়েটাকে আমি-ই নাকি মেরে ফেলছি। ও কি বলতে চায়, আমি বুঝতে পারছি না।

মুক্তি বুঝতে পারল, মা-র গঞ্জনা বাবাকে বড় দুঃখ দিচ্ছে। আসলে, এ ঘটনার ওপর কারুর হাত নেই।

বিজয়বাবু বললেন—হরেনবাবু খবর পাঠিয়েছেন আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন।

মুক্তি বলল—হরেন জ্যাঠা ? কেন ?

—কি জানি। বিষয়ী লোক, কোন কিছু গন্ধ পেয়েছেন বোধহয়। আমি মা, কি করব বুঝতে পারছিনে। এই জমি-জমা, ঘরবাড়ি, সব তোদেরি! তোরা বড় হয়েছিস মা, লেখাপড়া শিখেছিস্। তোরাই এ সবের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে ছুটি দে। জমিটমি যদি বিক্রি করতে হয়, তবে তুই সব কিছু কর। বিভাস যেন বলল, সীতার জন্য কত টাকা লাগবে ?

মুক্তি বলল—টাকার কথা কিছু বলেনি। একটা দরখাস্ত লিখতে বলেছিল তোমাকে ?

বিজয়বাবু বললেন—এই বুড়ো বয়সে আর নিজেকে ছোট করতে চাইনে।

মুক্তি বলল—বাবা, আমি এখনো দিদিকে 'ফরেন' নিয়ে যাবার বিপক্ষে। আমি বলব, যদি মারা যায়, আমার কোলেই মরুক, আমি ওকে চিতায় তুলে দিয়ে আসব। কিন্তু বিদেশে নিয়ে যেতে দেব না।

বিজয়বাবু বললেন—কেন মা ?

মুক্তি বলল—দিদি যদি বিদেশে গিয়ে মারা যায় তা হলে, দিদির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব কিছু যাবে। পা রাখার মাটিটুকুও থাকবে না। তোমাদের বুড়ো বয়সে কি থাকবে তাহ'লে। আমার কথা ছেড়ে দাও। তাহলে দেখ, দিদিও গেল, আমাদেরও সর্বস্ব গেল। এক্ষেত্রে আমার মতে, কোন একটা কিছুকে বাঁচাতে হবে।

বিজয়বাবু শুকনো মুখে বসে রইলেন। মুক্তি বাবার জন্য তেল আর গামছা এনে চৌকির ওপর রাখল। চান করে নাও, বাবা। রান্না হয়ে গেছে।

বিজয়বাবু অন্যমনস্কভাবে কথাটা উচ্চারণ করলেন—আর চান।

মুক্তি ঘরের ভেতর যাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন ডাকল। মুক্তি ফিরে দেখল —নেতাজী ক্লাবের ছেলেরা।

মুক্তি বলল—এই রোদে কোত্থেকে এলে ?

ক্লাবের সেক্রেটারী হেমন্ত বলল—তমলুক থেকে।

—কি খবর ?

না, তেমন কিছু নয়, সীতাদি কেমন আছে ?

মুক্তি বলল—সেই রকম।

সতীশ বলল—তোমরা নাকি জমি-জায়গা বিক্রি করে চলে যাচ্ছ?

—কে বলল?

সমরদাদের নায়েবের সঙ্গে তমলুকে দেখা হয়েছিল।

মুক্তি চুপ করে রইল। তারপর বাবার দিকে চেয়ে বলল—কই চান করতে উঠলে?

বিজয়বাবু বললেন—কে বলল সতীশ?

—নায়েবমশায়।

মুক্তি বলল—আমরা জমি-জমা বিক্রি করব না করব, তা এর মধ্যে শহর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল কি করে?

বিজয়বাবু বললেন—বিভাস বলেছে হয়ত। বলুক মা, দুঃসময়ে মানুষ ওরকম বলে।

হেমন্ত বলল—রবীন্দ্র জয়ন্তীতে থাকবে তুমি?

মুক্তি বলল—ছুটিতো আছে, তবে থাকবো কিনা জানি না।

—তোমাকে চীফ গেষ্ট হতে হবে।

সতীশ বলে—আমাদের চীফ গেষ্টকে অবশ্য গানটান গাইতে হয়। সেটা বলে রাখছি।

মুক্তি বলল—তা হোক্। কিন্তু দিদির যা অবস্থা।

হেমন্ত বলল—আমরা কিন্তু চিঠি ছাপাতে দিচ্ছি। আর শোনো, মৃন্ময়দাকে বলেছি। ওকি বলল জান?

—কি বলল?

—বলল, রবীন্দ্রনাথ পড়ে কি হবে? তার আগে চাষ করতে শেখ। রবীন্দ্রনাথ চাষীদের কথা খুব ভাবতেন। কেবল কবিতা-টবিতা পড়ে কিছু হবে না।

মুক্তি হেসে বলল—মৃন্ময়দাকে বল তাহলে কৃষিবিদ্ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে। কখন গেছিলে তোমরা?

হেমন্ত বলল—কাল সকালে।

—কি করছিল তখন ?

—এক থালা মুড়ি আর গুড় খাচ্ছিল। সঙ্গে একটা ইংরেজী বই। 'ইনট্রোডাকশান টু দ্য স্টাডি অব লিটারেচার।'

সতীশ হেসে বলল—ডি. এস. সি. সাহেবের ব্রেকফাস্ট। আমাদের বলল, খাবে নাকি তোমরা ? তারপর পিসিকে ডাকল।

হেমন্ত বলল—পিসি কি বলল জান ?

মুক্তি বলল—কি ?

—সে আর বলতে নেই। 'মুখপোড়ামনে সকালন্থ কাই থাইলু ?'

মুক্তি হেসে বলল—তারপর ?

হেমন্ত বলল—শেষ পর্যন্ত বুড়ী আনল একথালা মুড়ি আর গুড়। মৃন্ময়দা বলল—চা হবে না কিন্তু। পিসি এক্ষুণি বলবে, চিনি নেই। তার চেয়ে মুড়ি খেয়ে কেটে পড়। সত্যি মুক্তিদি, মৃন্ময়দা আশ্চর্য মানুষ!

মুক্তির সামনে এদের বলে-যাওয়া ছবিটা ভেসে উঠছিল। দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসে মৃন্ময়দা বিশ্বসাহিত্যের কোন ক্ল্যাসিক লেখা পড়ছে বা এগ্রি-কালচার্যাল কোন রিসার্চের প্রবন্ধ পড়ছে। সামনে একথালা মুড়ি, গুড়। শেষকালে হয়ত পিসির হাতে এক কাপ চা। কাপের ডাঁটিটা ভাঙা। মৃন্ময়দা এক চিরন্তন দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতীক—তার মূল কথা আর্থিক দারিদ্র্য থাক্, কিন্তু আত্মিক দারিদ্র্য নয়, কিছুতেই নয়!

মুক্তি বলল—তোমরা মৃন্ময়দাকে চীফ গেস্ট কর না কেন ?

হেমন্ত বলল—বলেছিলাম। রাজি নয়। বলে, ওসব মালাটালা পরা আমার পোশাবে না।

মুক্তি হাসল।

সতীশ বলল—সমরদার কাছেও গেছিলাম।

—কি বলল ?

—বলল, রবীন্দ্রনাথ কেন মার্কসিস্ট হলেন না বলতে পার ?

মুক্তি বলল—তোমরা কি বললে ?

—বললাম, না হওয়ার জন্য বেঁচে গেছি।

—বলতে?

—বলল, তোমাদের কিছু হবে না। এসো এখন। আমি ব্যস্ত আছি।

মুক্তি বলল—আমিও ভাই ব্যস্ত আছি। মনটন ভাল নয়। দিদিকে নিয়ে কি যে করি। তা যদি থাকি, দিদি যদি ভাল থাকে তবে নিশ্চয় যাব।

—বাবা, চান কর। বেলা একটা বাজে যে।

বিজয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—এই যাচ্ছি, মা।

মুক্তি বারান্দায় বসেছিল।

সন্ধ্যের সময় হরেনবাবু এলেন। মুক্তি বসতে বলে, একটু পরে চা নিয়ে এল।

হরেনবাবু তাকালেন।

মুক্তি দেখল, এ তাকানোটা যেন ব্যবসায়িক। পিতার চোখ নয় এটা।

হরেনবাবু বললেন—তোমার এ মেয়েটি বড় 'প্রমিসিং'। কি মা, কেমন পড়াশোনা হচ্ছে।

মুক্তি বলল—চলছে।

—হ্যাঁ, তোমরা বড় হলে আমাদের গ্রামের গৌরব বাড়বে। কিন্তু তাই বা বলি কি করে? ঐ যে মৃন্ময়, ডি. এস. সি. সারা জেলায় এমন ছেলে নেই। কিন্তু কাল শুনলাম, ও নাকি মোড়ের মাথায় ঐ দোকানগুলোর সামনে বেঞ্চে বসে চা আর বেগুনী খাচ্ছিল। গ্রামের লোকগুলোর সঙ্গে জাঁকিয়ে গল্পগুজব করছিল। ছিঃ ছিঃ,—ডিগনিটি, এ্যারিস্টোক্র্যাসির ধার ধারে না ছেলেটা। বুঝলে বিজয় গ্র্যাভিটি যদি না থাকে, তবে ঐ ডি. এস. সি. ফি. এস. সি.-তে কি হবে। ঐ তো আমার ছেলে সমর। লাখের মধ্যে তুমি এমন একটা ছেলে দেখাতে পারবে না, বিজয়। তোমার এখানে আসেটাসে। তাকে কখখনো ছোটলোকদের সঙ্গে ঐ রকম মেলামেশা করতে দেখবে না।

বিজয়বাবু চুপ করে রইলেন।

হরেনবাবু বললেন—সমরকে তাই বলছিলাম কাল। তোমার 'বস' সেন

সাহেবের চিঠি পেলাম। উনিও ছুটি নিয়ে ওঁর ফার্নরোডের বাড়িতে এসেছেন। তোমাকে কয়েকদিন ওখানে কাটিয়ে যেতে বলেছেন। তা, যাও। আজকাল তো আর রাজকন্যার দিন নেই। এখন তার বদলে এসেছে বস-এর কনভেন্টে পড়া মেয়ে। কি বল বিজয়? সমরকে বললাম, এখানে বসে এর বাড়ি তার বাড়ি ঘুরে সময় নষ্ট না করে কলকাতা চলে যাও। সেখান থেকে দুর্গাপুর।

মুক্তি একবার তাকালো হরেনবাবুর দিকে। তার কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। মানে, যাতে উনি মৃন্ময়দার প্রসঙ্গ আর না তোলেন। বলল—মৃন্ময়দা মানুষকে মানুষ ভাবে। বড়লোক গরীবলোক ছোটলোক এসব ভাবে না।

হরেনবাবু বললেন—তা বললে তো হবে না, মা। ছোটলোক, সব সময় ছোটলোক।

শব্দটা মুক্তির গায়ে চাবুক মারল যেন। মুক্তি তবু চুপ করে রইল।

হরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—তা বিজয়, তোমার কাছে আমার একটা বিশেষ কাজ আছে। একটা ব্যাপারে তোমার হেলপ চাই বিজয়। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

॥ ১৫ ॥

মুক্তি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল, দুপুরের বিস্তীর্ণ পোড়া মাঠে বেলা পড়ে এসেছে। তবু রোদের উত্তাপ এখনও খুব একটা কমেনি। জীর্ণ ভাঙা সাঁকোটা একটা মৃত দেহের মত নদীর ওপরে শুয়ে আছে। তার ওপারে যে মাঠের সঙ্গে তাদের গ্রামের জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, যে মাঠ সারা গ্রামের মানুষের অন্ন জোগায়, গরু বাছুরের ঘাস জোগায়, বর্ষাকালে যে মাঠ মাছের চাহিদা মেটায়, আজ বিকেলের সেই মাঠকে মুক্তির অচেনা লাগছে। তার মনে হয়, এ মাঠ উপেক্ষিত আদিগন্ত পোড়ো জমিমাত্র। বৃষ্টি! বৃষ্টি না হলে এই মাঠ হয়ত এমনি প্রাণহীন, এমনি মরুভূমির মত ধূ ধূ করবে।

কবে বৃষ্টি হবে, আকাশের আশীর্বাদ কবে ঝরে পড়বে।' বৃষ্টি মানেই আবাদ ফসল।

মুক্তির মনে হয়, জীবনের মাটিতেও এমনি বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এ বৃষ্টি আসে অধ্যাত্ম আকাশ থেকে। নতুবা এ মাটিও সরস হয় না। এ মাটিতেও শস্য ফলে না, যে শস্য হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মনের অন্ন জুগিয়ে এসেছে। আজ একি দুর্ভিক্ষ মাটিতে, দুর্ভিক্ষ জীবনে, দুর্ভিক্ষ বিশ্বময় —কী দুঃসহ, কী দগ্ধ দিন এখন চলছে!

মুক্তি বারান্দা থেকে ঘরে এল। দিদির অবস্থা একটুও ভালর দিকে নয়। আজ পাঁচদিন। আর দু'দিন সময় মাত্র।

সীতা তেমনি শুয়ে আছে—যেন প্রাণের চিহ্ন নেই। শুধু তাই নয়— অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে! বেশ, তারই পরাজয় ঘটল তবে। এবার তা হলে বিভাসবাবু এলে, দিদিকে ফরেন-এ নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্তের কথা বলতে হবে। না সে যাবে না দিদির সঙ্গে। মা-ই যাক্। সে বাবার কাছেই থাকবে। জমি জমা বিক্রি হয়ে গেলে এই গ্রামের এই নদীতীরের, এই মাঠের আলোয়, যে জীবন তার শুরু হয়েছিল, তা এবার শেষ হবে।

—ছোড়দি!

গোবিন্দর গলা পেয়ে মুক্তি সদর বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

গোবিন্দ বলল—এই লোক কি চিঠি লিয়া আসসে তুমার।

মুক্তি চিঠিটা নিয়ে একটু সময় চুপ করে রইল। এই মুহূর্তে একটা আশ্চর্য বিপদ তাকে ঘিরে ধরছে। হ্যাঁ, এখানকার খেলা শেষ। সমরদাও চলে যাচ্ছে। মুক্তি লোকটিকে বলল—দাঁড়াও একটু।

তারপর ঘরে গিয়ে সমরদাকে লিখল—'দেখা করা অসম্ভব কেন, আমি জানি না। সন্ধ্যায় এসো।—মুক্তি'। চিঠিটা খামে এঁটে দিয়ে মুক্তি লোকটির হাতে দিল।

একটু পরে কল্যাণী এসে দাঁড়ালেন। বললেন—কে এসেছিল রে?

মুক্তি বলল—সমরদা লোক পাঠিয়েছিল।

—কেন?

—ও কাল কলকাতা চলে যাচ্ছে।

—কাল ? কেন পরশু গেলে পারত আমাদের যাবার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা কাল ঠিক হবে তো। আমরাও একটু সাহস পেতাম।

মুক্তি বলল।—পরশুই তোমরা কলকাতা যাচ্ছ নাকি ?

কল্যাণী আকাশ থেকে পড়লেন! আচ্ছা, তোর কি হয়েছে বল দিকিন।

কাল বিভাস ঠাকুরপো আসবে না ? এলে ঠিক হবে কবে যাব। তোদের মাথায় কি ঢুকল কবরেজী করাবি। হল কিছু ? মিছিমিছি ছ'টা দিন নষ্ট করলি।

মুক্তি যদিও জানে, কোন আশা নেই, তবু বলল—আজ, কাল আরো ছুদিন সময় আছে মা।

—এই ছুদিনে একেবারে হাতি-ঘোড়া হয়ে যাবে।

—তা, টাকার কি করলে ?

কল্যাণী বললেন—কাল থেকে তো তোর বাবা টাকার চেষ্টা করছে।

জমি-জমা সব বিক্রি করে দিচ্ছে তাহ'লে।

—বন্ধক দিচ্ছে না বিক্রি করছে আমি জানিনা। কাল রাত দেড়টায় তো ফিরল।

মুক্তি বলল—এখনো তো মা অনেক কাজ বাকি। পাশপোর্ট ভিসা লাগবে, গরম জামা কাপড় লাগবে। বাইরে যাওয়া বললেই যাওয়া নাকি ? তার ওপর পেসেণ্ট নিয়ে যাওয়া!

কল্যাণী বললেন—বিভাস ঠাকুরপো সব করে দেবে।

—তোমার ঐ ঠাকুরপোর সব কথায় আমি বিশ্বাস করিনে মা! ওর ওপর অতো নির্ভর করো না।

কল্যাণী ধমকে উঠলেন—সবটাতেই তোর সন্দেহ। সব সময়ই লোককে ঠেস দিয়ে দিয়ে কথা বলা। কেন ? সেদিন ঠাকুরপোকে অতসব কড়া কড়া কথা বলার কি দরকার ছিল তোর।

মুক্তি বলল—না, মা সেদিন আমার মনটা ভাল ছিল না ; তাই বিভাস-বাবুকে ওসব বলেছি। তা দেখবে, কাল আমি কিছু বলব না। আমি লক্ষ্মী

মেয়ে হয়ে থাকব। যা বলবে তাই করব।

—তাই থাকিস্, মা। তা, সমর কখন আসবে?

মুক্তি বলল—আসবে কি না, জানি না।

—তুই আসতে বলিস্ নি?

—বলেছি।

—সমর চলে যাচ্ছে কেন?

—আমি কি করে জানব?

—নিশ্চয়ই তুই ওর সঙ্গেও ঝগড়া করেছিস্। সকলের সঙ্গে তোর ঝগড়া করা চাই কেন?

মুক্তি বলল—ঝগড়া হয় ঠিকই, মা। তবে সকলের সঙ্গে নয়। সকলকে খুশি করার জন্য আমি বসে নেই, বসে থাকতেও পারব না। এটা আমার সোজা কথা! তা সে তোমার সমর হোক, বিভাস ঠাকুরপো হোক। তা, বাবা কখন ফিরবে?

—কি জানি।

—খেতেও তো আসেনি। কি যে করছে না। শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখেছ একবার?

কল্যাণী বলল—জমি বিক্রির চেষ্টায় গেছে বোধহয়।

মুক্তি বলল—তুমি যে বললে এখন বন্ধক দেবে? বন্ধক দিলে তবু এক সময় জমিগুলো উদ্ধার করার চান্স থাকে। বিক্রি করলে তো চলেই গেল! আর কখনো আসবে না। মা, জমি বিক্রিটা না করলে চলে না?

কল্যাণী বললেন—বন্ধক দিলে কি এতো টাকা আসবে?

—না, তা আসবে না।

মুক্তি বলল—কিন্তু ঠিক কত টাকা লাগতে পারে বিভাসবাবুর সঙ্গে কথা বলে এগোনো দরকার, মা। না হয়, গহনা টহনা বিক্রি করে যদি কিছু আসত।

—ওতে আর কত হবে?

আমার হার, চুড়িটুড়ি সব দিয়ে দেব মা! জমিগুলো কোনভাবে রাখো

মা। দোহাই তোমাকে। জমিবিক্রি করা উচিত হবে না। জমি তো তোমাদের শেষ ভরসা, জমি গেলে গ্রামের সঙ্গেও সম্পর্ক ঘুচে যাবে, মা!

কল্যাণী বললেন—আমারো কি ইচ্ছে নয় মা?

মুক্তি রান্না ঘরে এসে দেখল গোবিন্দদা চা করছে। তিন কাপ। মুক্তি বলল—তিন কাপ কেন গোবিন্দদা?

গোবিন্দা বলল—কেনি, বড়দি, তুমি, মা!

মুক্তি চমকে উঠল। দিদির জন্য চা করতে গোবিন্দদা অভ্যস্ত। আজ তাই তিন কাপ চা করেছে। সে অবশ্য নিজে চা খায় না।

মুক্তি ভাবল, মাকে না জানিয়ে, দিদির চা-টা ওর ঘরে নিয়ে যাবে, দেখবে খেতে চায় কিনা। এ ক'দিন তো যায়নি, তাই দেওয়াও হয়নি। বলল—গোবিন্দদা, মা-র চা-টা দিয়ে এসো।

মুক্তি হু'কাপ চা টুলের ওপর রেখে দিদির বিছানার এক ধারে বসল। হঠাৎ লক্ষ্য করল, দিদির ঠোঁট হুটো যেন নড়ে উঠল একটু! যেন কথা বলার ক্ষীণ একটা চেষ্টা!

একি! সে সত্যি দেখছে তো? না চোখের ভুল। হু চামচ চা পর পর দিদির মুখে আস্তে আস্তে দিল! খেল দিদি। মুক্তি খুশি হ'ল, ভীষণ খুশি হ'ল! তারপর মাথা নাড়ল। আর দিল না মুক্তি। নিজের কাপটা হাতে নিয়ে মুক্তি চুপ করে বসে রইল। কি সব ভাবতে লাগল সে! দিদি কি ভাল হবে! দিদি ভাল হলে জমি-জমা ঘরবাড়ি সব যেমন আছে, তেমনি থাকবে। আঃ, তাই, যেন হয়।

এই দরিদ্র টালির ঘরটাকে বড় ভালবাসে মুক্তি। এ ভালবাসা শব্দহীন, কিন্তু গভীর। এখানেই সে, তার দিদি ছোটবেলা আছাড় খেতে খেতে হাঁটতে শিখেছে। নদী পারে খেলেছে। এখানে তারা হু'বোন বড় হয়েছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে একদিন। এ বাড়ির প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে তাদের যে অন্তরের যোগ। দিদির হাতে তৈরি ঐ ছোট্ট বাগানটা। দিদি নিজেই ঘাস আর আগাছা বাছে, নিজেই জল দেয়। সব বর্ষার দিনের ফুল। দিদি যেন বর্ষার পূজার পুষ্প, পূজার মন্ত্র!

মুক্তি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, গ্রীষ্মের রোদে পড়া বিবর্ণ বাগানটার দিকে চেয়ে চেয়ে কি সব ভাবছিল। দিদি ভাল থাকলে, বাগানটার আজ এ দুর্দশা কিছুতেই হত না। দিদিই, এই মাটির প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত আত্মীয় প্রকৃত আত্মা!

এই মাটির সঙ্গেই দিদির আশৈশব মিলন, যে মিলন বিবাহের মত পবিত্র, বিবাহের মত মধুর, বিবাহের মত ফলবান!

বিজয়বাবু রোদে-পোড়া ক্লান্ত শরীরটা কোন ভাবে টানতে টানতে বারান্দায় এসে ইজি চেয়ারটায় বসে পড়লেন। এক রাশ হতাশা নিয়ে বললেন—হ'ল না, মা, পারলাম না। ওরা রাজি হ'ল না। হবে না জানতাম!

মুক্তি তাড়াতাড়ি একটা পাখা এনে হাওয়া করতে করতে বলল—কি হ'ল না বাবা!

॥ ১৬ ॥

এখন বেলা একেবারে নিভে গেছে। বারান্দা থেকেই গোটা পশ্চিম আকাশটা চোখে পড়ে। রোদে-পোড়া তামাটে আকাশও এখন লাল, মাঝে মাঝে কালো রঙের ছোপ, যেন টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে আছে। মুক্তি সেই টুকরো মেঘের সুন্দর ছবিটার দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

নদীর ওপারে ভাঙা সাঁকোর কাছ থেকে শুরু হওয়া সেই বিস্তীর্ণ ধূ ধূ করা মাঠটায় এখন কালো ছায়া এসে পড়েছে।

মুক্তির মনে হয়, এ ছায়াটা মৃত্যুর মত বিষাদ ঘন। দিদির যেমন আরোগ্যের কোন স্পষ্ট লক্ষণ নেই। একটা নিষ্ঠুর হতাশা মুক্তিকে এই সন্ধ্যাবেলায় ঘিরে ফেলে। না, কোন আশা নেই। দিদি আর বাঁচবে না!

বিজয়বাবু ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় এসে বসলেন। একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, ঠিক ঘুম নয়। মুক্তি রান্নাঘরে গিয়ে বাবার জন্য

চা নিয়ে এল।

বিজয়বাবু বললেন—সীতা কেমন আছে রে?

মুক্তি বলল—বুঝছি না, বাবা।

—কোন 'ইমপ্রুভমেণ্ট' দেখছিস্?

—না।

বিজয়বাবু হতাশ হয়ে বললেন—কি করি তাহলে! সব দিকেই বিপদ হরেনবাবুরটাও হ'লনা।

মুক্তি অবাক হয়ে বলল—হরেন জ্যাঠার কি হল না বাবা?

বিজয়বাবু বললেন—হরেনবাবুর জন্য ওয়ার্কার্স কনফারেন্সে বলেছিলাম। তা—

মুক্তির মনে হল, হরেনবাবুর জন্য বাবা ওয়ার্কার্স কনফারেন্সে কি বলতে পারে? সেদিন হরেন জ্যাঠা বাবাকে বলেছিলেন, "তোমার কাছে 'হেল্প' চাই"। কি 'হেল্প' তিনি চাইতে পারেন? মুক্তি কিছু বুঝতে পারল না।

মুক্তি বলল—সেদিন হরেন জ্যাঠা এসেছিলেন কেন, বাবা?

বিজয়বাবু বললেন সে এক কাণ্ড। ছাখো, ঐসব বিষয়ী লোক বড় ভয়ংকর।

মুক্তির কাছে সব কিছু দুর্বোধ্য।

বলল—কি কাণ্ড বলছ?

—আরে উনি ইলেকসানে দাঁড়াতে চান।

মুক্তি বলল—তোমাদের পার্টির নমিনেশান? পার্টি কেন ওঁকে নমিনেশান দেবে? পার্টির নিজের ক্যাণ্ডিডেট আছে। বিভাসবাবু তো রয়েছেন। আগে তো উনি এম. এল. এ. ছিলেন।

বিজয়বাবু বললেন—বিভাসকে কর্মীরা এখন আর চাচ্ছে না।

মুক্তি বলল—ও, বিভাসবাবু, তাই সেদিন এসেছিল। এতো রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। তা তুমি হরেন জ্যাঠার জন্য কনফারেন্সে বললে? কর্মীরা কি বলল?

—কি আর বলবে, সবাই ছি ছি করে উঠল।

—তুমি বলতে গেলে কেন, বাবা? না বললেই ভাল হ'ত।

—বললাম, ব্যাপারটা কি জানো? উনি বাড়ি বয়ে এসে 'রিকোয়েস্ট্' করলেন! সমর ছেলেটা বাড়িতে আসে যায়—তোরও বন্ধু। আর আমি তো 'নমিনেশান' পাইয়ে দিচ্ছি না। আমি শুধু বলছি, এরকম একজন 'নমিনেশান' চায়! এই পর্যন্ত!

মুক্তি বলল—সেটাও তোমার উচিত হয়নি, বাবা! তোমার মত কোন একজনের কাছ থেকে প্রস্তাবটা গেলে, তার একটা অন্য অর্থ দাঁড়ায়। কর্মীরা ভাবতে পারেন, তুমি সাপোর্ট করছ। নয় কি?

বিজয়বাবু মুক্তির দিকে তাকালেন। বললেন—তুই তো ঠিক কথা বলেছিস মুক্তি। আমি এটা ভাবিনি। একজন ইয়ং ছেলে কি বলেছে জানিস? কথাটা শুনে আমি লজ্জায় মরে গেলাম! আমার মাথা নুয়ে এল।

মুক্তি একটা কিছু আশংকা করছিল। তার বাবাকে সে চেনে। নিজের স্বার্থের দিকে তাকাবার লোক নয়। নইলে স্বাধীনতার পরে কত লোকের কত কিছু হল। অথচ তার যেই কে সেই। বলল—কি বলেছে?

—বলল বিজয়দা শেষ পর্যন্ত বেয়াইর জন্য 'প্লীড' করছেন।

মুক্তির হাতের চায়ের কাপটা কেঁপে চা-টা একটু ছল্‌কে পড়ল।

বিজয়বাবু ভয়ে ভয়ে বললেন—আমি মা, সত্যি অতসব ভাবিনি। তাই শেষ পর্যন্ত না খেয়ে দেয়ে, আট মাইল রাস্তা রোদে হেঁটে হেঁটে বাড়ি চলে এলাম। বুঝলি মা, আজকালকার ছেলেরা কোন সম্মান টম্মান রেখে কথা বলে না।

মুক্তি বলল—পলিটিকস ছেড়ে দিতে দিদি আর আমি তোমাকে হাজার বার বলেছি। শুনেছ সে কথা?

—বিজয় ফিরেছ নাকি হে! বিজয়? একটা সাইকেল রিক্সার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, বাবার নাম ধরে কে ডাকছে শুনতে পেয়ে, মুক্তি উঠোনে নেমে এল।

হরেনবাবু এলেন।

তেমনি আদ্দির পাঞ্জাবী পরা, কালোপেড়ে কোঁচানো কাঁচি ধুতি, পায়ে

কালোরঙের চকচকে পাম্পস্থ। হাতে বেতের সুন্দর ওয়াকিং স্টিক।

বিজয়বাবু ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন—আসুন, দাদা আসুন।

হরেনবাবু বললেন—আমাকে একটু যেতে হবে, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং। তা, তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলাম একটু।

বিজয়বাবু বললেন—আমিও একটু আগে ফিরেছি।

—বেশ। খেলে টেলে কোথায়?

—বাড়ি এসে!

হরেনবাবু হেসে বললেন—কি মুক্তি, একটু চা করতে বল তোর মাকে!

হরেনবাবু অন্তরঙ্গ হতে চাইলেন। কিন্তু মুক্তি বুঝতে পারল আসলে তাকে আলোচনার কাছ থেকে সরিয়ে দিতেই চান হরেন জ্যাঠা।

—বলছি। আপনি বসুন।

মুক্তি চলে এল।

কল্যাণী নিজে থেকেই চা করছিলেন। মুক্তি দিদির ঘরে এসে বসল।

কিন্তু সেখানেও হরেন জাঠার জমিদারী গলা ভেসে আসছিল। বলছিলেন —কনফারেন্সে তুমি প্রস্তাবটা ঠিকভাবে তোলনি বিজয়!

বিজয়বাবু বললেন—কেন হরেনদা?

—না, মানে বলছিলাম, তুমি 'জাস্ট ক্যাজুয়ালি কথাটা তুলেছ। আমি চেয়েছিলাম, তুমি ওদের 'কনভিন্স' করাবে। যেমন ধর—আমাকে নমিনেশান দিলে, আমার জন্য তোমার পার্টিকে তো একটা পয়সাও খরচ করতে হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আমি পার্টিকে আরও দশ হাজার টাকা দিতাম।

বিজয়বাবু বললেন—আমি তাও বলেছি।

হরেনবাবু ভারিক্কিচালে বললেন—আমার লোক ছিল। কি বলেছ না বলেছ, সব রিপোর্ট আমি পেয়েছি।

বিজয়বাবু বললেন—যখন সবই শুনেছেন, তখন আমাকে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—করছি, 'ভেরিফাই' করে নেব বলে। 'দিস ইজ পলিটিকস্, বিজয়'। একেই বলে রাজনীতি।

হরেনবাবু হাসতে লাগলেন।

বিজয়বাবু তীক্ষ্ণ গলায় বললেন—তা হলে জেনে রাখুন হরেনদা, আমি এ প্রস্তাব নিজেই সমর্থন করি না।

হরেনবাবুর গলাটা বড্ড কঠিন শোনাল—কেন?

—প্রস্তাবটা 'ইমমরাল'।

—হোয়াট! 'ইমমরাল'? তুমি কি বলতে চাও, বিজয়?

—বলতে চাই, সারাজীবন পার্টির শত্রুতা করে এসে আজ নিজের স্বার্থে দলে ভিড়তে চাওয়াটা, আপনার উচিত হয়নি।

হরেনবাবুর গলা ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছিল। বললেন—স্বার্থ। কি স্বার্থ দেখলে তুমি হে!

বিজয়বাবু শান্ত গলায় বললেন—সীলিং-এর বাইরে প্রায় চারশ বিঘে জমি রেখেছেন বেনামীতে। গোটা দশেক হাস্কিং মেসিন চালাচ্ছেন, তাব বেশিরভাগই লাইসেন্স নেই। 'বাসরুট' পাওয়ার চেষ্টা করছেন, সিনেমা হল করতে চাচ্ছেন, তাতে সুবিধে হবে? জমিদারীর কমপেনসেশান পেতে অসুবিধে হচ্ছে। তারও সুবিধে পাবেন। সোশ্যাল প্রেস্টিজ অনেক বাড়বে। নমিনেশান পাওয়া, এম. এল. এ হওয়া, আপনার আর একটা 'ইনভেস্টমেণ্ট'।

হরেনবাবু হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকে ঠুকে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—বিজয়, তুমি যে আমাকে এতো ছোট ভাব, তা আমি জানতাম না। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। জানলে, আমি কখ্খনো তোমাকে অনুরোধ করতে আসতাম না। হরেন্দ্র নারায়ণ সামন্ত এখনো এতোটা নিচে নামেনি যে তোমার মত একজনের কাছে বাড়ি বয়ে অনুরোধ করতে আসবে। আমার গায়ে জমিদারের রক্ত—বুঝলে বিজয়!

বিজয়বাবু বললেন—হরেনদা, আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন।

মুক্তি সব শুনছিল। সে তার বাবাকে জানে, এই অতিসাধারণ মানুষটি একজন এম. এল. এ 'মেকার', এঁর সমর্থন ছাড়া এক্স এম. এল. এ বিভাস হাজরাও কোনকালে জিততে পারত না। এ বাড়িতে মন্ত্রীরা এসে ওঠেন, হরেন জ্যাঠামশায়ের এতবড় পাকা দালান আর পৃথক গেস্টহাউস থাকা

সত্ত্বেও। এটা ওঁর কাছে চিরকালই অসহ্য লাগে!

হরেনবাবু তখনও উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলেছেন—তুমি নিজে যদি 'ইমমরাল' মনে করতে তবে প্রস্তাবটা তুলে আমাকে সকলের সামনে অসম্মান করলে কেন? ছোট করলে কেন? আমার মাথা হেঁট করলে কেন? না তোলাই ভাল ছিল তোমার! তুমি যদি এতই 'মর‍্যালিস্ট'! এতই নীতিবাগিশ?

বিজয়বাবু বললেন—আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, সবাইকে প্রস্তাবটার কথা বলব।

—কেন বলবে? যা তুমি অন্যায় মনে করছ? এটা তোমাদের কি রকম আচরণ? মুখে এক, মনে আরেক! তোমরা সব তাহলে লম্পট, চালবাজ? বল? উত্তর দাও?

বিজয়বাবু বললেন—এর মধ্যে লাম্পট্যও নেই, চালবাজিও নেই।

হরেনবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন—কি রকম?

বিজয়বাবু শান্ত গলায় বললেন—আমাদের পার্টি একটা ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশান। তাই আমার মতামত, কারুর ওপর আমি না চাপিয়ে, প্রস্তাবটা দিলাম মাত্র—ওরা যদি চায়, তো—হ'ক না। আপনি নমিনেশান পেলেন? বিভাস বাদ গেল এবার! গতবার যেমন বাদ গেছে!

হরেনবাবু তখনও রাগে কাঁপছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন—তুমি লম্পট। একথা আমি একশোবার বলব! লম্পট বলেই নিজের মেয়েকে আমার ছেলের সঙ্গে জুটিয়ে দিয়ে—

—জ্যাঠামশায়?

একটা শান্ত কিন্তু বড় কঠিন কণ্ঠস্বরে দুজনেই চমকে উঠলেন।

॥ ১৭ ॥

মুক্তি উত্তেজিত হলেও সংযম এবং মর্যাদা বোধ সে হারায়নি। গুরুজনের সামনে ঔদ্ধত্য দেখানোর মত কুশিক্ষা যেমন সে পায়নি, তেমনি অন্যায় ও অসম্মানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানানোর মত শিক্ষা এবং সাহসের অভাব তার ছিল না।

তাই হরেন জ্যাঠা যখন, তাকে কেন্দ্র করেই বাবার প্রতি অসম্মানজনক কথা বললেন তখন মুক্তি আর স্থির থাকতে পারল না। একটু সময় সে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে ভেবে নিল। ভেবে নিল, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে।

মুক্তি দিদির ঘর থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এসে হরেনবাবুর সামনে দাঁড়াল। তার গলার অসাধারণ সংযম অথচ দৃঢ়তায় হরেনবাবুও কেমন ঘাবড়ে গেলেন।

মুক্তি বলল—বাবাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন জ্যাঠামশায়? সমরদার সঙ্গে মিশে অন্যায়, অপরাধ, পাপ যদি কিছু হয়ে থাকে, সে আমার, সম্পূর্ণ আমার। বাবার নয়, বাবা কিছুই জানে না, বাবা এ পিকচারে নেই। তাঁকে আপনি কিছুতেই দোষ দিতে পারেন না!

তারপর একটু থেমে আবার বলল—আমার বাড়িতে বসে এই ভাবে বাবাকে অসম্মান করার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কোত্থেকে এতো বড় সাহস আসে আপনার। আমরা গরীব বলে যদি এ সাহস আপনি পেয়ে থাকেন, তবে জানবেন, অত্যন্ত ভুল করছেন আপনি!

মুক্তি সোজা দাঁড়িয়ে ছিল। তার জ্বলন্ত দু'চোখ হরেনবাবুর চোখের ওপর তখন নিবদ্ধ। এ চোখের সামনে হরেনবাবু কেমন নিস্তেজ হয়ে উঠছিলেন!

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

একটু পরে হরেনবাবু আমতা আমতা করে বললেন—ছাখো মা, কথাটা আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। তোমাকে আর সমরকে অনেক লোক নদীর ধারে এখানে ওখানে বেড়াতে দেখেছে। তা-ই বলছিলাম মা। আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ যখন প্রায় সেটেল্ড্ হ'তে চলেছে, মানে সমর রাজি হলেই হয়ে যায়, তখন এই দেখাটেখা, বেড়ানো কেমন লাগে, ঐ আর কি!

মুক্তি বুঝতে পারছিল, হরেন জ্যাঠা সমরের বিয়ে সেটেল্ড্ হওয়ার কথাটার ওপরই জোর দিচ্ছেন। যেন বিয়ের কথা না হলে মেলামেশা চলত! আর যেহেতু বিয়ের কথা পাকা হতে চলেছে, সেহেতু এটা অন্যায়।

মুক্তি বলল—কথাটা আজ উঠল কেন? আপনি আগেও তো বলতে পারতেন। আজ নমিনেশান না পেয়ে, হঠাৎ বাবাকে টেনে এনে আমাদের মেলামেশার কথা তুলছেন কেন? নমিনেশান পেলে নিশ্চয়ই এসব বলতেন না।

হরেনবাবু বোধহয়, মুক্তির কথায় কিছুটা বিব্রত হয়ে উঠছিলেন। মুক্তি বলল—তাহলে দেখুন, নিজের ইন্টারেস্টের কাছে ছেলের চরিত্রও বড় কথা নয়, ছেলের চরিত্রও জলাঞ্জলি দেওয়া চলে। তাহলে আসল নামটি কার মধ্যে?

হরেনবাবু এ কথার কোন জবাব দিলেন না কেবল মাথা নিচু করে হাতের ছড়িটা মাটিতে ধীরে ধীরে ঠুকতে লাগলেন।

বিজয়বাবু শুধু আহত কণ্ঠে বললেন মুক্তি, ভেতরে যা।

তারপর হরেনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আমার মেয়েদের আমি ভাল করেই চিনি, হরেনদা। মুক্তি নিশ্চয়ই সমরের সঙ্গে মেশে, নিঃসঙ্কোচে মেশে। কিন্তু আমি বলতে পারি, আমার মেয়ের কাছ থেকে আপনার ছেলের কোন অকল্যাণের ভয় নেই। ছেলেমেয়ের মেশাকে আমি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাওয়া বলে মনে করিনে। সমর মৃন্ময় আমার বাড়িতে ছেলের মত। আমার কখনও এসব কথা মনে হয়নি।

হরেনবাবু চুপ করে বসে রইলেন। হঠাৎ বাইরে সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শোনা গেল। সমর নামল সাইকেল থেকে। তারপর বাবাকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে বলল—তুমি!

হরেনবাবু বললেন—এই এসেছিলাম একটু।

কমরেড প্রবোধ পাণ্ডা এসেছেন অনেকক্ষণ। তোমার জন্যে বসে আছেন।

হরেনবাবু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বললেন—তাহলে আমি আজকে আসি, বিজয়।

হরেনবাবু চলে গেলেন।

মুক্তি তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হরেনবাবুকে নিয়ে চলে যাওয়া সাইকেল রিক্সার হর্নটা একটা কর্কশ শব্দ করতে করতে এক সময় রাস্তার মোড়ে গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেল। বিজয়বাবু তেমনি গম্ভীর হয়ে বসে-ছিলেন।

সমর সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবাক হয়ে বলল—কি ব্যাপার? বাবা এখানে কেন এসেছিল? আসে নাকি মাঝে মাঝে!

মুক্তি উত্তর দিল। বলল—কখনো আসেন না।

—তবে?

—এই বার দুই এলেন।

—কেন?

—সে তোমার জানার দরকার নেই। এসো, ভেতরে এসো।

—মুক্তির সারা মনে তখন একটা তিক্ত উত্তেজনা। বাইরে তার প্রকাশ নেই ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে যেন এক অগ্নিময় জতুগৃহের মধ্যে বন্দী একটা। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছিল।

বাইরের বারান্দা থেকে মুক্তি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এল। সে ভাবছিল, সমরদা আজ চলে যাচ্ছে এবং এ যাওয়াটা চিরদিনের জন্যই যাওয়া। অথচ একটু আগে হরেন জ্যাঠার কথাগুলো তার সমস্ত স্নায়ুকে বিপর্যস্ত করে গেল।

ঘরে এল মুক্তি। পেছনে পেছনে সমর চুপচাপ আসছিল।

মুক্তির গলা তখনো কাঁপছিল। বলল—বোসো, সমরদা।

ঘর থেকে চেয়ারটা বাইরের বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই সমর

ইতস্তত করছিল কোথায় বসবে।

মুক্তি বলল—বিছানায় বোসো। আগেও তো বসেছ।

সমর বলল—তা বসেছি।

—ছাখো, এক দিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার এমন কিছু হয়নি, যাতে বিছানায় বসতে তুমি 'হেজিটেট' করতে পার।

সমর বসল।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিল।

মুক্তি ধীরে ধীরে নিজের ওপর আস্থা, অধিকার ফিরে পাচ্ছে। সহজ হচ্ছে ক্রমশ।

সমর বলল—বাঃ তুমি দাঁড়িয়ে রইলে যে! বসো।

মুক্তি উদাসীনভাবে বলল—বসছি।

সমর আবার বলল—সীতা কেমন আছে?

—সেই রকম!

—একটুও ভাল না?

—বুঝতে পারছি না।

সমর বলল—দেখলে, সেইদিনই বলেছিলাম, কিচ্ছু হবে না।

মুক্তি বলল—সব দোষ যেন আমার। কিন্তু তুমিই বল তখন আর কি করার ছিল! অপেক্ষা করতেই হ'ত!

—কেন? তারপর দিন যদি কলকাতা নিয়ে যাওয়া যেত!

মুক্তি বলল—সমরদা, সব জিনিস তোমার 'এ্যাঙ্গেল' দিয়েই দেখ! আমাদের অবস্থা কিছু জান? কলকাতা যাওয়া বললেই যাওয়া হয় নাকি!

সমর বলল—চল, সীতাকে দেখে আসি।

দুজনে সীতার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। একটা হ্যারিকেন টিম্‌টিম্ করে শুধু জ্বলছে। বারান্দাটা এখন অন্ধকার। শীর্ণ নদীটা এখন করুণ স্মৃতির মত ক্রমশ কাছ থেকে দূরে আরও দূরে চলে গেছে। বাঁশের সাঁকোটা তেমনি জীর্ণ, ভাঙা, পারাপার হওয়া যাবে না। তার ওপারে সেই পিপাসার্ত মাঠ, যে মাঠ দুপুরে একটা বিরাট, মরুভূমির মত শুধু ধূ ধূ করে, যার মাটি এখন

রুক্ষ, রসহীন, স্নেহ-হীন!

সমর এক সময় বলল—ভেরি স্যাড! তোমরা দেখছ না, এযে 'ডেড্ আর নাম্বারিং'। সীতা আর আমি সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম। ওর মত 'ডিগনিফায়েড', শান্ত, সুন্দর, আর একটি মেয়েও ছিল না। আচ্ছা তোমার মনে পড়ে, বাংলার লেকচারার পরমেশবাবু ওকে ভালবেসেছিলেন।

মুক্তি শুধু বল—জানি।

কিন্তু সীতা এমন 'সাইলেণ্ট' ছিল কেন?

—সাধারণ অগভীর ভালবাসায় ভয় ছিল বোধহয়।

—সাধারণ ভালবাসা? সে আবার কি?

—যে ভালবাসা শুধু নিজের সুখ দেখে, সুবিধে দেখে! স্যাক্রিফাইস করতে শেখেনি। আর যে ভালবাসা শরীরের ওপরে উঠতে শেখেনি।

সমর সেই অন্ধকারে পরাজিত নায়কের মত তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

মুক্তিও কোন কথা বলছিল না। একটু পরে দিদির মাথায় হাত দিয়ে দেখল। না, জ্বর কম এখন। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও কমে আসছে।

সমর বলল—বিভাসবাবু কবে আসবেন যেন?

মুক্তি বলল—কাল বোধহয়।

—তাহলে কলকাতা যাচ্ছ কবে?

—উনি এলে ঠিক হবে। তা তুমি তো কাল চলে যাচ্ছ?

সমর বলল—হ্যাঁ যাচ্ছি। থাকতে তো আর কেউ বলছে না!

হঠাৎ বাইরে থেকে মৃন্ময়ের গলা শোনা গেল।

—মুক্তি কোথায় তুমি?

মুক্তি ঘর থেকেই খুশি হয়ে সাড়া দিল—মৃন্ময়দা এসো, এখানে।

—বাঃ ঘরটা অন্ধকার মনে হচ্ছে যে!

মুক্তি বলল—হ্যারিকেনটায় তেল ফুরিয়ে গেছে। তাই নিভে আসছে। তা হোক না, অন্ধকার ঘরেই এসো।

॥ ১৮ ॥

দূর থেকে মৃন্ময়ের পায়ের শব্দ মুক্তি শুনছিল। শব্দটা বলিষ্ঠ বিশ্বাসের মত। সমর শুধু আস্তে আস্তে বলল—অন্ধকার ঘরে আমাকে কখনো ডাকোনি মুক্তি। মৃন্ময়ের সঙ্গে যে তোমার এতো ঘনিষ্ঠতা তাও আমি জানতাম না।

মুক্তি বলল—ওর ভেতরে আলো আছে সমরদা। ও নিজেই সব অন্ধকার দূর করে দেয়। তাই ওকে অন্ধকারেও ডাকতে ভয় পাইনে। বরং ভাল লাগে।

কথাটা শেষ করে মুক্তি নিঃশব্দে হাসল।

সমর ক্ষুণ্ণ গলায় বলল—আলো তো আছে, বুঝলাম। উত্তাপ আছে তো?

মুক্তি বলল—আছে কিনা জানিনে। তবে থাকলেও ভয় পাইনে।

আসলে উত্তাপের প্রশ্ন নেই। মৃন্ময়ের ভালবাসা সেই জাতের, যা আলো দেয় অথচ কোন কিছু দগ্ধ করার মত উত্তাপ দেয় না। মুক্তি তার জীবন থেকে শিখেছে, সে জাতের ভালবাসা বড় দুর্লভ!

সমর এ কথার কোন অর্থ বুঝতে না পেরে বাইরে চলে যাচ্ছিল। মৃন্ময়ই বাধা দিল। যাচ্ছ কোথায়?

সমর গম্ভীর গলায় বলল—বাইরে।

—কেন?

মৃন্ময় সমরের হাতটা ধরে বন্ধুর মত টেনে এনে বলল—জায়গা আমি করে দেব। মুক্তি, সমরকে রাগিয়ে দিলে কেন? ওর শরীরে জমিদারের রক্ত। আমার মত গরীবের গায়ের রক্তে যা সয়, ওর তা সইবে না।—আরে, কি হ'ল, এসো!

মুক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মৃন্ময় হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে এক মুহূর্তে টেম্পারেচারের চার্টটা দেখে নিল। একটু অবাক হয়ে বলল—বাঃ জ্বর নামছে দেখছি যে!

মুক্তি সহজ হতে চেষ্টা করল! বলল—কৈ আমি তো দেখিনি।

মৃন্ময় ঠাট্টা করে বলল—আমি সায়েন্টিস্ট, মুক্তি। 'এ্যাট এ গ্ল্যান্স' বুঝতে পারি। এই ছাখো, পাঁচদিনের চার্টটা! জ্বরটা ক্রমশঃ কমছে, অবশ্য খুব ধীরে ধীরে। কিন্তু কমছে। 'আই এ্যাম সিওর'।

মুক্তি বলল এক ডিগ্রীও না।

—কিন্তু 'বাই পয়েন্টস'। ছ্যাট্স এ গুড সাইন। আচ্ছা, আলোটা আরও একটু বাড়াও তো!

মুক্তি বলল—ইস্, বাতিটা পুড়ে যাচ্ছে।

মৃন্ময় সীতার মুখ দেখল, তারপর আস্তে আস্তে, তার কপালে হাত দিল, হাত বুলাল একটু!

মুক্তি দেখছিল, মৃন্ময়দার সুন্দর আঙ্গুলগুলো থেকে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে। মৃন্ময়দা কি!—যা স্পর্শ করে তাতেই একটা প্রশান্তি অকৃপণ হয়ে বাজে! কিন্তু ও একদিনও তার গায়ে হাত দিয়ে ছাখেনি! যেদিন দেখবে, সেদিন কি মুক্তি ঘন মেঘে ঢাকা শ্রাবণের বৃষ্টির মত ঝরে পড়বে? কিন্তু সে কবে? কবে সেই বৃষ্টির উৎসব আসবে?

সমর বলল—মৃন্ময়, আমি কাল যাচ্ছি।

মৃন্ময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—চল, আমরা বাইরে যাই।

মুক্তি বলল—বারান্দায় আলো নেই। আমার ঘরে এসো। তোমরা চা খাবে তো?

—চা? কাকিমা রান্নায় ব্যস্ত। আমি গেছলাম। দেখা করে এসেছি।

—ওরা তিনজন মুক্তির ঘরে এসে বসল!

মৃন্ময় সমরের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—সিগ্রেট আছে?

সমর প্যাকেটটা বের করে দিয়ে বলল—মৃন্ময় আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠব এবার!

মৃন্ময় বলল—বাঃ, বোসো।

মুক্তি চায়ের কাপগুলো গুছিয়ে রাখল। বলল—সমরদা কাল চলে যাচ্ছে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। অথচ তোমরা দুজনে এমন 'মুড'-এ আছ যে সব মাটি করে দিলে।

মৃন্ময় বলল—মাটি করে দেওয়াই ভাল, মুক্তি। তবে হ্যাঁ, সে মাটিতে যদি কিছু ফসল ফলে।

মুক্তি হাসতে হাসতে বলল—এ মাটিতে শুধু কাঁটা গাছ মৃন্ময়দা। আর কিছুই না, নাথিং।

মৃন্ময় বলল—কাকাবাবু কোথায়?

—কি জানি। জমি বিক্রির জন্য পাগল হয়ে ঘুরছে। পাশের গ্রামে গেছে সেই সকাল থেকে। কেউ নাকি দেড় হাজারের বেশি দাম দিতে চায় না। অথচ বাজারে জমির দাম এখন অন্তত দু'হাজার টাকা। বিপদে পড়ে বিক্রি করতে হচ্ছে তো, তাই!

মৃন্ময় বলল—জমির দাম দেড় হাজার টাকা? বল কি? তাহলে তো লীজ নিয়ে আমার ঠকা হচ্ছে! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

মুক্তি বলল—এত বড় রিস্ক নিচ্ছ, স্বামীজীকে একবার জিজ্ঞাসা করলে না কেন? বছরে পাঁচ হাজার টাকার কনট্রাক্ট! এতো চাট্টিখানি কথা নয়! তোমার ফসল হোক না হোক লীজের টাকা তোমাকে দিতেই হচ্ছে। তার ওপর লোকজন, ট্রাক্টর, পাম্প, বীজধান, সার। সে তো অনেক হাজার টাকার ব্যাপার। চাষ না হলে তুমি তো একেবারে ডুবে যাবে, মৃন্ময়দা। ভেবে দেখ একবার। আমি ফার্ম করার পক্ষে। কিন্তু সব দিক ভেবে দেখতে হবে।

মৃন্ময় বলল—হ্যাঁ, কনট্রাক্ট ফেল করলে জেলও হতে পারে।

—জেলও হতে পারে! বাঃ, ভারি সুন্দর কথা! মুক্তি কড়া গলায় বলল—কথাটা বলছ এমন করে, যেন সমরদার কাছে একটা সিগ্রেট চাচ্ছ। তুমি সত্যি আশ্চর্য মানুষ! সবটাতেই তোমার ঠাট্টা!

মৃন্ময় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর এক সময় বলল—স্বামীজীর

সঙ্গে পরামর্শ করতে বলছ? এক সন্ন্যাসী এসেছেন। আজ ক'দিন। বাবা তাঁর সঙ্গে ধর্ম কথায় ব্যস্ত। গতকাল মৌন ছিল। তার সঙ্গে আর পরামর্শ করে কোন লাভ নেই, মুক্তি। বাবা আর সংসারের কোন কিছুর মধ্যে নেই!

মুক্তির ভয় হল, স্বামীজীও বোধহয় এবার চিরকালের জন্য চলে যাবেন। তার মনে হচ্ছিল উনি এবারই সন্ন্যাস নেবেন। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার এইটাই শেষ পর্যায়। সংসার জীবনের সঙ্গে স্বামীজীর এপর্যন্ত যেটুকু ক্ষীণ সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ এই গ্রামের আশ্রমে বসবাস, বা নূরপুরের সেই আশ্রমে, আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ, সামান্যতম পার্থিব সম্পর্ক—এবার তার ওপর চিরতরে যবনিকা নেমে আসবে। তখন তাঁর জীবনে একটিমাত্র পথ—যে পথ চলে গেছে মৃত্যুর নির্জনতার উদ্দেশ্যে।

সে তাকাল মৃন্ময়ের দিকে। মৃন্ময় তেমনি, জানালা দিয়ে দূরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল।

কি ভাবছিল কে জানে! সেও কি তবে বুঝতে পেরেছে স্বামীজীর শেষ গৃহত্যাগ এবার আসন্ন।

সমর রান্না ঘরে গিয়ে মা-র সঙ্গে দেখা করে এসে উঠোন থেকে সাইকেলটা নিয়ে বলল—মুক্তি একটু এগিয়ে দেবে নাকি!

আশ্চর্য, সমরদার গলায়ও সে তেজ নেই। যেন সেও শেষ বিদায়ের জন্য এখন নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করছে।

কল্যাণী রান্না করতে করতে ব্যস্ত হয়ে উঠে এলেন।—আবার কবে আসছ সমর?

সমরদা বলল—ঠিক নেই। পুজোর সময় আসব হয়ত।

কল্যাণী বললেন—সাবধানে থাকবে বাবা!

মুক্তি বলল—মৃন্ময়দা তুমি একটু দিদির ঘরে বসবে? আমি সমরদাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

মৃন্ময় অন্যমনস্কের মত বলল—এসো।

কল্যাণী বললেন—দেরী করবিনে মুক্তি।

পথে এখন অন্ধকার। তবে নদীতীরে এ অন্ধকারে পথ চলতে ওদের কষ্ট হচ্ছিল না। এ অন্ধকারের মধ্যেও এক ধরনের আলো থাকে। নদীতে এখন ভাঁটা। অর্থাৎ স্রোত তার উৎসের দিকে ফিরে যাচ্ছে। যাচ্ছে সেই সমুদ্রের দিকে, যেখানে গেলে সে অনন্তের সঙ্গে অসীমের সঙ্গে মিশে যেতে পারে সেই শীর্ণ ভাঙা সাঁকোটা পাশে রেখে ওরা এগিয়ে এল।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল।

মুক্তি বলল—এদিক দিয়ে এলে যে! বাড়ি ফিরতে দেরি হবে না?

সমর বলল—হোক্!

—কোথায় যাবে?

সমর বলল—শেষ দিন একটা অনুরোধ রাখ। আমার!

মুক্তি কেন যেন একটু ভয় পেল! বলল—কি অনুরোধ?

সমর থেমে থেমে বলল—প্রথম দিন যেখানে আমাদের পরিচয় হয়েছিল মানে—তুমি সেই সাইকেলে করে আমাকে নিয়ে এসেছিলে, সেখানটায় এব মিনিটের জন্য যাব। তারপর তুমিও বাড়ি ফিরে যাবে—আমিও চলে যাব ঐ দিক দিয়ে!

মুক্তি বলল—বাঃ, সে তো এখান থেকে প্রায় আধ মাইল। মৃন্ময়দাও অপেক্ষা করে থাকবে।

সমর কেমন করুণ গলায় বলল—মৃন্ময় তোমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারবে। আমি জানি।

—তুমি তো ওদিক দিয়ে চলে যাবে। আমি?

—একটা সাইকেল রিক্সা ডেকে দেব। তোমাকে পৌঁছে দেবে।

মুক্তি বলল—বেশ চল।

আবার দুজনে চুপচাপ হাঁটছিল। শুধু সাইকেলের ফ্রি হুইলের একটা একটানা শব্দ বাজছে।

মুক্তি এক সময় বলল—কাল তা হলে যাচ্ছ।

—হ্যাঁ।

—যাবার সময় আমার ওপর কোন রাগ রেখো না। যদি ভুলচুক কিছু

হয়ে থাকে, ক্ষমা করো। তোমার ওপর কখনো কখনো অবিচার করেছি, কখনো কখনো বড় 'রুড্' হয়েছি। সে সব ভুলে যাও!

সমর বলল—আমার কোন রাগ নেই, মুক্তি।

—কিন্তু দুঃখ আছে তো!

—তা আছে, মুক্তি। মিথ্যে বলব কেন! তোমাকে আমি ভালবেসেছিলাম। অবশ্য সে ভালবাসা আমার মত করে। প্রতিটি মানুষই তার মত। নয় কি?

সমরের গলার এই করুণ সুরটুকু শুনে মুক্তি এই মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল।

সমর আবার বলল—আমি, নিশ্চয়ই মৃন্ময় নই, হতে চাইও না। কিন্তু মুক্তি, ভালবাসার সুরটা বোধহয় এক। ছন্দটা মাঝে মাঝে পৃথক হয়, অথবা বিভিন্ন মানুষের গলায় বিভিন্ন রকম লাগে। এই যা তফাৎ!

মুক্তি মাটির দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বলল—ছাখো, সমরদা, এই বোধহয় ভাল হ'ল। একদিন তুমিও আমাকে সহ্য করতে পারতে না, কারণ তোমার সোসাইটির সঙ্গে তোমার জীবনযাত্রার সঙ্গে, আমার বড় প্রভেদ আছে। আমি তা পছন্দ করি না। ঠিক তেমনি আমার দিক থেকে ভাব, আমিও তোমাকে এক সময় সহ্য করতে পারতাম না। কারণ দুজনেরই জীবনের মূল সুর ভিন্ন। তাই না? তাহলে ছাখো, এই টেমপোরারি দুঃখটা আমাদের দুজনকে ভবিষ্যতের বিরাট দুঃখটা থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে! 'ছাট্ ইজ মাস্ট্ ওয়েলকাম।'

সমর বলল—কি জানি! আমার তো মনে হয়, ভালবাসা থাকলে সব থাকে। সব এ্যাডজাস্টমেন্ট হয়।

মুক্তি বলল—শুধু এ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে, শুধু খাপ খাইয়ে চলার মধ্যে বেঁচে থাকার আনন্দ থাকে না, সমরদা। ওটা খেয়ে কোনভাবে টিকে থাকার মত। ওতে বাঁচার আসল স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া ছাখো, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গীটাই তোমার আমার পৃথক শুধু নয়, ওটা পরস্পর অপোজিট, বিরোধী। খুব শীগগির তা বিচ্ছেদ ডেকে আনত। তখন আমরা দুজন,

দুজনকে ঘৃণা করতাম। ভালবাসার মৃত্যু, অথচ বাইরে তার খোলস, সেটা বড় করুণ! সমরদা এই ভাল, এই ভাল। এই দুঃখ বড় পবিত্র!—ও, আমরা এসে গেছি না!

একটা সাইকেল রিক্সা যাচ্ছিল। সমর ডাকল—কে? আকবর না?

রিক্সাওয়ালা দাঁড়াল। —বাবু, না প্যাসেঞ্জার আছে।

সময় বলল—কতক্ষণ পরে ফিরবে?

—দশ মিনিট, বাবু।

—মুক্তিদিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—আচ্ছা বাবু!

রিক্সাওয়ালা চলে যেতে, আবার নদীতীর আগের মত শূন্য, নির্জন হয়ে গেল!

জীবনের সেই তীর্থক্ষেত্রে দুজনে এসে দাঁড়াল। সমর আদৌ কোন কথা বলছিল না। সাইকেলটা একটা খেজুরগাছে হেলান দিয়ে রেখে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

মুক্তিও মুখ নীচু করে ভাবছিল, সেই ফুটবল খেলার দিনটির কথা। সমরদা সেদিন পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পেয়েছিল। ওর গোলেই সেদিন কলেজ জেতে। তারপর এইখানে—হ্যাঁ, এটাই তাদের ভালবাসার তীর্থক্ষেত্র, জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যার উৎসব! সেদিন দিদি সঙ্গে ছিল। তারপর কি যেন আনতে আবার বাজারে ফিরে যায়। সেই অবসরে সমরদাকে সাইকেলে নিয়ে মুক্তি এগিয়ে গেছল। আজ কত বছর পরে সেই উৎসভূমি থেকে যে যার পথে ফিরে যাচ্ছে! শুধু এই আসা যাওয়ার মধ্যে এক বিয়োগান্ত নাটকের গভীর বিষাদ, এই অন্ধকারের মত ভীড় করে আছে!

সমর মৃদু গলায় বলল—মুক্তি, আমাকে তোমার মনে থাকবে?

মুক্তি যেন কিছুক্ষণ পরে একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠছে! একটু পরে বলল—কেন মনে থাকবে না, সমরদা। কিন্তু এই মনে রাখার দীনতা কেন! কি লাভ এই মৃত্যুর মত মনে রাখার মধ্যে! যখন বাঁচবে, যেখানে বাঁচবে, বীরের মত বাঁচবে। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই, তোমার কাছে এই

আমার চাওয়া! দীনতা নয়, প্রার্থনা নয়, বীরের মত বলিষ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকো!

সমর ধীরে ধীরে বলল—তাহ'লে আমাকে আজও ভালবাস মুক্তি? আশ্চর্য!

মুক্তি বলল—ভালবাসি বলেই তো এই রাত্রে আমাদের সেই পুরানো জায়গাটায় এলাম তুমি বড় হও, সুখী হও, আজো তাই চাই। ছাখো, বিয়ে হলে এই চাওয়াটুকুকেও আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম না। তুমি জান না, জীবন মাঝে মাঝে বড় কঠিন, বড় নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেয়!

সমর কাছেই দাঁড়িয়েছিল। মুক্তি তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে কপালে রাখল, ঠোঁটে ছোঁয়ালো। আর সেই মুহূর্তেই তার চোখে জল এল!

সমর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—বেশ। এই ভাল!

অন্ধকার এখন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, হালকা হচ্ছে ক্রমশ। এই মুহূর্তে পথ আরও বিষণ্ণ হয়, মাঠ আরও নির্জন হয়, রাত্রির আকাশ আরও উদাসীন হয়। নদীর ভাঁটার স্রোতও তখন একটু যেন থমকে দাঁড়ায়। কান পেতে কার কণ্ঠস্বর শোনে! সে কণ্ঠস্বর হয়ত মহাসমুদ্রের জীবন স্রোতের। যেখানে জোয়ারভাঁটার স্তব্ধ সঙ্গীত কোন্ অনাদিকাল থেকে বাজছে!

দূর থেকে একটা সাইকেল রিক্সার হর্ণ শোনা গেল। তখনও মুক্তি একটা নিশ্চল, নির্বাক, মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। শব্দটা একবার বেজে থেমে যেতে নদীতীর তেমনি বিষণ্ণ, নির্জন, শূন্য!

মুক্তির গলার স্বর বড় ভারি-ভারি লাগল। বলল—আসি, সমরদা!

॥ ১৯ ॥

মুক্তি বাড়ি ফিরে বারান্দায় চুপ করে বসেছিল তখন।

বিজয়বাবু বললেন—হ'ল না মা, পারলাম না। জমির ঠিক দাম কেউ দিতে চাইছে না। এ দামে জমি বিক্রি করলে ভীষণ ক্ষতি হবে। একে তো

জমিগুলো চলে গেলে কিছু থাকবে না আমাদের। বুড়ো বয়সে আমরা কি খাব? তার ওপর ধর, মেয়েটা বাঁচবে কিনা, তারও স্থিরতা কি আছে?—মৃন্ময়, তুমি কিছু বলছ না যে!

মৃন্ময় বলল—আমি জমি বিক্রি করা মোটেই পছন্দ করছি না।

বিজয়বাবু বললেন—তা হলে টাকার কি করব? সীতাকে বাইরে নিয়ে যেতে হলে অন্তত দশ হাজার টাকা দরকার।

মুক্তি বলল—জমির দাম বাজারে এখন দু'হাজার।

বিজয়বাবু বললেন—দু'হাজারেরও বেশি। এই তো ক'দিন আগে মাইতিদের জমি বিক্রি হল। একুশ 'শ করে। সে জমির চেয়ে আমার জমি অনেক ভাল। কিন্তু কি করব। সবাই ভয় পাচ্ছে জমি কিনতে।

মৃন্ময় অবাক হয়ে বলল—ভয় পাচ্ছে? কেন?

মুক্তি বলল—আমার মনে হয়, বাবা, এটা, ঐ হরেন জ্যাঠামশায়ের কীর্তি।

মৃন্ময় বলল—আমাকেও টাকার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন হরেনবাবু। আপনি বরং এক কাজ করুন, টাকার একটা ব্যবস্থা হতে পারে! জমি বিক্রির আর চেষ্টা করবেন না।

বিজয়বাবু বললেন—কি ব্যবস্থা হতে পারে, বাবা!

মৃন্ময় কি ভাবল একটু। তারপর বলল—কাল বলব।

বিকেলে বা সন্ধ্যায় আসব। মুক্তি ছাখতো ক'টা বাজল।

গোবিন্দ নরঘাট থেকে ফিরল। হাতে জিনিসপত্র, কেরোসিন তেলের টিন। উঠোনে উঠতে গিয়ে বলল—কর্তাবাবু, স্বামীজীর কাছে যে সন্ন্যাসী আস্‌সে, লোক তাকে ছাখতে ভির করছে আশ্রমে। ইয়া মাথায় জটা, ত্রিশূল, কমণ্ডলু, চিমটা। কিন্তু কথা বলে না কারুর সঙ্গে। মিনুবাবু, আপনি জাননি।

মৃন্ময় বলল—আমি দেখেছি, গোবিন্দদা।

—আমি একবার দেখতে যাব।

—যাও।

পড়ে আছে। কি ভাবতে ভাবতে মুক্তি সিগ্রেট প্যাকেটটা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। অন্ধকারে কোথায় পড়ল কে জানে! মুখ ফিরিয়ে ছাখে মৃন্ময়দা কখন চুপ করে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

মুক্তি লজ্জিত হল, রাগও হ'ল একটু।

মৃন্ময় বলল—আমি এইমাত্র এলাম। তুমি এমন এ্যাবজরবড্ ছিলে, ডাকতে ইচ্ছে করল না। তাই চলে যাচ্ছিলাম। বাইরে কি ছুঁড়ে ফেললে?

মুক্তি হাসল। কোন উত্তর করল না, বোধহয়, এ হাসিটাই কান্নার মত।

মৃন্ময় বলল—তুমি আজ বড় 'ডিসটার্বড্'। তোমাকে বিরক্ত করব না। আমি চলে যাচ্ছি। শোন, বাবা এসেছে। বারান্দায় কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলছে। তুমি আসবে?

মুক্তি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। মৃন্ময়দার দিকে তাকালো একবার। ওর মুখে কোন বিরক্তির চিহ্ন নেই। ও নিশ্চয়ই জানে, এই মুহূর্তে সমরদার কথাই মুক্তির সারা মন জুড়ে আছে। তবু তার অন্তরে প্রশান্তি। ওকি ভাবছে, ভালবাসাকে তার ন্যায্য মূল্য দিতেই হয়! না দেওয়াটা অপরাধ। না দেওয়াটা জীবনে বেসুর বাজে! মৃন্ময় তখনও দাঁড়িয়েছিল।

মুক্তি মৃন্ময়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঘরের আলোটা কমিয়ে দিলে। শুধু বলল—এসো।

এখন উঠোনে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। রাত বোধহয় ন'টা। স্বামীজী ইজিচেয়ারটায় বসেছিলেন। বিজয়বাবু বারান্দায় পাতা মাহুরে। সকলেই প্রার্থনায় বসেছেন!

মুক্তি বাবার কাছে এসে বসল। মৃন্ময় উঠোনে আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল। সকলেই যেন এক মৌন সভার নীরব দর্শক।

মুক্তিই প্রথম কথা বলল—স্বামীজী, দিদিকে একবার দেখবেন না?

স্বামীজী যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠলেন। বললেন,—হ্যাঁ মা, দেখব, যাবার সময়।

—আপনার কাছে কে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন যেন?

—আমার চেনা।

—গুরু নাকি!

—বলতেও পার।

—এতো রাতে এলেন যে!

স্বামীজী উদাসীন গলায় বললেন—না, এই নদীর ধারের রাস্তায় হাঁটছিলাম একটু। হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের এখানে চলে এলাম।

মুক্তি বুঝতে পারল এবং তাতে তার আশ্চর্য লাগল, সন্ন্যাসীর মধ্যেও এই পরিচিত নদীতীর, পথ, মাঠ, গ্রাম মানুষ—এর জন্যও এক অব্যক্ত বেদনা থাকে! যে শ্মশানে মৃন্ময়দার মাকে দাহ করা হয়েছিল সেখানেও হয়ত উনি গেছলেন। মুক্তি বুঝতে পারছিল, এই সব পরিচিত নিঃশব্দ জগৎ থেকে স্বামীজী শেষ বারের মত বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাই রাত্রে, যখন কেউ কোথাও নেই সব যখন নিদ্রিত, সেই অবসরে গোপনে তিনি শেষ বিদায়ের কান্না কাঁদতে এসেছেন! যে পথে শৈশব থেকে শুরু করে এই বার্ধক্যের দিনগুলি পর্যন্ত তিনি হেঁটেছেন, যে নদীতে তিনি কতদিন স্নান করেছেন, যে মাঠের দূর থেকে আসা বাতাসে তিনি প্রাণভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছেন, যে গাছের ছায়ায় তিনি বিশ্রাম করেছেন, গ্রামের যে মানুষগুলি তাঁকে আশৈশব সঙ্গ দিয়েছে, যাঁর কত ছাত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে—আজ সেই জগতের শ্রদ্ধা থেকে স্নেহ থেকে ভালবাসা থেকে তাঁর চিরকালের জন্য চলে যাবার দিন আসন্ন।

এক সময় মুক্তি দেখল, স্বামীজী মৃন্ময়দার দিকে তাকিয়ে আছেন। উঠোনে পায়চারি করছে মৃন্ময়দা। তার খেয়ালই নেই!

মুক্তি ভাবল, হয়ত আত্মজকে ক্ষুধিত চোখ দিয়ে শেষ বারের মত দেখে নিচ্ছেন স্বামীজী!

বিজয়বাবু বললেন—দাদা, একটু চা!

স্বামীজী বললেন—দেবে, দাও।

মুক্তি উঠে গিয়ে মাকে বলে এল। তারপর আবার মাদুরটায় এসে বসল।

বিজয়বাবু আস্তে আস্তে এক সময় হতাশ ভাবে বললেন—দাদা, আমার কিছু হলনা। সারাজীবন এই রাজনীতি, এই সংসার! ঈশ্বর চিন্তা মনেই এলোনা। এ জন্মটা এমনি চলে গেল।

স্বামীজী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। শুধু বললেন,

—হবে, বিজয়।

—কি করে হবে, আর কবে হবে দাদা ?

—কর্মের মধ্য দিয়েও মুক্তি আসে, বিজয়। স্বামী বিবেকানন্দ, তাই বলতেন 'কর্মযোগ'। সকল কাজের ফল তাঁকে অর্পণ করে, শান্তচিত্তে জীবন যাপন কর। ওতেই মুক্তি সহজ হবে।

বিজয়বাবু বললেন—সে কি আমাদের জীবনে সম্ভব! আমরা সংসারে বদ্ধ জীব।

স্বামীজী ধীরভাবে বললেন—অসম্ভব নয়।

—কি ভাবে সম্ভব ?

—অনাসক্ত হও। আসক্তি থেকেই দুঃখ আসে! নিজের মধ্যে যে অহং ভাবটা আছে, ওটাকে ত্যাগ করতে চেষ্টা কর। একদিনে হবেনা। তবে ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। মন তখন শান্ত হয়ে আপনা আপনি ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হবে।

বিজয়বাবু বললেন—বড় কঠিন। এই তো সীতা মৃত্যু শয্যায়। বলুন, মন কি ভাবে শান্ত থাকে।

স্বামীজী উদাসীনভাবে বললেন—ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

মুক্তি জানেনা, ঈশ্বরের ইচ্ছাটা কি! দিদি ভাল হবে, এইটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। অথবা হবেনা—এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। একথা বড় দ্ব্যর্থবোধক কিন্তু এই মুহূর্তে সে প্রশ্নটা করতে সাহস করল না বা তর্ক করতে ইচ্ছে করল না।

মৃন্ময় তেমনি উঠোনে কি ভাবতে ভাবতে পায়চারি করছিল। এসব কথা বোধ হয় তার কানেও যায়নি।

বিজয়বাবু বললেন—দাদা, কতোদিন এক সঙ্গে কাটিয়েছি, কাজ করেছি। আজ কেন যেন সে সব বড় বেশি মনে পড়ছে।

কল্যাণী চা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। স্বামীজীর হাতে একটা কাপ তুলে দিলেন। বললেন—আর একটু কিছু? একটু ফল?

স্বামীজী তেমনি নিরাসক্তভাবে বললেন—দেবে, দাও।

কল্যাণী তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেলেন। একটা পাকা পেঁপে বাড়িতে আছে। কেটে নিয়ে এসে প্লেটটা ধরলেন স্বামীজীর সামনে।

স্বামীজী চামচে দিয়ে শুধু একটা টুকরো তুলে নিয়ে ডাকলেন—মুক্তি, মা, খোকা!

মৃন্ময় কাছে এল।

স্বামীজী বললেন—আমি খেলাম। তোরা দুজনে খেয়ে নে। মৃন্ময় অবাক।

—কিরে খা, আমি দেখি!

মৃন্ময় মুক্তির দিকে তাকাল।

মুক্তি সময় নষ্ট করতে চায়না। লজ্জাও নয়। বরং লজ্জা দেখালে, সব কিছু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার চেয়ে সহজভাবেই কয়েক টুকরো তুলে নিয়ে মৃন্ময়দার হাতে গোটা প্লেটটা দিয়ে দিল।

স্বামীজী তখন চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে দেখছিলেন। হ্যারিকেনের আলোয় এখন মনে হ'ল, সে দৃষ্টি শিশুর মত কোমল, বা নদীর মত শান্ত। অথবা দেবতার আশীর্বাদের মত পবিত্র—! কে জানে!

চায়ের প্লেটটা বারান্দায় রেখে স্বামীজী বললেন—মুক্তি, তোমার দিদি কোন্ ঘরে!

মুক্তি উঠে দাঁড়াল—আসুন। মৃন্ময়দা তুমি আসবে না!

মৃন্ময় বলল—তোমরা যাও।

স্বামীজী অনেকক্ষণ ধরে সীতার ঘরে বসেছিলেন। এক সময় বললেন—কথা বলছেনা ক'দিন?

—প্রায় দু সপ্তাহ!

স্বামীজী আবার চুপ করে গেলেন।

মুক্তি দেখল ঘরে মৃন্ময়দা বা বাবা এখন কেউ নেই। বাবা এসেছিল চলে গেছে। এইটাই তার সেই কথাটা বলার ঠিক মুহূর্ত।

মুক্তি বলল—স্বামীজী, সেদিন আপনি বলেছিলেন, দিদি ভাল হয়ে যাবে। আপনার মুখ থেকে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বেরোয় না। কিন্তু অবস্থা বড় খারাপ। ওকে বাইরে নিয়ে যেতে হচ্ছে!

স্বামীজী হাসলেন শুধু।

মুক্তি জিদ ধরল—বলুন তা হ'লে সেদিন আপনি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলেন! দেশের আর পাঁচজন সাধু সন্ন্যাসী যেমন 'ব্লাফ' দিয়ে লোকের কাছে টাকা পয়সা নেয়, আপনিও তেমনি! আপনারও কথার দাম নেই!

মুক্তি নিজের মনের ক্ষোভ আর চেপে রাখতে পারছিল না। তার আশা ছিল, স্বামীজী অন্তত বাজে কথা বলবেন না। অথচ বাস্তবে তা-ই ঘটতে চলেছে। আর মাত্র একদিনের মধ্যে কি হতে পারে! দিদি বাঁচবে না! পথেই মারা যাবে!

মুক্তি দেখল স্বামীজী তেমনি প্রশান্ত স্থির। মোড়ায় বসে আছেন! সে যে তাঁকে এমনভাবে চার্জ করছে, তাতেও তিনি শান্ত। কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

মুক্তি আশ্চর্য হল!

স্বামীজী একটু পরে হেসে বললেন—আমাকে চার্জ করে ঠিক করেছ মা! নিশ্চয়ই করবে। মা হয়েছ, ছেলেকে বকবেনা!

মুক্তি কাঁদতে কাঁদতে বলল—স্বামীজী, দিদি আমার সব। দিদি ছাড়া আমি বাঁচবনা। আপনি ওকে পড়িয়েছেন, আপনিও জানেন, দিদি কী রকম মেয়ে। ওকে আপনি বাঁচিয়ে দিন! বাঁচিয়ে দিন! আপনি পারেন, আমি জানি!

স্বামীজী হাসতে হাসতে শুধু বললেন—পাগলীর কাণ্ড দেখ! তারপর চোখ বুজে চুপ করে তেমনি বসে রইলেন ঘরে।

বাইরে তখন রাত্রি গভীর। হঠাৎ মনে হল একবার মেঘ ডাকল যেন।

না, তারপর আর কোন শব্দ নেই!

মুক্তির হঠাৎ এক সময় স্বামীজীর দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল তার। স্বামীজী স্থির বসে আছেন। মেরুদণ্ড সোজা। দীর্ঘ সাদা দাড়ি, দীর্ঘ মাথার চুলের মধ্যে, এই বলি রেখা পড়া মুখের মধ্য থেকে যেন একটা আলো একটা জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। মুক্তি আর তাকাতে পারল না। শুধু আবছাভাবে তার মনে হল, স্বামীজী সীতার শায়িত নিশ্চল শরীরের ওপর আলগাভাবে কয়েকবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধীরে ধীরে হাত বুলালেন। আর মুখে কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। মুক্তি এখন আচ্ছন্ন, বোধহয় তার সকল ইন্দ্রিয় সচেতনতা হারিয়ে ফেলছে। সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে—আর কিছু মনে নেই। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজীর গম্ভীর কণ্ঠে ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই শব্দ তিনটি উচ্চারণের পর মুক্তির মনে হল সে সংজ্ঞা ফিরে পাচ্ছে। তারপর যখন একেবারে পূর্ব সচেতনতা ফিরে পেল, তখন দেখল, সে যেখানে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি অবস্থায় বসে আছে। অথচ মাঝখানের সময়, যে সময় পৃথিবীর ওপর দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে গেছে তার কোন হিসেব সে জানে না। সে বোধহয় কোন এক মৃত্যুর নদী পেরিয়ে এই মাত্র জীবনের তীর ভূমিতে এসে উঠল! ওপারের খেয়াঘাট গ্রাম ঘর গাছপালা প্রান্তর আকাশ সব এখন বিস্মৃতির কুয়াশার মধ্যে গভীর অবলুপ্ত!

মুক্তি মনে মনে স্থির করল—এ ঘটনা সে কাউকে বলবে না। বললে, লোকে তাকে পাগল বলবে। বলবে, স্বামীজীরা-সন্ন্যাসীরা মাঝে মাঝে এই সব ম্যাজিক খেলা দেখিয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুক্তি অন্তত জানে, স্বামীজী সে রকম নন। কিন্তু নিজের চোখে সে যা দেখল; তার অর্থ কি! উদ্দেশ্য কি! একি দিদিকে আয়ুদান! একি দিদিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো? একি যোগের এক উর্ধ্ব স্তর!

না, মুক্তি এর কোন একটা উত্তর নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পেল না। এও বোধহয়, মিস্টিসিজম, কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতের অদৃশ্য অধ্যায়!

স্বামীজী টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মুক্তি পেছনে পেছনে

আসছিল।

বিজয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন—দাদা, সীতাকে একটু আশীর্বাদ করে যান। আমার মন বলছে ও বাঁচবে না। যাক্‌! যেন বিনা যন্ত্রণায় চলে যেতে পারে। পিতা হয়ে এর বেশি আজ কিছু চাইব না!

বিজয়বাবুর গলা ধরে আসছিল।

স্বামীজী থমকে দাঁড়ালেন। তারপর শুধু বললেন—ঈশ্বরের ইচ্ছে, বিজয়।

কথাটা সেই উঠোনের আলো এবং অন্ধকারে কেমন একটা অশরীরী শব্দ নিয়ে মিলিয়ে গেল।

স্বামীজী আর কিছু বললেন না। বাঁশের গেট খুলে উঠোন পেরিয়ে পথে নামলেন। একটু পরেই নদী তীর শুরু হয়েছে। তার কাছেই সেই বাঁশের ভাঙা শাঁকোটা এই রাত্রে কতগুলো দীর্ঘ জীর্ণ কঙ্কালের মত জেগে আছে। স্বামীজী তার পাশ দিয়ে নদীতীর ধরে হাঁটতে লাগলেন। এমনি একা একা হাঁটতে হাঁটতে আশ্রমে পৌছবেন। মুক্তি আর মৃন্ময় উঠোন পেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু আর এগোল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

জ্যোৎস্না গ্রামের গাছপালা ছাড়িয়ে এখন অনেকটা ওপরে উঠেছে। আকাশ সুদূর গম্ভীর।

মুক্তি সেই আকাশের দিক থেকে চোখ ফেরাল। স্বামীজী চলে যাচ্ছেন। এখন আর উনি স্পষ্ট নন। শুধু একটা অপস্রিয়মান সরলরেখার মত নদীতীর ধরে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ দূরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেলেন।

মুক্তির মনে হল, এই নদীতীরে এই মাটির পথে, এই শস্যের মাঠে, এই গ্রামের মানুষের মধ্যে এই লোকটি আর কখনো ফিরে আসবেন না। তাঁর জীবনের পরিক্রমা শেষ হতে চলেছে। এখন তিনিও কোন অজানা পর্বত, নদী, অরণ্যের জন্য বেরিয়ে পড়বেন। যেখানে তিনি তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবেন। মানুষ চিরদিনই একা। এই নিঃসঙ্গতা তার আজন্মের সঙ্গী। তাই তাকে এমন একজন নিঃসঙ্গীকে খুঁজে নিতে হয়—যিনি তাকে কখনো ছেড়ে যাবেন না। যিনি আলোয় অন্ধকারে পথে প্রান্তরে দেশে বিদেশে

নিত্যকালের জন্য বন্ধু হয়ে থাকবেন, সঙ্গী হয়ে থাকবেন।

মুক্তির মনে হল, হয়ত তিনি এই পথের। থাকলেও সত্য, তিনি না থাকলেও সত্য। ঈশ্বর বোধহয় এমনি এক মহিমময় সত্তা এবং মহিমময় সত্য!

স্বামীজীকে আর দেখা গেল না। তিনি চলে গেছেন। এখন শূন্য নদীতীরে শুধু বাতাসের হাহাকার! কান্না!

॥ ২০ ॥

পরদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির সব আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার মনে হ'ল, সীতার অবস্থা আজই যেন সবচেয়ে খারাপ। দুপুরের সময় যখন প্রচণ্ড রোদে মাঠ পুড়ে যাচ্ছে, আকাশ থেকে আগুনের হল্‌কা ঝরছে, তখনি তার মনে হ'ল, না, দিদিকে আজ আর বাঁচানো যাবে না। দীননাথবাবুর কবরেজী চিকিৎসা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সীতা এখন কেমন যেন বড় অস্থির। মুখ চোখ এতদিন তবু শান্ত ছিল—আজ কেমন ভীষণ অশান্ত। এবং অশান্ত বলেই বার বার বিকৃত হয়ে উঠেছে। মুক্তি শুনেছিল, মৃত্যুর আগে এরকম প্রতিক্রিয়া হয়, এরকম লক্ষণ প্রকাশ পায়!

দুপুরে রান্না হয়নি। কে খাবে আজ।

গ্রামের সাঁতরাদের বুড়ি জেঠাইমা পরামর্শ দিল—বিজয়! আর কেন বাবা মেয়েটা যেতে পারছে না। কিছু শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর। আত্মা যে কষ্ট পাচ্ছে! আহা হা-কি ভাল মেয়ে ছিল। ওরা কি আর থাকতে আসে, বাবা! যারা ভাল হয়, ভগবান তাদের তাড়াতাড়ি ডেকে নেয়।

বিজয়বাবু চুপ করে রইলেন।

গ্রামের ছেলে বুড়ো প্রায় সবাই একবার করে দেখে গেল।

অনন্তের বৌ কুসুম সেই দুর্ভিক্ষের মত চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

মুক্তি ধরা গলায় বলল—কিরে! তুই এসেছিস মা।

কুসুম বলল—হ আইলি। আহা শুইয়াছে, যেন ঘুমাঠে!

মুক্তি এসব আর শুনতে পারছে না। এতো লোকের সান্ত্বনা, কথা অসহ্য লাগছে। বলল তা, অনন্ত টাকা পাঠিয়েছে?

না, দিদি। মাটির কাজ এখনো হয়নি গো। খুঁজেঠে!' চিঠি আমাকে।

মুক্তি শুধু বলল—বেশ।

কুসুম বলল—মুক্তিদি তুমি কেনি মন খারাপ করছ। আহা! বড় ভাল মায়াঝি সীতাদি! তা, এখন তো নিঃশ্বাস আছে। এমন টসটসে মুখ। তুমানে কি কওগো!

মুক্তি অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। তবে কি দিদির অবস্থা ভালর দিকে! বলল—তুই কি বলছিস্‌রে কুসুম।

কুসুম বলল—না গো, মুক্তিদি, সীতাদি কেনি মরবে! মরি যেন, আমানে। কি সুখে দুনিয়ায় আছি। ছেলেটার জ্বর আইজ তিন দিন। সেই যে পাঁচটাকা দিথল, দুটাকা লুকি রাখথিলি। আইজ বার্লি কিন্যা আনছি! তা কবি ভাল হইবে। কে জানে। লোকটা অখনও মাটি কাজ পাইলনি। কাই আছে, কি খাঠে কে জানে!

মুক্তি মনে মনে বলল, কুসুম তোর কথা সত্য হ'করে! দিদি যেন বেঁচে ওঠে!

বিজয়বাবু এসে দাঁড়ালেন।

মুক্তি বলল—কোথায় যাবে বাবা?

বিজয়বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—একবার দীননাথদার কাছ থেকে আসি। যদি আর কিছু ওষুধটষুধ দেয়। কোন আশাতো নেই।

মুক্তি বলল—ছাতাটা নিয়ে যাও বাবা! আর একবার ওকে আসতে বলবে। বিজয়বাবু বললেন—বেলা পড়ে গেছে! রোদ নেই।

বিজয়বাবু চলে যেতে মুক্তি বলল—কুসুম শোন। কুসুম ময়লা শতছিন্ন শাড়ীটা বুকের ওপর টানতে টানতে মুক্তির পিছু পিছু তার ঘরে এল।

মুক্তি টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে ভ্যানিটি ব্যাগটা বের করে দুটো টাকা

দিল তাকে। বলল—ছেলেটাকে ডাক্তার দেখা। আমার কাছে আর কিছু এখন নেই রে। মৃন্ময়দা এলে তাকে বলব! কুসুম দুটাকার নোটটা হাতে নিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মুক্তি বলল—তুই যা এখন। পরে আসিস্।

কুসুম বলল—টাকাটা তুমি রাখ্যা দ' মুক্তিদি। বাড়িতে তুমার কত বিপদ!

এত দুঃখেও মুক্তির হাসি পেল। কুসুম এই দারিদ্র্যের মধ্যেও নির্লোভ। বোধহয় গ্রামের মেয়ে বলে! বলল—যা, নিয়ে যা!

কুসুম বলল—এখন যাইবি। কুন কাজ থাকলে ডাকব মুক্তিদি।

কুসুম চলে যেতে মুক্তি দিদির ঘরে এসে দেখল, সীতার অস্থিরতা একটু কম। থার্মোমিটার দিতে আর ইচ্ছে করল না। মা এখনো তার ঘরে চুপ করে বসে আছে! উঠোনে বিকেলের ছায়া নেমেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে প্রায়।

একটা জীপের শব্দ হতে মুক্তি বুঝতে পারল বিভাসবাবু এলেন। আজ আসার কথা ছিল। একবার ভাবল, আর দু'দিন আগে এলে তবু দিদিকে বাইরে নিয়ে যাবার কথাটা এগিয়ে থাকত। এখন যে কি হবে!

জীপ থেকে নেমে বিভাসবাবু হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে ডাক দিলেন—বিজয়দা, বিজয়দা আছেন নাকি?

কল্যাণী দ্রুত বেরিয়ে এলেন।

বিভাস বললেন—একি! কি ব্যাপার! বাড়ি থেকে গ্রামের লোকজন চলে যাচ্ছে দেখলাম।

কল্যাণী কান্না কান্না গলায় বললেন—সীতা!

—সীতার কি হয়েছে?

কল্যাণী কেঁদে উঠলেন—পাপ আমার পাপ ঠাকুরপো। নইলে সেদিন যদি ওকে নিয়ে যাওয়া হ'ত, তবু বাঁচত মেয়েটা।

বিভাসবাবু ধপ করে ইজিচেয়ারটায় বসে পড়লেন। বললেন—আমি ঐ কবরেজটাকে ধরে এক্ষুনি পুলিশে দেব। বললাম, এমন এ্যাকিউট কেস।

বলে কিনা, নাড়ী বলছে, সাত দিনের মধ্যে মৃত্যু নেই। ব্যাটা—ধন্বন্তরী এসেছে। কই? মুক্তি কোথায় গেল? সেদিন যে বড্ড চোখা চোখা কথা বলছিল! আজ কোথায়? ডাকুন তাকে বৌদি! ঐ আপনার এম. এ পড়া মেয়ের তেজটা দেখি আর একবার! আমি যা বলি, তাই করি, বৌদি। আমি রেডি হয়ে এসেছি। পেসেন্ট কি অবস্থায় আছে জানি না। একটু জার্কিং স্ট্যাণ্ড করতে পারলে আমি আজই জীপে কলকাতা নিয়ে চলে যাব।

তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলল—বুঝলেন বৌদি, কাউকে বলবেন না, বিজয়দার নামেই আমি এ্যাপ্লাই করে দিয়েছি। বলেছি স্বাধীনতা-যুদ্ধে দশবার জেলখাটা মানুষ! পাসপোর্ট, ভিসা সব ম্যানেজ করে ফেলব। ও আপনি কিস্সু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে! আমি আছি।

কল্যাণী বললেন—আজ রাতটা কাটুক তো আগে ঠাকুরপো!

বিভাসবাবু বললেন—ও, এরকম অবস্থা! মাই গড!

মুক্তি দিদির ঘর থেকে সব শুনছিল। দিদির দিকে তাকাল একবার। দিদি তখন শান্ত হয়ে শুয়ে আছে। মুক্তি ভাবতে ভাবতে জানালা দিয়ে তাকাল একবার। পশ্চিমের মাঠে, নদীতীরে হঠাৎ ঘনকালো ধূসর ছায়া! অথচ ঠিক ঠিক সন্ধ্যা এখনও হয়নি। সে ছায়ায় সূর্য ঢেকে গেছে। তারই আবীর রং পশ্চিম আকাশের মাত্র সামান্য অংশে ছড়ানো! তবে কি মেঘ করেছে? কালবৈশাখী উঠবে? কিছু বুঝতে পারছে না সে।

দ্রুত মৃন্ময় এসে ঘরে ঢুকল।

মুক্তি তার দিকে তাকালো। আশ্চর্য! মুক্তি এতক্ষণ একবারও কাঁদেনি! কিন্তু মৃন্ময়কে দেখে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

মৃন্ময় স্তব্ধ। আস্তে আস্তে বলল—স্থির হও। কেন এমন করছ!

মুক্তি বলল—পারলাম না, মৃন্ময়দা। দিদি আমার জন্যই চলে যাচ্ছে।

মৃন্ময় সীতার কপালে হাত রাখল! বলল—শরীরে এখন তাপ তো বেশি নেই। আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা কাঁদছো কেন!

মুক্তি বলল—আজ দুপুর বেলা যদি তোমরা দেখতে! আমার ভয় হচ্ছিল! আমার ভয় হচ্ছিল, এক্ষুনি চলে যাবে।

মৃন্ময় বলল—কি হয়েছিল ?

মুক্তি চোখের জল মুছে বলল—আজ দুপুরে দিদি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল। জানতো, আজ ভীষণ গরম পড়েছিল। দিদির মুখ চোখ কেমন একটা ভেকেন্ট লুক। বাবা, মা, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছলাম। গ্রামের লোকজন সবাই বলল—আর আশা নেই। জেঠাইমা বলল, শান্ত নিস্তেজ হয়ে আসছে।

মৃন্ময় স্থির হয়ে শুনল। নাড়িতে হাত দিল। নিজের নাড়িও দেখল। বলল—আমি ডাক্তার নই। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান থেকেই বলছি, এটাকে ডেঞ্জার বলে মনে হয় না। তা আজ আমি বড় টায়ার্ড মুক্তি। সারাদিন স্নান খাওয়া হয়নি। বাড়ি যাই, একটু পরে আসব।'

মুক্তি মৃন্ময়ের শুকনো ধুলো-বালি ঘাম মাখা মুখের দিকে তাকালো। বলল—কেন ? কি হয়েছে ?

—ব্যাঙ্কে টাকাটা ক্যাশ করতে দেরি হল। চেকটায় একটু গণ্ডগোল ছিল। তারপর কি জানি কেন বাস স্ট্রাইক। মিটে যেতে এলাম। অনেক কষ্ট হ'ল। শোনো এটা রেখে দাও।

মুক্তি অবাক হয়ে বলল—কি ওটা ?

—পাঁচ হাজার দু'শ ত্রিশ টাকা আছে। সীতাকে নিয়ে তোমরা কলকাতা চলে যাও। আমি দেখছি, আরও কিছু টাকা কোথাও পাই কিনা। পেলে কলকাতা গিয়ে দিয়ে আসব। কাকাবাবু কোথায় ?

মুক্তি স্থির হয়ে শুনছিল। বলল—তোমার ফার্মের লীজ ডীড রেজেষ্ট্রী করার টাকা। তাই না মৃন্ময়দা ? তুমি সব দিয়ে দিচ্ছ ! মৃন্ময়দা তুমি, তুমি কি পাগল !

মৃন্ময় বলল—আমি পাগল এখনও হইনি। দিচ্ছি, খুশি হয়ে। আমার ব্যবস্থা পরে হবে। বিভাসবাবুও এসেছেন। কাল ঐ জীপে তোমরা চলে যাও। আমি বাড়ি যাচ্ছি। আর দাঁড়াতে পারছি না। মৃন্ময় দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মুক্তি কতক্ষণ স্থির দাঁড়িয়েছিল। এই দুঃখের মধ্যেও কি একটা আনন্দ,

কি একটা বিশ্বাস, সে ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে। টাকার বাণ্ডিলটা—নিয়ে গিয়ে মা-র হাতে তুলে দিল মুক্তি।

কল্যাণী বললেন—মৃন্ময় সব টাকা দিয়ে দিল! সে কি!

মুক্তির কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। শুধু বলল—হ্যাঁ, মা-কে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দিদির ঘরে ফিরে এল মুক্তি।

আর তখনি একবার ঈশান কোণ থেকে কালবৈশাখীর মেঘ ডেকে উঠল। ভীষণ গর্জন সে মেঘের। প্রায় ছ'মাস ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় আকাশ মাটির সমস্ত ক্রোধ যেন ফেটে পড়ছে। সঙ্গে বজ্রপাত, বিদ্যুতের ছটায় আকাশ ভরে চমকে উঠছে মাঝে মাঝে!

মুহূর্তের মধ্যে সারা মাঠ, নদীতীর বিদ্রোহী ঘন মেঘে ছেয়ে গেল। দুরন্ত ঝড় তখন পিপাসার্ত গাছপালার মধ্যে একটা বিপ্লবের মত বার বার আছড়ে পড়ছে। যেন সব কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবে সে। অন্ধকার মাঠটাও এখন অসংখ্য কালো কালো পদাতিক সৈন্যের মত জেগে উঠছে। যেন এবার যুদ্ধ শুরু হ'ল। এই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শীর্ণ নদীর স্রোত ফুলে ফেঁপে প্রবল হয়ে উঠল। অন্ধকার! অন্ধকার। ঘন অন্ধকার আকাশে মহাপ্রলয়ের পটভূমি মুহূর্তে রচনা হয়ে গেছে।

কিন্তু বৃষ্টি প্রায় হল না। সামান্য দুচার ফোঁটা মাত্র।

মুক্তি হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে পেছনে ফিরে দেখে, সীতা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে চাইছে। তার মুখে এক ধরনের অস্বাভাবিক শব্দ। সেটা একটা দুর্বোধ্য চিৎকার, সে শব্দের,. সে চিৎকারের কোন অর্থ নেই। শুধু সেই একটা অবরুদ্ধ যন্ত্রণার বা আনন্দের প্রবল অভিব্যক্তির মত। যদিও নিষ্ঠুর, কঠিন, ভয়ংকর।

মুক্তি ভীষণ ভয় পেয়ে যত জোরে পারে চিৎকার করে উঠল। —মা, দৌড়ে এসো, দৌড়ে এসো, দিদি—

কল্যাণী চিৎকার শুনেই কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এলেন। বিভাসবাবুও ছুটে এলেন পিছু পিছু। বললেন—আরেঃ, কি হ'ল?

তারপর দেখে শুনে বললেন—ডাক্তার! ডাক্তার! এক্ষুনি ডাক্তার

ডাকুন। পেসেন্ট হার্টফেল করবে। বৌদি আর দেরি করবেন না!

কল্যাণী চিৎকার করে বললেন—ডাক্তার কোথায় পাব, ঠাকুরপো।

—লাস্টে কে দেখছিল?

—ডাঃ মুখার্জি।

—সে তো তমলুকে।

মুক্তি বলল—আজ তাঁর চেম্বার খোলা থাকার কথা। কিন্তু তাঁকে আনব কি করে! একে বুড়ো মানুষ, তার ওপর এই কালবৈশাখীর ঝড়, অন্ধকার।

বিভাসবাবু কি যেন ভাবলেন। বললেন—মাথা ঠাণ্ডা কর মুক্তি। এসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে? জীপ আছে। ভয় কি! বিজয়দার জন্য, তোমার দিদির জন্য এটুকু করব না। বল কি! হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটাই ফাইন্যাল! হ্যারি আপ! এরপর যদি বৃষ্টি নামে তবে জীপ চলবে না। ডাক্তার পাবেনা। আমি চিনিনা ডাঃ মুখার্জিকে। আমার কথায় তো আসবে না। —আরে কি হ'ল! হ্যারি আপ্। তৈরি হয়ে নাও।

মুক্তি তবু দাঁড়িয়েছিল। বলল—মা একা।

কল্যাণী বললেন—মৃন্ময়, তোর বাবা এক্ষুনি এসে পড়বে। তা সেই ভাল। মুক্তি, তুই যা ওঁর সাথে। ঈশ্বর যা করেন, তাই হবে। তুই এক্ষুনি বেরিয়ে পড়। —কি হল? তোর কি কোন কথা কানে যায় না!

কল্যাণীর অসহিষ্ণু গলা শুনেও মুক্তি ধীরে ধীরে নিজের মনে বলল—যাব? বেশ। তাই, চলুন। কিন্তু—

বিভাসবাবু বললেন—ওকি! শাড়ি টাড়ি পাল্টে এস। যত হোক শহরে যাচ্ছ!

মুক্তি একটা কথা ভাবতে ভাবতে বলল—কতক্ষণ লাগবে মনে হয় বিভাসবাবু?

বিভাসবাবু বললেন—কত আর! ঘণ্টা দু'তিন। আর ডাঃ মুখার্জির দেরি হয়, তবে আলাদা কথা। কি বৌদি!

কল্যাণী বললেন—সে কথা ঠিক ঠাকুরপো। ডাক্তার মানুষ। 'কল'

থাকতে পারে। কিন্তু মুখে যাই বলি না কেন ভাই আমারও ভয় করছে। আমি একা মেয়ে মানুষ থাকছি।

বিভাসবাবু সীতার দিকে তাকিয়ে বললেন—আরে, এখন আবার সুস্থ দেখছি একটু। একি ছুনিয়া ছাড়া অসুখ রে বাবা। এই গেল গেল, আবার এই ভাল!

মুক্তি বলল—মা, আমি যদি না গিয়ে একটা চিঠি লিখে দিই।

কল্যাণী রেগে উঠে বললেন—আচ্ছা, তোর কি হয়েছে বলত? এমন বিপদের সময়ও তোর পছন্দ অপছন্দ!

বিভাসবাবু বললেন—আসলে বৌদি, আমার সঙ্গে জীপে এই রাত্রে যেতেই ওর বোধহয় আপত্তি। বেশ, যা ভাল মনে হয় আপনারা করুন।

বিভাসবাবু রাগ করে বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে রইলেন।

মুক্তি মনে মনে ভাবল, দিদি এবার তাকে বড় কঠিন পরীক্ষায় ফেলছে। সেই কবরেজ দেখানো থেকে শুরু করে এই মৃত্যু সময় পর্যন্ত। সত্যি এই অন্ধকার রাত্রে বাইরে এখনও প্রবল ঝোড়ো বাতাস, তবে বৃষ্টি নেই। কিন্তু এসময় বিভাসবাবুর মত একজনের সঙ্গে জীপে যেতে তার ইচ্ছে করছে না। অথচ যদি সে না যায়, ডাঃ মুখার্জি যদি না আসেন এবং যদি দিদি আজ রাত্রেই 'এক্সপায়ার' করে তবে তার সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত অপরাধ তার ওপরেই পড়বে। সারা জীবন, সে অপরাধ থেকে, সে গ্লানি থেকে তার মুক্তি নেই। তার চেয়ে যা হয় হ'ক। যাওয়াই ভাল।

মুক্তি দ্রুত ঘরে গিয়ে শাড়ীটা পাল্টাল। ড্রয়ার খুলে জিনিসপত্র সব নিল। তারপর তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল—চলুন। —মা, তুমি, দিদির মাথায় ঐ তেলটা আবার মাখিয়ে জল দাও। বেশ করে জল দিয়ে মাথাটা মুছে দেবে।

—কিন্তু, বিভাসবাবু চলুন!

বিভাসবাবু একগাল হেসে বললেন—চল।

ঝড়ের শব্দের মধ্যে জীপ স্টার্ট নেবার বিশ্রী কর্কশ শব্দটা মিশে গেল।

একটু পরেই বিভাসবাবু গুন গুন করছিলেন। সুরটা একটা পরিচিত হিন্দী গানের। কলকাতায় প্রায়ই মাইকে এ গান শোনা যায়। গানটা অরুচিকর। মুক্তি-র ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল, এইমাত্র বিভাসবাবু তার বাড়িতে দিদিকে মৃত্যু শয্যায় দেখে এসেছেন। তারই বোন অসহায় অবস্থায় জীপে বসে আছে। এখন তার মন ভীষণ খারাপ। অথচ তারি সামনে এমন বিশ্রী গান। এ কেমন মানুষ! বোধ হয় এঁর হৃদয় বলে কোন কিছু নেই। এদেরই বিংশ শতাব্দীর কৃতী মানুষ বলে বোধ হয়। হৃদয় হীনতাই এদের বড় কোয়ালিফিকেশন।

মুক্তি অবশ্য বিভাসবাবুকে ভালভাবে চেনে না। মানে, যে চেনাকে প্রকৃত চেনা বলে। সেবার ইলেকশানের সময় থেকেই বিভাসবাবুর আবির্ভাব। নির্বাচনে জেতার জন্য বাবাকে খুব খুশি করতেন, তোয়াজ করতেন। দুহাতে টাকা ছড়াতেন কর্মীদের মধ্যে। দেখতে দেখতে নেতা হয়ে গেলেন বিভাসবাবু। এই পয়সার জোরে জেলার নেতাও হলেন।

বিভাসবাবু বললেন—মুক্তি সরে এসে ভাল হয়ে বোসো। পড়ে যাবে যে।

মুক্তি সরে এল না। বলল—না, জায়গা আছে।

—ডাঃ মুখার্জির চেম্বার কখন বন্ধ হয়?

—শুনেছি রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিভাসবাবু খুশি হয়ে বললেন—তবে ঠিক আছে।

মুক্তি বুঝতে পারল না কি ঠিক আছে। তাই মনে তার একটু সন্দেহ হল। বিভাসবাবুর অন্য কোন মতলব নেইতো।

রাস্তায় লোকজন কোথাও নেই। একে রাত্রি তার ওপর প্রচণ্ড কালবৈশাখীর ঝড়।

কোন বাড়ির আলো চোখে পড়ে না। শুধু জীপের আলো রাস্তায় পড়েছে। ইঞ্জিনের শব্দটা একটা বীভৎস গর্জনের মত শোনাচ্ছে।

বিভাসবাবু বললেন—দূর শালা, যে হাওয়া—জীপটা উল্টেফুল্টে দেবে নাকি!

মুক্তি বলল—পীচ রাস্তায় পড়তে আর বেশি বাকি নেই।

—অন্তত দু-তিন মাইল তো বটেই।

মুক্তি বলল—তা হোক, আস্তে আস্তে চলুন।

বিভাসবাবু বললেন—তোমার দেরি হয়ে যাবে। আমাকে আবার নরঘাট বাংলোয় গিয়ে জিনিসপত্র নিতে হবে। ওখানে আমার বডিগার্ডও ওয়েট করছে!

—মুক্তি বলল—পুলিশের?

—না না, পার্সোনাল।

মুক্তির মনে ভয় ধরে গেল। এঁর বডিগার্ড যদি এঁরই মত হয়। তার মনে হ'ল সামনে সত্যি বিপদ! নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করতে লাগল মুক্তি। বলল—জীপে তেল আছে তো!

অর্থাৎ বাংলো থেকে জিনিসপত্র নেবার মধ্যে যদি তেল নিতে হয়, তাহলে যেতেই হবে। আর তেল যদি না হয়, তবে বিভাসবাবুকে বাংলো পর্যন্ত যেতে বারণ করতে হবে। না শুনলে বাধা দিতে হবে। এই ঝড়ের রাত্রে, ঐ নির্জন বাংলোর কথা ভাবতেই কেন যেন তার ভয়টা আরো বাড়ল।

মুক্তি অভিনয় করতে লাগল। পুরো পজিশানটা তাকে জানতে হবে। বলল—আপনার বডিগার্ডকে ওখানে রেখে এলেন কেন বিভাসবাবু!

বিভাসবাবু বললেন—কেন আর! মালটাল খাবে, একটু ফুর্তিটুর্তি করবে। আমার সঙ্গে থাকলে অসুবিধে হয়। আর তাছাড়া বিজয়দার রাজ্যে আমার ভয় নেই। ওঁর বাড়ি যেতে যদি বডিগার্ড নিয়ে যেতে হয় তাহলেই হয়েছে, আর—

মুক্তি বলল—আর কি?

—আর কি জানো, বডিগার্ড নিয়েতো চিরকাল চলতে পারব না। আমাকে কমনম্যান হতেই হবে। কবে এম. এল. এ. ছিলাম, এখনও গায়ে গন্ধটা আছে! আর থাকবে না।

ভি. আই পি. গিরি আর কদ্দিন চলবে বল? এবার তো ওয়ার্কাররা আমাকে নমিনেশান না দেবার পক্ষে। না হয় গতবার হেরে গেলাম। তা

ব্যাটারা কত খেয়েছে আমার পয়সায়, কত কিছু বাগিয়েছে। এখন আমাকেই ব্যাম্বু দিতে চায়। আমি সে মিটিঙে ছিলাম না, দিল্লী গেছলাম। তা ছ্যাখো, ঐসব বডিগার্ড-ফার্ড নিয়ে চললে পাবলিক রিঅ্যাকশান বড় খারাপ হয়। বুঝলে না? ইস্, দেখছি জীপটা বড্ড ভোগাচ্ছে।

মুক্তি মনে মনে একটা ছক কষে নিল। এই রাত্রে, নির্জন বাংলো, হয়ত মাতাল বডিগার্ড। সেও প্রভুর মত হতে পারে! অন্তত প্রভুর রক্ষকতো সে বটেই। কাজেই যদি কিছু হয়, তবে মুক্তিকে তুজনের সঙ্গে লড়তে হবে। তারচেয়ে বাংলোয় যাওয়া বন্ধ করাই তার এখন একমাত্র কাজ হবে। এইটাই একমাত্র স্ট্রাটেজী। আশ্চর্য! দিদির অসুখ নিয়ে কি যে কাণ্ড ঘটছে। বিশেষ করে প্রথম থেকে এই বিভাসবাবুকে কেন্দ্র করে!

বিভাসবাবু হঠাৎ বড় অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করলেন। মুক্তির ডান কাঁধে হাত রেখে বললেন—দিদির জন্য মন খারাপ করছে? কিছু ভেবনা, আমি আছি। আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। ডাক্তার শুধু এই ক্রাইসিসটা কাটিয়ে দিক। ব্যস্, কালই সোজা কলকাতা। তেমন তেমন দেখলে, হেল্থ ডিপার্টমেণ্টকে ধরে কোন ভাল হসপিট্যালে একটা সিট পেতে কতক্ষণ। কি? তুমি দিদির সঙ্গে যাবে তো? ছ্যাখো, তুমি গেলেই ভাল। বুঝলে? কলকাতা শহর। কোথায় কি দরকার হয়, কখন কোথায় কার কাছে যেতে হয়। ওষুধপত্র কেনা, হাজার রকমের কাজ।

মুক্তি বিভাসবাবুর হাতটা সরাতে গিয়ে দেখল, এই মোটা মোটা আঙুলগুলোয় শক্তি আছে। স্টীয়ারিং ধরা হাতটাও বড় মজবুত। মোটা রিস্ট। লোকটার গায়েও বোধহয় অসুরের মত জোর। তা হলে? মুক্তি স্থিরভাবে ভাবতে লাগল। যদি আক্রমণ হয়, তবে তার আত্মরক্ষার উপায় কি হবে!

এখন গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে এসেছে ওরা। ঝড়টাও একটু কম। বা গ্রামের গাছপালার আড়াল হয়েছে বলে একটু কম মনে হচ্ছে। জীপের গতিও বাড়ছে ক্রমশ। বিভাসবাবুর মন মেজাজও ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে।

কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দেবার পর এবার বিভাসবাবু মুক্তির ডান থাই-এর ওপর হাত রেখে একটু যেন আদর করতে লাগল। —আঃ, কী এক্সেলেণ্ট ফিগার তোমার মাইরি। আমি শহরটহর কম দেখিনি। কিন্তু জানলে মুক্তি, এই তোমার মত এমন বিউটিফুল, এমন তেজি, এমন খাপ-খোলা তলোয়ারের মত চোখ ঝলসানো রূপ, মাইরি বলছি, আর কোথাও দেখিনি। সরে এসোনা একটু! আমি বাঘ না ভালুক!

মুক্তি খিল খিল করে হেসে উঠে বলল—খাপখোলা তলোয়ারের মত রূপটাই দেখলেন, বিভাসবাবু। তলোয়ারের ধারটাতো দেখেননি।

বিভাসবাবু এতক্ষণে ভীষণ খুশি। মুক্তি কি সুন্দর করে হাসছে। মুখে শিস্ দিতে দিতে থাই-টায় আরো জোরে চাপ দিতে লাগলেন। মুক্তির অসহ্য লাগছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে ওর হাতটা মুচড়ে দুমড়ে ওকে জীপ থেকে এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে দেয়। কিন্তু তাতে শুধু একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হবে তা নয়, দিদির জন্য ডাক্তার নিয়ে যাওয়ার আশাও নির্মূল হয়ে যাবে। তার চেয়ে ওকে ভুলিয়ে কোনভাবে তমলুক পর্যন্ত যদি যাওয়া যায়। ফিরবে না হয় ট্যাক্সি করে।

না লোকটার হাত ক্রমশ উদ্ধত হয়ে উঠছে, বর্বর হয়ে উঠছে। উঃ কী অসহ্য এই আচরণ। অন্ধকারে জীপটাও এখন জোরে ছুটে চলেছে। মুক্তি আরো সরে এলো, যাতে ওর হাতটার নাগাল না আসে। কিন্তু সে আর কতটুকু।

মুক্তি হঠাৎ গম্ভীর গলায় একটা ধমক দিল—একি হচ্ছে আপনার! হাতটা সরান।

বিভাস হো হো করে হেসে উঠল।—মাইরি কি এক্সেলেণ্ট নাইট। মেঘে মেঘে শালা, দুনিয়াটা ঢেকে গেছে। আঃ, মাল থাকলে যা জমত। ব্যাটা বডিগার্ডটার ধেনো হলেই চলে। আমার আবার একটু ফরেন মাল চাই।

মুক্তি মনে মনে এ্যাকশানের জন্য তৈরি হতে লাগল।

এই মুহূর্তে নিজের অন্তরে কার কণ্ঠস্বর সে শুনছে। "তুই সেই শক্তির অংশ, তুমি সেই জননীর অংশ। নিজেকে জানো, নিজেকে চেনো।" কথাটা

মনে হতেই মুক্তি একটা প্রচণ্ড শক্তি, প্রচণ্ড বিশ্বাস পেল। শক্ত গলায় বলল—ভদ্রভাবে কথা বলুন বিভাসবাবু।

এর মধ্যে জীপটা হঠাৎ একটা মোড় নিতেই মুক্তি চমকে উঠল। সে বুঝতে পারল এখন জীপটা বাংলোর দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে।

মুক্তি নিজের বিপদ সম্পর্কে এবার আরো সচেতন হল। বুঝতে পারল তার আক্রমণ করার সময় এসেছে। কড়া গলায় বলল—বাংলোয় যাওয়া চলবেনা। বিভাসবাবু। জীপ থামান।

বিভাসবাবুও বোধহয়, এতক্ষণে বুঝেছে, মুক্তি বড় সোজা মেয়ে নয়। ওর সারা শরীরে এখন প্রতিবাদ ফুটে উঠছে, জ্বলছে! ভয় দেখাবার জন্য কড়া গলায় বলল—জীপ থামবেনা।

—দেখুন বিভাসবাবু, বাংলোয় যাবার আপনার কোন দরকার নেই। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেও আপনি যেতে পারেন।

বিভাসবাবু বলল—না, দেরি হয়ে যাবে।

—তবে আমাকে নামিয়ে দিন। আমি হেঁটে গিয়ে বাস ধরব।

—বলেছি, জীপ থামবে না।

মুক্তি মুহূর্তের মধ্যে দেখে নিল, রাস্তাটার পজিশান কি।

তারপর স্থির গলায় বলল—চিৎকার করে লোক জড় করার মেয়ে আমি নই বিভাসবাবু। মনে রাখবেন, আত্মরক্ষা করতে আমি জানি, আমি পারি।

বিভাসবাবু হেসে উঠলেন।—আত্মরক্ষা? হা-হা-হা, আমাদের গায়ে, মুক্তি ভীষণ শক্ত বর্ম আঁটা থাকে। তুমি জাননা। তার চেয়ে বাংলোয় চল। 'লেট আস এনজয়।' তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। ডাঃ মুখার্জীকে আমি জীপে তুলে তোমাকে ঠিক ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দেব। ব্যস্, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

মুক্তি কথা বলতে পারছে না, এতো উত্তেজনা। তবু কোনভাবে বলল—এখনো বলছি জীপ থামান।

বিভাস কোন গ্রাহ্য করল না। জীপটা দ্রুত ছুটে চলছে।

মুক্তি শুধু রাস্তার পজিশানটা দেখছিল। হ্যাঁ, ঐ, ঐতো একটু দূরে

রাস্তার পাশে একটা প্রকাণ্ড শিরীষ গাছ। মুক্তির প্ল্যান রেডি। যে কোন ভাবেই হোক্, জীপটা যেন ঐ গাছে ধাক্কা লাগে। তার আগেই মুক্তি লাফ মেরে পড়ে যাবে। জীপ চুরমার হোক্, বিভাসবাবু মরুক—যা হবার হোক, এই তার শেষ মার।

মুক্তি এবার ধমক দিয়ে বলল—জীপ থামান, বলছি। বিভাসও বোধ হয় তৈরি হচ্ছিল। বলল—তোমার হুকুম!

মুক্তি আর সময় দিতে চায় না। ক্রমশ জায়গাটায় এসে পড়েছে। বলল—ইয়েস, মাই অর্ডার।

আর সেই মুহূর্তে দুহাতে স্টীয়ারিংটা প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরল। বিভাস্ ভয় পেয়ে জীপের স্পীড কমিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—মুক্তি ছাড় ছাড়, এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে।

—হোক্, মরব, মরব, তবু স্টীয়ারিং আমি ছাড়ব না, না, না!

বিভাস আর্তনাদ করল—সর্বনাশ, ব্রেক ফেল করছে। তুমি কি পাগল হলে। মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি—ইস্, এতো জোর তোমার গায়ে।

প্রচণ্ড রাগে, ক্ষোভে মুক্তির জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তখন। একরাশ ঘন দীর্ঘ চুলের উন্মত্ত বোঝা স্টীয়ারিং-এর ওপর এসে পড়েছে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে মুক্তি বলল—আমি মরব, মরব, তবু স্টীয়ারিং ছাড়ব না।

জীপটা গর্জন করতে করতে প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটার দিকে ছুটে চলেছে তখন।

॥ ২১ ॥

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিভাসবাবু তখন মরিয়া হয়ে শেষবারের মত স্টীয়ারিংটা মুক্তির হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। না, পারলেন না, কিছুতেই পারলেন না। একহাতে ঠিক সুবিধেও হচ্ছে না।

এখন জীপটা শিরীষ গাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। তার এধারে একটা গভীর পুকুর। তবু গাছে ধাক্কা লেগে বাঁচার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু পুকুরে পড়লে মৃত্যু আরও অবধারিত।

চরম আঘাত হানলেন বিভাসবাবু। দাঁতে দাঁত চেপে বাঁ হাতের সাঁড়াসীর মত আঙ্গুলগুলো দিয়ে মুক্তির টুঁটিটা সজোরে টিপে ধরলেন—মর মর, তবে তুইও মর।

মুক্তির আর ভাববার সময় নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মুক্তি স্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে ব্লাউজের ভেতর থেকে অস্ত্রটা বের করে।

বিভাসবাবু উদ্যত তীক্ষ্ণ ছোরাটা দেখে ভয়ে আঁতকে উঠলেন একবার। মুক্তি একটা তীব্র বিষাক্ত সাপের মত দীর্ঘ ফণা তুলে তখন ফুঁসছে। নিঃশ্বাস তখন যেন গর্জন! হ্যাঁ, ঐ হাতটা, ঐ হাতটা তার থাই চেপে ধরছিল। ঐ হাতটা তার সর্বাপেক্ষা—।

—আঃ! একটা আর্তনাদ! আর সেই আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই জীপটা শিরীষ গাছে গিয়ে একটা ধাক্কা খেয়ে গুমরাতে গুমরাতে থেমে গেল।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতা মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর, ভয়ংকর। মুক্তি জীপ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। দেখল বিভাসবাবু ছিটকে পড়েছে একদিকে। জীপটার সামনেটা শুধু ভেঙে চুরে থেবড়ে গেছে। আর কিছু হয়নি।

বিভাসবাবুর দামী টেরিলিনের সার্টটার হাতা তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল তখন।

আর্তনাদ, জীপের শব্দ—এসব শুনে কয়েকজন লোক দৌড়ে এল। অন্ধকারে মুক্তি কাউকে চিনতে পারছিল না। শুধু আবছা দেখছিল, ওদের কারুর মাথায় ঝুড়ি, কোদাল, বিছানাপত্র।

একটা আলো নিয়ে পাশের বাড়ি থেকে দৌড়ে এলো একজন—মুক্তিদি, তুমি! এই রাত্রির বেলা।

মুক্তি চিনল। অনন্ত। মাটি কাটার কাজ হয়নি বলেই ওরা গ্রামে

ফিরছিল।

মুক্তি বলল—আগে ওকে ধরে তোলো জল্‌দি।

অনন্ত বলল—এ বাবু তো এম. এল. এ থাইল। কাই লাগছে?

—হাতে।

—তুমার লাগেনি, মুক্তিদি?

—পায়ে একটু লেগেছে, সে কিছু নয়।

ওরা তাড়াতাড়ি ঝুড়ি কোদাল নামিয়ে বিভাসবাবুকে তুলে ধরল।

বিভাস আস্তে আস্তে বলল—ছেড়ে দাও। দাঁড়াতে পারব।

অনন্ত বলল—কি রক্ত মুক্তিদি!

মুক্তি শান্ত গলায় বলল—অনেক দূষিত রক্ত জমা হয়েছিল। তা তোমরা চলে এলে যে!

অনন্ত বলল—বৃষ্টি নামছে। চাষ করব এবার। কাল সকালনু লাঙল করতে নামব। বাড়ির সব ভাল? সীতাদি ভাল হইচে?

মুক্তি এতক্ষণ পরে, আবার সেই দৃশ্যে ফিরে গেল। সীতা শুয়ে আছে—মুমূর্ষু।

ঝড় থেমে গেছে কখন। হাওয়ার গতি পাল্টেছে। আকাশ কিন্তু তখনও ঘন মেঘে আচ্ছন্ন!

দূর থেকে একটা সাইকেলের ঘন্টির শব্দ ভেসে আসছিল। অন্ধকারে আরোহীকে চেনা যাচ্ছিল না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল। কেউ অত্যন্ত স্পীডে সাইকেল চালিয়ে এদিকে আসছে!

মুক্তির মন বলছিল মৃন্ময়দা, মৃন্ময়দা আসছে। তবে কি দিদি—

মুক্তি দৌড়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু পায়ে এখন বেশ লাগছে। মৃন্ময় জোরে ব্রেক কষে নামতেই মুক্তি চিৎকার করে কেঁদে উঠল। —মৃন্ময়দা! দিদি!

মৃন্ময় হতবাক। বলল—কাঁদছ কেন? সীতা ভাল আছে। এইমাত্র কথা বলল! ক্রাইসিস ওভার। কবরেজ এসে দেখে গেছেন। কিন্তু এটা কি হ'ল! এ্যাক্সিডেণ্ট! হঠাৎ! এমন পরিষ্কার চওড়া রাস্তায়!

মুক্তি জীবনে এত আনন্দ কখনও পায়নি। এই মুহূর্তে মৃন্ময়দাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে ভীষণ করছিল তার! কিন্তু উচ্ছ্বাসকে সংযত করতে সে জানে। শুধু শান্ত গলায় বলল—হ্যাঁ; এ্যাক্সিডেণ্ট! তুমি বিভাসবাবুকে এক্ষুণি একটা রিক্সা ডেকে নরঘাট বাংলোয় পাঠিয়ে দাও!

মৃন্ময় এগিয়ে গিয়ে বলল—কোথায় লেগেছে বিভাসবাবু?

বিভাসবাবু শুধু হাত দিয়ে দেখালেন, বুকে। আর কোথাও নয়।

মৃন্ময় বলল—অনন্ত, এখানে কোন ডাক্তার আছে?

অনন্ত বলল—না মিনুবাবু, সেই নরঘাটে!

মুক্তি বলল—ওঁকে বাংলোতে পাঠিয়ে দাও মৃন্ময়দা। আঘাত সীরিয়াস কিছু নয়। মেণ্টাল জার্কটাই বেশি লেগেছে।

বিভাসবাবুকে নিয়ে সাইকেল রিক্সাটা চলে যেতে মৃন্ময় বলল—জীপটা একটু লক্ষ্য রাখা দরকার।

মুক্তি বলল—তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না, মৃন্ময়দা। ওঁর বডিগার্ড বাংলোয় আছে! এসে সব ব্যবস্থা করবে। চল বাড়ি যাই।—আচ্ছা অনন্ত, কাল যে মাঠে নামবে বলছ, কিন্তু সাঁকোটা যে ভাঙা। তা জানো? পারাপার হবে কি করে?

অনন্ত বলল—এ্যাই হরিপদ, কুঞ্জ, জগন্নাথ, পরেশকা, কি করবুরে! এক রাইতের মধ্যে সাঁকো সারিতে পারবু!

হরিপদ বলল—বাঁশ, দড়ি পাইলে। বেশ পারব। পারবনি কেন।

মুক্তি বলল—বাবা কিছু কিছু সংগ্রহ করে রেখেছে বোধহয়। এক কাজ কর, বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে, বিশ্রাম করে সবাই চলে এসো। ইস্ কী মেঘ! ভীষণ বৃষ্টি আসবে!

অনন্ত বলল—মেঘ কি গো, মুক্তিদি, বৃষ্টি পড়ছে। বড় বড় ফোঁটা! হরিপদ, আরে এক বর্ষায় জমিতে বতর। চল্ চল্!

মৃন্ময় বলল—তোমরা চলে যাও, অনন্ত। কদ্দূর থেকে এলে।

অনন্ত বলল—মিনুবাবু, সেই গেঁওখালি। ইটামগরার স্লুইস গেটমু হাঁট্যা হাঁট্যা আসসি। পয়সা কাই বাস-এ আইসব। খাইতে জুটছেনি

ক'দ্দিন!! দেশের মাটি কামড়ি পড়্যা রইব, বাবু! চাষ করব, মাঠে খাটব। আর কক্ষনো বিদেশে যা৺নি।

অনন্ত, জগন্নাথ, বুঞ্জু, পরেশকা সবাই খুশি হয়ে ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে চলে গেল!

হরিপদ মৃন্ময়ের সাইকেলটা নিয়ে গেল। পাশে কারুর বাড়ীতে রেখে যাবে। ভোরে এসে নিয়ে গেলেই হবে।

মুক্তি চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। এখন বৃষ্টি হচ্ছে। আঃ, কী আনন্দ ওদের! বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি-ই জীবন। তার মনে হ'ল, অনন্ত, হরিপদ—ওদের এ ফিরে আসা শুধু নয়, আবার মাটির কাছে, শস্যের কাছে, জীবনের কাছে ওদের প্রত্যাবর্তন, যে জীবন ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গ্রামে ছড়িয়ে আছে।

ইস্, এতোক্ষণ সে খেয়াল করেনি, বৃষ্টিতে খদ্দরের শাড়ীটা ভিজে উঠছে। মৃন্ময় কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে বলল—কি? যাবে না?

মৃন্ময় কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বলল—যাবো। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে।

মুক্তি হাসল। বলল—কেন?

—তোমার শাড়ীটা ছেঁড়া। তাতেও রক্ত ছিটানো। কি ব্যাপার?

মুক্তি বলল—সব ব্যাপার বৃষ্টিতে তক্ষুণি ধুয়ে যাবে। তুমি চল। আমাকে ধর একটু।

মুক্তি হাতটা বাড়িয়ে দিল মৃন্ময়ের দিকে।

মৃন্ময় শুধু কেঁপে উঠল একটু।

মুক্তি হেসে বলল—তুমি বড্ড ভীরু! এই বৃষ্টির উৎসবের মধ্যে মুক্তি আরো একটা মহৎ উৎসবের কোলাহল শুনতে পাচ্ছে, সমরের মধ্যে যে উৎসবের গান সে কখনো শোনে নি। ভালবাসা এখন পরিণত শস্যের মত নম্র, নত। সেখানে ভবিষ্যতের বীজ কুমারসম্ভবের মত রচিত হতে চাচ্ছে। সে প্রতীক্ষা কত কালের, কত বর্ষা ও বসন্তের কত অনিদ্রিত রজনীর। কী অমৃত যন্ত্রণা সে প্রতীক্ষার!

মুক্তি এক অনাস্বাদিত আনন্দের মধ্যে, সমস্ত প্রকৃতির বাণী কান পেতে শুনছে এখন। এই অন্ধকার মেঘে-ঢাকা বিস্তীর্ণ আকাশ তার সাক্ষী, বৎসরের এই প্রথম বৃষ্টি তার সাক্ষী, এই পথের মাঠের নদীতীরের ভেজামাটি তার সাক্ষী। সে এই রাত্রে তার পরিস্নাত শরীরের সব সম্পদ, সব রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, একজনের কাছে নির্জনে, নিঃশব্দে নিঃশেষে নিবেদন করার জন্য উৎসুক।

মুক্তি তখন কাঁপছিল। আশ্চর্য! ভালবাসার মধ্যে এতো আনন্দ, অথচ এতো ভয়, এতো দুঃখ, এতো লজ্জা!

মৃন্ময় একটু পরে বলল—মুক্তি, তুমি কি হাঁটতে পারবে?

মুক্তি হাসল। বলল—কেন?

—তোমার পায়ে লেগেছে যে!

মুক্তি মৃন্ময়ের কাঁধের ওপর হাত রেখে, একটু ভর দিয়ে বলল—কোথাও লাগেনি, চল। আস্তে আস্তে, একটু আশ্রম হয়ে যাই। স্বামীজীকে বলে যাই, তাঁর কথাই সত্য হয়েছে। দিদি ভাল আছে। আর ভয় নেই। —এ্যাই, সেদিন রাত্রে স্বামীজীকে কি রকম দেখেছিলাম, জানো?

মৃন্ময় একটু অবাক হয়ে বলল—কি রকম দেখেছিলে?

মুক্তি বলল—না, থাক্।

ওরা এতক্ষণে সেই নদী তীরের কাছাকাছি এসে পড়ল। এখান থেকে আশ্রম দূর নয়। গ্রামগুলো এখন একেবারে নিঃশব্দ। বিস্তীর্ণ মাঠের বুক থেকে প্রথম বৃষ্টিতে ভেজা মাটির, সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। সে গন্ধ আর কোথাও ওঠেনা। মাতৃত্বের মত বড়ো পবিত্র সে গন্ধ। এই ভেজা মাটিতেই অনন্ত, হরিপদ, জগন্নাথ, পরেশকাকা কাল চাষ করতে নামবে।

মুক্তি খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল।

মৃন্ময় বলল—আমার ওপর ভালো করে ভর দিয়ে হাঁট।

মুক্তি হেসে বলল—তুমি ভর নিতে পারবে?

—কেন?

—তুমি যে বড় উদাসীন মৃন্ময়দা। মানে, তোমার রক্তে একজন সন্ন্যাসী ঘুমিয়ে আছে কিনা। তাই ভয় হয়।

মৃন্ময় চুপ করে থাকল। একটু পরে বলল—ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বৈরাগ্য, মুক্তি। ইতিহাসের আদিম যুগের সেই সিন্ধু নদীর তীর থেকে যখন যাত্রা শুরু, তখন থেকেই। সে জানে বৈরাগ্যই জীবনের সৌন্দর্য, আর দুঃখই তার জ্ঞান।

মৃন্ময়ের কথাগুলো সংগীতের মত বেজে উঠল বলে মুক্তির মনে হল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সে। এক সময় আস্তে আস্তে বলল—শব্দ শুনছ!

—কিসের শব্দ ?

—বাতাসের, বৃষ্টির, নদীর!

মৃন্ময় কপাল থেকে ভিজে চুলগুলো সরিয়ে বলল—আশ্রমে গিয়ে বসে যাব একটু। বৃষ্টিটা বড় জোর আসছে।

মুক্তি খুশি হয়ে বলল—বেশ। স্বামীজী দুজনকে দেখে খুশি হবেন। দ্যাখো, কাল আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।

মৃন্ময় বলল—কি ?

—স্বামীজী চেয়েছিলেন।

মৃন্ময় বলল—কি চেয়েছিলেন ?

মুক্তি হেসে আঁচল দিয়ে ভিজে মুখটা মুছে বলল—কিচ্ছুনা। চল। আচ্ছা তোমার ভিজতে ভাল লাগছে না ?

মৃন্ময় বলল—সত্যি ভাল লাগছে। রাস্তায়ও খুব কাদা হয়নি। সব জল শুষে নিচ্ছে মাটি। তোমার ?

মুক্তি বলল—তোমার সঙ্গে ভিজছি, তাই ভীষণ ভাল লাগছে। দ্যাখো মাটিরও পিপাসা আছে। আচ্ছা কোথায় এলাম আমরা ?

মৃন্ময় বলল—ওই তো নদী ধার, নদী দেখা যাচ্ছে। ওখানে উঠলে আর বেশি কষ্ট হবে না তোমার। রাস্তাটা ভাল পড়বে। আশ্রম ঐ দূরে। একটা ক্ষীণ আলো দেখছো না!

মুক্তি আর মৃন্ময় নদীতীর ধরে এখন হাঁটছিল। এখন জোয়ার। এক বৃষ্টিতেই নদী ভরে গেছে যেন। এই নদীর তীর ধরে উত্তরে গেলেই সেই

জায়গাটা পড়বে যেখান থেকে সমরদা আর মুক্তি চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। মুক্তির আশ্চর্য লাগে, এই আনন্দের মধ্যে একটা গভীর বিষাদ, তার জীবনকে মাঝে মাঝে উদাসীন করছে কেন!

মুক্তি নদীর দিকে তাকাল। হলদী নদী থেকে এই শাখা নদীতে এখন স্রোত আসছে। হলদী নদীতে স্রোত আসছে সমুদ্র থেকে। সমুদ্রই সেই উৎস—যেখান থেকে সব স্রোতের জন্ম। আবার সব স্রোতের নিঃশব্দ মৃত্যু। বোধহয়, আত্মাও এমনি কোন সমুদ্র থেকে আসে। তারপর শাখানদীর মত জীবাত্মার রূপ নেয়। শেষে একদিন—। না, মৃত্যুর কথা থাক্। এখন জীবন! শস্যের মত অজস্র সবুজ জীবন, অনন্ত জীবন! মুক্তি মৃন্ময়ের বড়ো কাছে দাঁড়িয়ে এই রাত্রির, এই প্রান্তর, এই আকাশের নৈঃশব্দের প্রার্থনার মধ্যে সেই অনন্ত জীবনের কোলাহলই কান পেতে শুনতে লাগল! বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। বাতাস তখন নিথর। অন্ধকার পার হয়ে জ্যোৎস্নার আলো বোধহয় এখন সারা পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে।

মৃন্ময় বলল—হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে? আমরা তো আশ্রমে এসে গেলাম!

বাঁশের গেটটা খুলে ভেতরে যাওয়ার জন্য তাকাতেই মুক্তির গা-টা শিউরে উঠল। এই মুহূর্তে একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখল সে। মৃন্ময়কেও ডাকল। মৃন্ময়ও দেখল।

মুক্তি আস্তে আস্তে বলল—যাবে? না ফিরবে?

মৃন্ময় চাপা গলায় বলল—যাব। ভেতরে নয়, বাইরে বসে থাকব শুধু।

—বেশ।

মুক্তি, মৃন্ময় নিঃশব্দে আশ্রমের বারান্দায় বসল। জল পড়ে এখানে ওখানে মাটি ভিজে গেছে! চারিধারে গভীর অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। এই মুহূর্তে এই আশ্রমটাকে কেমন অতীন্দ্রিয় জগতের ছবি বলে মনে হয়। যেন বাস্তব সত্য নয়!

স্বামীজী একটু আগে হোম করে ছিলেন বোধহয়। কয়েকটা কাঠের ভস্মাবশেষ তখনও পড়ে আছে। তখনও ঘৃতাহুতির পবিত্র গন্ধ বাতাসে।

মৃন্ময় ভেজা গলায় বলল—বাবা কালই এখান থেকে চলে যাবে মুক্তি,

আর কখনো ফিরে আসবে না।

মুক্তি জানত। মুক্তি বুঝতে পেরেছিল সবই। তবু বলল—কেন, মৃন্ময়দা!

মৃন্ময় বলল—আজ রাত্রেই সন্ন্যাস নিলেন। নেবার আগে হোম করতে হয় তো! ঐ দেখছ না! বাবা আর তাঁর গুরু, ঐ সন্ন্যাসী, তখন ধ্যান করছেন! সামনে হোমের কুণ্ড, আধপোড়া কাঠ!

মুক্তি বলল—হোম কেন?

মৃন্ময় বলল—সন্ন্যাস নেবার আগে কিছু কিছু ক্রিয়া আছে। আর ঐ অগ্নি, এখন ঈশ্বরের প্রতীক।

মুক্তির মনে পড়ল সেই প্রমিথিউসের কথা। কিন্তু সে অগ্নি মানুষের জন্য। আর ঐ হোমের অগ্নি মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ে যাবার জন্য। অর্থাৎ সমাজ ছেড়ে, সংসার ছেড়ে চিরদিনের বিদায়ের জন্য।

দুটির মধ্যে কী অসীম ব্যবধান!

মুক্তি বলল—অগ্নি ঈশ্বরের প্রতীক?

মৃন্ময়ের গলাটা বড় ভারি মনে হল। বলল—এই পবিত্র অগ্নিতে, এই সকল আমি, এই সকল পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, পার্থিব দেহ মন, পার্থিব যা-কিছু সব আহুতি দিতে হয়। সন্ন্যাস নেবার আগে, স্বেচ্ছায় এই সব কিছু ত্যাগ করার, ছেড়ে যাবার এটাই সর্বশেষ অনুষ্ঠান।

মুক্তি ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু সে দেখল মৃন্ময়দা একদৃষ্টে সেই নির্বাপিত হোমাগ্নি, ধ্যানমগ্ন স্বামীজী ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে আছে।

আশ্রমের চারধারে তখন যে নিদ্রাহীন নির্জনতা জেগে জেগে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে আছে, সে নির্জনতায় শুধু রাত্রির পবিত্র বিষাদ জড়ানো। সে নির্জনতার ভাষা আজও পৃথিবীতে রচিত হয়নি। সে নির্জনতা শুধু কখনো কখনো মন্ত্র হয়ে ওঠে জীবনের!

মুক্তি খুব আস্তে আস্তে বলল – এবার তাহলে স্বামীজী—

মৃন্ময় বলল—এবার থেকে উনি স্বামীজী নন। উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। পৃথিবীতে এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আমিও তার ছেলে নই। পৃথিবীতে কোথাও তাঁর কেউ নেই, কিছু নেই। সম্পদ নয়, সঞ্চয় নয়, শুধু সব মানুষের জন্য,

সর্ব জীবের জন্য ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই!

মুক্তি বলল—মৃন্ময়দা সে তো শুধু শূন্যতা!

মৃন্ময় বলল—না, ওর কাছে সেইটাই পরিপূর্ণতা। ওঁর আত্মা, তখ
পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম। এবার ওঁর এই জীবনেই নবজন্ম ঘটে গেল।

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে ততক্ষণে। মুক্তিও একদৃষ্টে দেখছিল
এখনও তুজন ধ্যানমগ্ন। মাঝে মাঝে হোমাগ্নির ওপর থেকে ছাইগুলো বাতা
উড়ে গেলে জায়গাটা ক্ষণিকের জন্য মৃত্যু আলোকিত হয়ে ওঠে। তাতে আর
স্পষ্ট হয়।

অনেকক্ষণ পরে মুক্তি বলল—স্বামীজীর সেই সাদা বহির্বাস, সাদ
উত্তরীয় আর নেই তো! এ যে সব গেরুয়া এখন!

মৃন্ময় বলল—ওটা এক ধরনের মাটির রং। ভারতবর্ষের চিরদিনে
বৈরাগ্য, ঐ রঙের ভাষায়। জানো মুক্তি, এই গেরুয়া বহির্বাস উত্তরীয় ব
দিচ্ছে, বাবার পার্থিব জীবনের মৃত্যু হয়ে গেছে!

মুক্তি বলল—বাঃ, উনি তো বেঁচে আছেন!

—না, এ বাঁচার কথা বলছি না। আমাদের নিয়ে যে জীবন, সে জীবনে
মৃত্যু হয়ে গেছে। নতুন জীবন পেলেন প্রার্থিত আত্মার মধ্যে। এখন শু
আছে পথ, আছে কোন অজানা গ্রামের কোন দরিদ্র কুটিরের কাছে দাঁড়ি
শুধু বলা—'নমো নারায়ণ।' যে গৃহী যা পারে ভিক্ষে দেবে! দিনের শে
সেই ভিক্ষায় যা আসবে তাই দিয়ে ক্ষুধা মেটানো। শুধু বেঁচে থাকার জ
সবচেয়ে কম যা প্রয়োজন! বা এক কথায় একেই বলে মৃত্যুর সাধনা, মৃত্যু
তপস্যা। এমনি করে একদিন কোন অজানা গ্রাম, কুটির বা অজানা নদ
তীরের কাছে ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা! পৃথিবীর বায়ু থে
শেষবারের মত নিঃশ্বাস গ্রহণ করা, শেষবারের মত পৃথিবীর আলো
চেয়ে দেখা!

মুক্তি আস্তে আস্তে করুণ গলায় বলল—একি! মৃন্ময়দা তুমি কাঁদছো
কথাটা বলতে গিয়েই মুক্তির চোখও জলে ভরে এল! তার মনে পড়ছি
স্বামীজীর সেই বিপত্নীক জীবন। একমাত্র ছেলে মৃন্ময়কে নিয়ে কি ক

কেটেছিল তাঁর। সে সব শুনেছে মায়ের কাছে, বাবার কাছে। মৃন্ময়দা ছেলেবেলা থেকেই একা একা। সঙ্গী সাথীহীন জীবন। স্বামীজীও খুব একটা লক্ষ্য করতেন না। মৃন্ময়দা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে বুঝতে শিখল, চিনতে শিখল, আর ভালবাসল। সে ভালবাসার সেবার তুলনা হয় না। কিন্তু স্বামীজীর জীবনে তখন চলে যাবার আহ্বান এসেছে!

রাত্রি এখন কত! আকাশ তখন নির্মল জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ। বৃষ্টি থেমে গেছে, বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে এখন। মুক্তি শাড়ীটা ভাল করে জড়াল। হাওয়ায় এতক্ষণে কিছুটা শুকিয়েছে।

মুক্তি বলল—মৃন্ময়দা। চল আমরা যাই।

মৃন্ময় শুধু বলল—তাই চল। কি হবে এখানে থেকে।

ধ্যান থেকে জেগে উঠলেও, বাবা আমাকে চিনবে না। আমি তো এখন অনাত্মীয়! আমি আর ওঁর ছেলে নই, সাধারণ একটা মানুষ মাত্র!

মুক্তি মৃন্ময়ের হাত ধরে তুলল। তার বলতে ইচ্ছে করছিল, কিছু কিছু অলৌকিক জিনিস সে এই আশ্রমে এসে দেখেছে। দেখেছে সেদিন নিজের বাড়িতেও। কিছুই সে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আজ এই রাত্রিতে, এই ধ্যানমগ্ন রূপ দেখে তার মনে হল, সে সবই সত্য। আমাদের বাস্তব জ্ঞানের সীমা, তার পায়ের কাছ পর্যন্ত আজো পৌঁছয়নি।

মৃন্ময় ও মুক্তি দূর থেকে তাঁদের প্রণাম করে নিঃশব্দে নদীতীর ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

মৃন্ময় মুখ নিচু করে অন্যমনস্কভাবে কতক্ষণ হাঁটছিল। মুক্তি বুঝতে পারছিল, কী গভীর দুঃখ মৃন্ময়দাকে এখন স্তব্ধ করে তুলছে। কথাটা ভাবতে গিয়েই আবার চোখ ছল ছল করে উঠল মুক্তির। মুক্তি বলল—আমার হাতটা ধর, মৃন্ময়দা। তোমার পায়ে বড় হোঁচট লাগছে। ঠিকমত হাঁটতে পারছ না তুমি!

মৃন্ময় হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মুক্তি নিজের হাতে সে হাতটা তুলে নিয়ে আলতোভাবে চুম্বন করল। মৃন্ময়দা যেন এখন এক শিশু, মুক্তির আনন্দিত মাতৃত্বের কাছে সে হাত

পেতে আছে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাড়ি পৌঁছল।

বিজয়বাবু একটু অবাক হয়ে বললেন এত দেরি হল যে মুক্তি!

মুক্তি বলল—পায়ে একটু লেগেছিল। তা বাবা, অনন্তরা ফিরে এসেছে। আজ রাতেই সাঁকোটা সারবে বলেছে।

বিজয়বাবু বললেন—আমিও তাই ভাবছিলাম। কখন আসবে।

—আসবে একটু পরে। দিদি কি করছে?

—ঘুমুচ্ছে। ডাকিসনে! মৃন্ময়, অনেক রাত হয়েছে। আজ বাড়ি নাই বা গেলে?

মুক্তি বলল—ওকে যেতে দিচ্ছে কে! বাবা, জানো স্বামীজী কাল চলে যাবেন।

বিজয়বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুধু বললেন—জানি! শুধু আমি-ই পড়ে থাকব! যা তোরা খেয়ে নে।

কতরাত থেকে উঠে ওঁরা সাঁকোটা মেরামত করতে এসেছিল, মুক্তি জানে না। ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ভোর হওয়ার আগেই কল্যাণী ডাকলেন—মুক্তি উঠ্‌রে। ছাখ, ছাখ। আর কখনো দেখতে পাবিনে!

মুক্তি তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। বলল—মৃন্ময়দা তুমি ঘুমোও নি?

মৃন্ময় শুধু বলল—না।

—বাঃ, কেন?

—ওরা সাঁকো সারাতে এল। ঘুম আসছিল না। আমিও তাই লেগে গেলাম। হয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

মুক্তি বুঝতে পারল, আসল কথা তা নয়। ও জেগে আছে, খুব ভোরে স্বামীজীকে শেষবারের মত দেখবে বলে।

সাঁকো বেঁধে সবাই চলে গেছে। মৃন্ময় আর মুক্তি সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল। এই মাত্র ভোর হ'ল। রোদ এখনও ওঠেনি। আকাশ মেঘমুক্ত নির্মল।

নদীতে এখন ভাঁটা। স্রোত এখন হলদী নদীতে পড়ে সমুদ্রের দিকে চলে যাবে, যে সমুদ্র কত যুগ যুগ ধরে পরমাত্মার প্রতীক!

মৃন্ময় আশ্রমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। মুক্তিও দেখল, দুজন মানুষ আশ্রম থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। একবারও পেছনে তাকালেন না। কারণ পেছনের সব কিছু ওঁরা ফেলে এসেছেন। আগের সন্ন্যাসীর হাতে ত্রিশূল, কমণ্ডলু। পেছনে স্বামীজী। এখন তাঁর পরণে গেরুয়া রঙের কাপড়, উত্তরীয়। নত মুখ, নত চোখ ভেজা মাটির দিকে নিবদ্ধ।

স্বামীজী তাঁর চির পরিচিত মাটিকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাচ্ছেন!

ধীরে ধীরে দুজন এগিয়ে আসছিলেন নদী তীর ধরে। এখন রোদ উঠেছে। বৃষ্টি-জলে ধুয়ে যাওয়া আকাশে এ রোদের রঙও গৈরিক! সে রোদ এসে পড়েছে নদী তীরের মাটিতে, যে মাটি বৃষ্টির জলে ভেজে, শুকিয়ে, এখন তীর্থের ধুলির মত পবিত্র। সে রোদ এসে পড়েছে গাছপালায়, ঘাসে, নদীর জলে!

ওঁরা ধীরে ধীরে কাছের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছিলেন। এর মধ্যে গ্রামের ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ, যুবক সবাই ভিড় করে এসেছে নদীর ধারে। বিজয়বাবুও এসেছেন, কল্যাণীও এসেছেন! মুক্তি দেখল, দিদি জানালার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে—স্বামীজীকে শেষবারের মত দর্শন করবে বলে।

ওঁরা কাছে এলেন। দুজনেই নীরব। এ নীরবতা শুধু সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, এ নীরবতাই এখন পবিত্র মন্ত্র। দুজনেরই দৃষ্টি মাটির দিকে— ওঁরা খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। একদিন হয়ত ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শংকর এমনি করেই ভারতবর্ষের মাটির পথ দিয়ে এই নীরবতার মন্ত্রের সুরে সুরে হেঁটেছিলেন।

কাছে আসতে গ্রামের সকলে ওঁদের প্রণাম করল। বিজয়বাবু কল্যাণী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিজয়বাবুর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে। তখন পাশে দাঁড়িয়েছিল অনন্ত, তার বৌ কুসুম তার রুগ্ন ছেলেটাকে কোলে করে। গোবিন্দদা! হ্যাঁ, গোবিন্দদাই সকলের আগে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

মুক্তি স্তব্ধ হয়ে দেখছিল, স্বামীজী আর সেই সন্ন্যাসী নীরবে চলে গেলেন। নির্বাক, অথচ কী আশ্চর্য বাঙ্ময়! এ যাওয়া সেই মহান অনন্তের দিকে পরম অসীমের দিকে! —এ পথ চলে গেছে কোন্ অজানা পৃথিবীর দিকে!

ক্রমে ক্রমে ওঁরা দূরে চলে গেলেন। গ্রামটি ডানদিকে আর নদীটাকে বাঁদিকে রেখে বরাবর উত্তর দিকে! একদিন বোধ হয়, পঞ্চপাণ্ডব, এমনি-ভাবে সব কিছু ছেড়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন।

হঠাৎ শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, দূর থেকে আরও দূরে, বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ল সেই গম্ভীর শব্দ। আকাশ ভরে গেল, পৃথিবী ভরে গেল, সকালের রোদ ভরে গেল সেই শব্দে। সকালের সূর্য তখন আরো একটু উঠেছে, মাঠে ওরা চাষ করতে নেমেছে।

আজ বছরের প্রথম চাষের দিন!

বিজয়বাবু, কল্যাণী, আর সবাই কখন ফিরে গেছে।

মুক্তি মৃন্ময়ের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল—আর তো দেখা যাচ্ছে না স্বামীজীকে। চল, মৃন্ময়দা আমরা এবার বাড়ি যাই।

স্বামীজী যে পথে চলে গেছেন, সকালের সেই নদী তীরের পথের দিকে চেয়ে চেয়ে মৃন্ময় তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না। কে জানে, সেই পথই চিরদিন তার কাছে বৈরাগ্যের মত উদাসীন, পবিত্র হয়ে রইল কিনা!